ইকবাল দেশে বিদেশে

মীযানুর রহমান সম্পাদিত

আল্লামা ইকবাল সংসদ
ঢাকা, বাংলাদেশ

ইকবাল ঃ দেশে বিদেশে

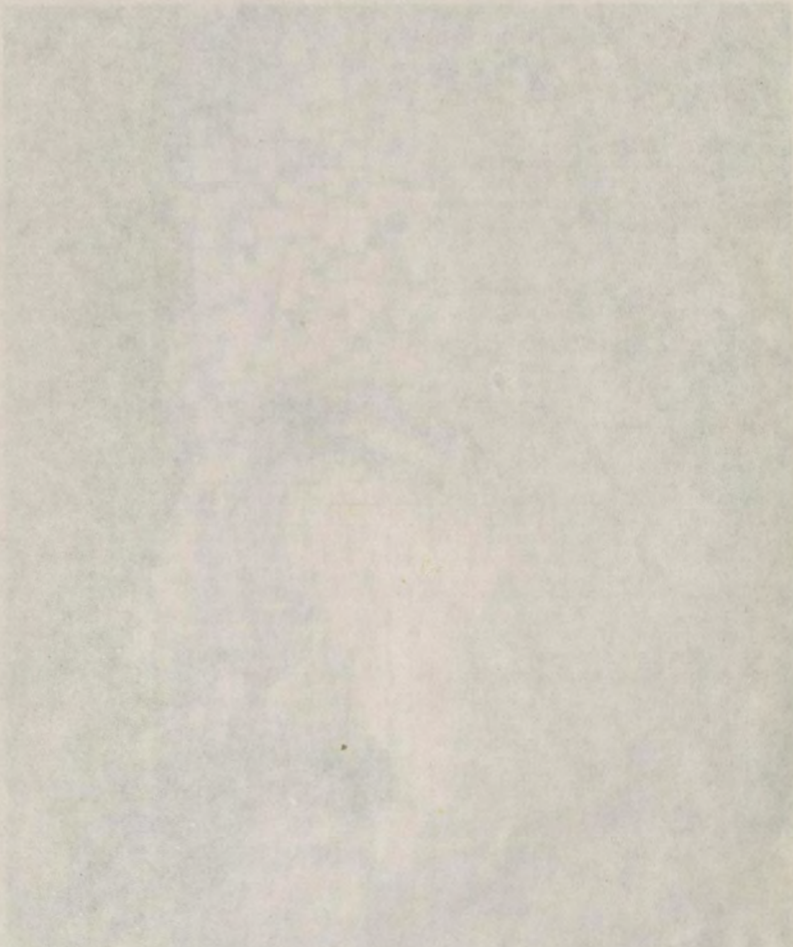

প্রকাশনায়

আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা

ইকবাল ঃ দেশে বিদেশে

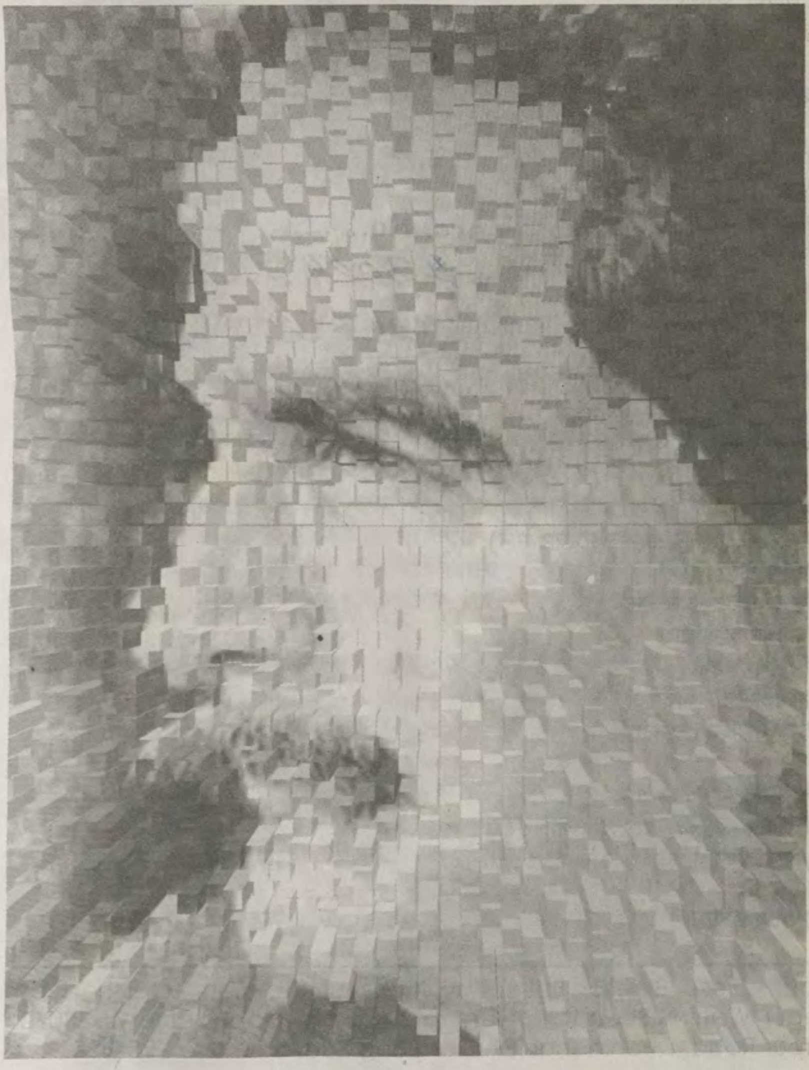

প্রকাশনায়

আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা

প্রকাশক ঃ
আবদুল ওয়াহিদ
সেক্রেটারী জেনারেল
আল্লামা ইকবাল সংসদ

প্রচ্ছদ ঃ ফরিদী নুমান

প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৭৪
ইকবাল একাডেমী
৫ নং পুরানা পল্টন, ঢাকা

২য় সংস্করণ
আল্লামা ইকবাল সংসদ
এপ্রিল, ১৯৯৯
৩৮০/বি, মিরপুর রোড, ধানমন্ডি,
ঢাকা, ফোন ঃ ৯৫৫৪২৫৭

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
LIBRARY.
Acc. No....... 23000
LAHORE.

প্রকাশনা কমিটি
এডভোকেট মুজিবুর রহমান (চেয়ারম্যান)
অধ্যাপক শাহেদ আলী
ডঃ আবু সাঈদ নুর উদ্দীন
ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ
মীর কাশেম আলী
সৈয়দ তোসারফ আলী
আবদুল ওয়াহিদ (সম্পাদক)

কম্পিউটার কম্পোজ ও মুদ্রণ ঃ
ডাইনামিক প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং
৪৭/২ আরামবাগ, ঢাকা, ফোন ঃ ৯৩৩৩৮৭০

মূল্য ঃ ১২০ টাকা

Iqbal : Dese Bidese, Edited by Mezanur Rahman, Published by Abdul Wahid, Secretary General, Allama Iqbal Society, 380/B, Mirpur Road, Dhanmondi, Dhaka, Bangladesh. Phone : 9554257.

Price : TK. 120 US$ 5

আমাদের কথা

'ইকবাল ঃ দেশে বিদেশে' সংকলন গ্রন্থটি 'ইকবাল একাডেমী ঢাকা ঃ করাচি' ১৩৭৪ সনের আশ্বিন মাসে প্রকাশ করেছিলো। ২৮২ পৃষ্ঠাসম্বলিত গ্রন্থের মূল্য ছিলো ১০ টাকা। ইকবাল একাডেমীর পরিচালক মরহুম মীজানুর রহমান মুখবন্ধে গ্রন্থটি প্রকাশের পটভূমি ব্যাখ্যা করেছেন সুন্দরভাবে। ১৫টি পর্বে গ্রন্থটি বিন্যস্ত হয়েছে। প্রথম খন্ডে বিদেশের বিভিন্ন মনীষীর অভিভাষণ সন্নিবেশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খন্ডে অবিভক্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন মনীষীর অভিভাষণ ও এল, মিরনভ-এর লেখা 'সোভিয়েত রাশিয়ায় ইকবাল' প্রবন্ধটি সৈয়দ আবদুল কাহ্হারের বাংলা অনুবাদে সম্পৃক্ত হয়েছে। সবশেষে ১৯৯৮ সনে লাহোরের পাঞ্জাব ইউনির্ভাসিটিতে অনুষ্ঠিত ৩ দিন ব্যাপী (৯নবেম্বর থেকে ১১নবেম্বর) তৃতীয় 'ইকবাল আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে '-র একটি সচিত্র প্রতিবেদন সংযুক্ত হয়েছে।

স্মরণ রাখতে হবে যে, গ্রন্থটি ছাপা হয়েছিলো ষাটের দশকের শেষের দিকে। বাংলাদেশ নামক কোন পৃথক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তখন ছিলো না। 'ইকবাল একাডেমীও ছিলো 'ঢাকা ঃ করাচী'তে একটাই।

'ইকবাল আন্তর্জাতিক কংগ্রেস'৯৮-র সচিত্র প্রতিবেদন- সংযুক্তি ব্যতিত বর্তমান সংস্করণে আমরা কোন কিছুই সম্পাদনা করিনি। অনেকটা হুবহু রেখেছি ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষার খাতিরে। অবশ্য গ্রন্থের প্রথমে এবং প্রথম খন্ডের শেষে সংযুক্ত ছবিগুলো আমরা বর্তমান সংস্করণে সন্নিবেশিত করতে পারিনি বলে দুঃখিত। প্রতিটি ভাষণ-অভিভাষণ পাঠের সময় পাঠককে প্রেক্ষাপট, সময় ও তারিখের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে, গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিলো ১৯৬৭ সালে আর আজ আমরা দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করছি ১৯৯৯ সালে।

বলা আবশ্যক যে, বাংলা ভাষায় ইকবালের জীবন ও কর্মের উপর তখন প্রামাণ্য কোন গ্রন্থ না থাকায় ইকবালের জীবন ও কর্মের মূল্যায়নের জন্য ইকবাল প্রেমিকদের এ গ্রন্থের কাছেই আসতে হতো। গ্রন্থটি সুধী মহলে এ জন্যে ব্যাপক সাড়াও জাগিয়ে ছিলো। আল্লামা ইকবাল সংসদ ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে অব্যাহতগতিতে সভা-সেমিনারের পাশাপাশি প্রকাশনা জগতে বাংলা সাহিত্যকে যে সওগাত দিয়েছে, তাতে ইকবাল চর্চা এবং গবেষণার পথ অনেক প্রশস্ত হয়ে গেছে। তাই বর্তমান গ্রন্থের আবেদন এবং গ্রহণযোগ্যতা সম্পূর্ণ ভিন্ন বলেই আমরা মনে করি। সে জন্যেই গ্রন্থটি প্রকাশ করা আমাদের দায়িত্ব মনে করেছি।

অত্যাধুনিক মুদ্রণের ব্যয় সংযোজন করার লক্ষ্যে আমাদেরকে গ্রন্থের কলেবর ছোট করতে হয়েছে। এটা না করেও উপায় ছিলো না। শেষ পর্যন্ত অসামান্য এ সংকলন গ্রন্থ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটি আমাদের সুষ্ঠু সাহিত্য-সংস্কৃতি বিনির্মাণে প্রভূত উপকারে আসবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

আবদুল ওয়াহিদ

আল্লামা ইকবাল সংসদ
২১ এপ্রিল, ১৯৯৯
ঢাকা, বাংলাদেশ।

সূচীপত্র
প্রথম খন্ড

পরিচিতি	ঃ	মীযানুর রহমান	৭
বৃটেন	ঃ	অধ্যাপক রাশ্‌ক্রুফ ইউলিয়াম	১৩
		অধ্যাপক আর্থার জে আরবারী	১৮
আমেরিকা	ঃ	মিস্ ডঃ শীলা ম্যাক্‌ডোনফ	২৫
		ডঃ আলী কুলি আর্দালান	৩১
		মিঃ ওয়াল্টার এইচ, জাড্	৩৪
নেদারল্যান্ডস্	ঃ	মিঃ আলতাফ হোসেন	৩৭
ইতালী	ঃ	অধ্যাপক জি. তুসী	৪৪
সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র	ঃ	মুহাম্মদ আলী আল্ হাবরূক	৪৬
		জনাব সাজ্জাদ হায়দার	৫১
		ডঃ আবদুল ক্বাদির মাহ্‌মুদ	৫৫
তিউনিসিয়া	ঃ	আহমদ খালিদ	৬৪
মরক্কো	ঃ	অধ্যাপক এস, আই, ফাহিদ	৮১
ইরান	ঃ	ডঃ আলী রাযা ক্বাওয়াম নাসীরী	৮৫
		ডঃ গোলাম হোসায়ন ইউসুফী	৮৭
		আক্বা আলী আসগর মযহারী	১০৩
		লেঃ জেনারেল নসরুল্লাহী	১০৮
আফগানিস্তান	ঃ	অধ্যক্ষ জনাব গুলাম হুসায়ন মুজদ্দদী	১১২
ইন্দোনেশিয়া	ঃ	জনাব মুহম্মদ নাসির	১১৯
ভারত	ঃ	শ্রী বি, পি, এল বেদী	১২৭
সিংহল	ঃ	মিঃ তিম বিজীয়রত্ন	১৩০

দ্বিতীয় খন্ড

পাকিস্তান	ঃ	ডঃ এ, টি, মুক্তাদের	১৩৫
		কবি ফয়েয আহমদ ফয়েয	১৩৯
		মহ্‌বুবুর রশীদ	১৪৪
		সৈয়দ মহ্‌বুব মুর্শেদ	১৫৪
		ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৬৪
		আবু সাঈদ চৌধুরী	১৬৯
		আবদুল মওদুদ	১৭৩
		মীযানুর রহমান	১৭৯
		ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব	১৮৯
		বেগম সুফিয়া কামাল	১৯২

সোভিয়েত রাশিয়ায় ইকবাল ঃ এল, মিরনভ ১৯৪
ইন্টারন্যাশনাল ইকবাল কংগ্রেস-১৯৯৮ ঃ আবদুল ওয়াহিদ ১৯৬

প্রসঙ্গত-প্রথম সংস্করণের সম্পাদকের ভূমিকা

'ইক্‌বাল ঃ দেশে বিদেশে" ইক্‌বাল একাডেমী, ঢাকার ৩য় পুস্তক। প্রথম দু'টি পুস্তক– "প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান" ও "হেজাজের সওগাত"। "The Development of Metaphysics in Persia" লিখে ইকবাল "ডক্টরেট" ডিগ্রী লাভ করেছিলেন জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে। "প্রজ্ঞান চর্চায় ইরান" ইহারই অনুবাদ। "হেজাজের সওগাত" আল্লামার মৃত্যুর পর প্রকাশিত ফার্সী-উর্দু কাব্য "আর্মুগানে হেজাজ"-এর কাব্যানুবাদ।

"ইক্‌বাল ঃ দেশে বিদেশে" আল্লামা ইকবাল সম্বন্ধে আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের ৩০ জন মনীষীর মূল্যবান আলোচনার মণি-মঞ্জুষা। আলোচনাকারীদের নাম সূচীপত্রে দ্রষ্টব্য। আমিও একজন, তবে মনীষার দাবীদার না– জীবনীকার। এগুলোর বেশীর ভাগ ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত ইকবাল স্মৃতি-বার্ষিকী সম্মেলনসমূহে পঠিত। অন্যান্য কয়েকটি বিভিন্নভাবে সংগৃহীত। ১ম খন্ডে পাকিস্তানের বাইরের এবং ২য় খনে পশ্চিম-পূর্ব পাকিস্তানে (সাবেক) প্রদত্ত বক্তৃতাদির বঙ্গানুবাদ এবং বাংলা ভাষা ভিজ্ঞ লেখকদের নিজস্ব বাংলা রচনা।

ইংরেজী প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলীর অনুবাদক জনাব কামালুদ্দীন খান এবং ফার্সী (ইরান ও আফগানিস্তান) বক্তৃতাবলীর অনুবাদক জনাব মুহীউদ্দীন খান ও জনাব মুহম্মদ হারুন ইসলামাবাদী। সর্বশেষে সন্নিবিষ্ট রুশীয় ভাষার প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদকের নাম প্রবন্ধের নীচে দ্রষ্টব্য। প্রচ্ছদ শিল্পী জনাব কাজী আবুল কাসেম।

"পরিচিতি" ১৯৪৩ সালের প্রকাশিত আমার লেখা "পথের পয়গাম ও জাগরণী" হতে সংকলিত। বলা দরকার যে, আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে ইকবালের জন্ম তারিখ ৯ই নভেম্বর ১৮৭৬ সাল– ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ সাল। বিষয়টি আপাতত পাকিস্তান সরকারের বিবেচনাধীন।

'ইক্‌বাল ঃ দেশে বিদেশে" ইরানের শাহিনশাহ মুহাম্মদ রেযা পাহলভী ও মহামান্যা মহিষী ফারাহ দিবা পাহলভীর ২৬/১০/৬৭ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত রাজ্যাভিষেখ– করোনেশন উৎসবের অন্যতম সওগাত। ২০/১০/৬৭ ইং তারিখে ঢাকা হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে উদযাপিত প্রকাশোৎসবে ইরানের কনসাল জেনারেল সাহেবের হাতে আবশ্যক সংখ্যা সমর্পিত। এই উৎসবের উদ্‌বোধক ছিলেন পূর্ব্ব পাকিস্তানের (সাবেক) প্রধান বিচারপতি জনাব এস. এম. মুর্শেদ এবং সভাপতি ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব। তাঁরা এই পুস্তকের অন্যতম লেখকও বটেন।

মহামান্য শাহিনশাহের জন্ম ২৬শে অক্টোবর ১৯১৯ ইং। ১৯৪১ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি ইরানের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। ২৬ বৎসর পরে তাঁহার করোনেশন উৎসব। অস্বাভাবিক মনে হলেও অহেতুকী নহে। স্বদেশ, স্বজাতি ও মানবতার সেবায় সত্যিকার সমর্পিতপ্রাণ এই কর্মবীর দেশের জন্য অনেক কিছু করছেন; উৎসবের জন্য লালায়িত নহেন। প্রকাশোৎসবে পঠিত মুবারকবাদে তাই বলেছিলাম–

ইরানের শাহিনশাহ মুহাম্মদ রেযা পাহলভী,
'আর্য্য-মেহের' তুমি পারস্যের প্রেমোজ্জ্বল রবি।
নহ শুধু সম্রাট, কর্মবীর দরদী মানুষ,
শানশাহী তাজদার, নহ তবে ফালতু ফানুস!
'উন্স্' বা প্রেমেতে পুর, প্রেম-সিক্ত সত্যি ইনসান,
দুহাজার গ্রাম তাই গরীবের তরে অবদান!
শুধু নহে দান, তুমি প্রতিষ্ঠিলে ব্যাঙ্ক ওমরান,
গ্রামোন্নতি সহায়ক সমবায়ী শ্রেয় প্রতিষ্ঠান।
মহান মহিষী তব ফারাহ দিবা নারী মহীয়ান,
আর্ত্তের তরে তাই অকাতরে দরদের দান!
নহ রাজ, নহে রাণী, প্রাণ-দীপ্ত প্রেমিক-প্রেমিকা।
বিরাণনইরান নিস্ত্, আজি ফের আযাদ-আবাদ
জীগর লহুতে লেখা দোঁহা তবে মুবারকবাদ!

আমাকে বলতে হয়েছে অনেক কথা কর্তব্যের দায়ে। স্বনামধন্য ও স্বনামধন্যা অন্যেরা লিখেছেন ইক্‌বাল-সাহিত্য ও পয়গাম বুঝাবার অনুপ্রেরণায়। তাঁহাদের বিদগ্ধ বিশ্লেষণে ইকবাল প্রতিভার নানা দিক বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। ইহাকে ইক্‌বাল-প্রতিভা ও পয়গামের বিশদ ব্যাখ্যা বলা যায়। আমাকে বাদে, ব্যাখ্যাতাগণ সকলেই বিদগ্ধ মনীষী।

ইক্‌বাল ছিলেন আল্লামা– মহামনীষী। তাঁহার ভাবধারা সুগভীর; সর্ব্বত্র সহজবোধ্য নহে। পুস্তকটি এই ব্যাপারে বিশেষ সহায়ক হবে আশা করি।

পারস্য কাননের অমর বুলবুল শেখ সাদীর কালামেই হোক তাম্‌মাৎ-বিল্‌-খায়ের–
"কাছেরা কে বাশাদ্ দিলে হক্ শেনাছ
না শায়েদ কে বানদাদ যবানে ছেপাছ!"
সত্য-রাঙা দিল্ যাঁর, কোথা সেই জন?
রহিবে রসনা-বাঁধা, করিবেনা সত্যের কীর্তন॥

ইক্‌বাল একাডেমী নিয়াযমন্দ্
৫, পুরানা পল্টন, ঢাকা-২ মীযানুর রহমান

পরিচিতি

জন্ম ও বংশ

হিমাচলের পাদদেশ হতে ত্রিশ মাইল দূরে পাঞ্জাবের অন্তর্গত সিয়ালকোট শহরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর, মোতাবেক ২৪শে জিল্‌হজ্জ ১২৮৯ হিজরী, আল্লামা স্যার মোহাম্মদ ইকবালের জন্ম।

ইকবালের পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন সাপ্রু গোত্রীয় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জনৈক সুফীর প্রভাবে উক্ত সাপ্রু পরিবার ইসলাম কবুল করেন। পাঠান শাসনের হাঙ্গামা-হুজ্জতের সময় কাশ্মীর পরিত্যাগ করে তাঁরা সিয়ালকোটে বসতি কায়েম করেছিলেন।

শৈশব ও শিক্ষা

সিয়ালকোটেই ইকবালের শৈশব ও শৈশব শিক্ষা। সুফী ভাবাপন্ন পিতা শেখ নূর মোহাম্মদের ইচ্ছা ছিল ইকবালকে মাদ্রাসায় দেওয়া, কিন্তু ওস্তাদ মৌলবী (পরে শামসুল উলামা) সৈয়দ মীর হাসানের পরামর্শে ইকবালকে ইংরেজী স্কুলে দাখেল করানো হয়।

সৈয়দ মীর হাসানের মত নামজাদা ওস্তাদের কল্যাণে বালক ইকবালের যথেষ্ট উপকার হয়েছিল। খোদা দাদ্ জেহেন্ এবং নিজস্ব মেহনৎ-মোশাক্কতের বরকতে ইকবাল বৃত্তি ও কৃতিত্বের সহিত সিয়ালকোটে প্রাথমিক পরীক্ষাসমূহ পাস করত লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজ হতে সসম্মানে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে দর্শনে এম, এ, পাস করেন।

চাকরি ও বিলাত যাত্রা

এম, এ পাস করার পর তিনি প্রথমে লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে দর্শন ও ইতিহাসের এবং পরে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে দর্শন ও ইংরেজী ভাষার সহকারী অধ্যাপক হন। গভীর লিয়াকৎ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য অধ্যাপক হিসেবে তিনি সকলের নিকট যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করেন। এ সম্মানের মোস্তাহেক তিনি ছিলেন নিশ্চয়ই।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য অধ্যাপক ইকবাল ছুটি নিয়ে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিলাত গমন করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পারস্য দর্শন সম্বন্ধে গবেষণার জন্য জার্মানীর মিউনিক ইউনিভারসিটি হতে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। পরে তিনি লন্ডনের লিন্‌কন্‌স ইন্ হতে ব্যারিস্টারী পাস করেন।

লন্ডনে থাকাকালে তিনি কিছুদিন লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ রাজনীতি শিক্ষা এবং লণ্ডন ইউনিভারসিটির আরবী ভাষার অধ্যাপকের পদে কাজ করেছিলেন। বিলাত প্রবাসে ইকবালের সহিত ডক্টর ম্যাকটেগার্ট ব্রাউন, ডক্টর নিকলসন্ প্রমুখ মনীষীর পরিচয় হয়। ডক্টর নিকলসনই পরে ইকবালের আস্‌রারে খুদীর ইংরেজী তর্জমা করেন। ফরাসী মনীষী বার্গসঁ'র সহিতও ইকবালের বন্ধুত্ব ও পরিচয় হয়েছিল। এই সময়েই তিনি ফার্সী শায়েরী শুরু করেন।

সুবিখ্যাত Preaching of Islam প্রণেতা ডক্টর ডব্লিউ, আরনল্ডের সহিত লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে ছাত্র হিসেবেই ইকবালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ডক্টর আরনল্ডের ছুটিতেই ইকবাল কয়েক মাসের জন্য লন্ডন ইউনিভারসিটির আরবী ভাষার অধ্যাপক হয়েছিলেন।

ব্যারিস্টার

১৯০৮ সনে স্বদেশে ফিরে এসে ইকবাল পুনরায় অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন এবং লাহোর হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী শুরু করেন। বছর তিনেক পর তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। ব্যারিস্টারীতে অল্প সময়েই তিনি প্রসার লাভ করেন। তবে টাকা-পয়সার লালসা ইকবালের ছিল না। ইচ্ছা করলে ব্যারিস্টারীতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারতেন, কিন্তু সাদা-সিধাভাবে দিন গুজরানের মত আবশ্যক অর্থেই তিনি সন্তুষ্ট থাকতেন। এ জন্যই তিনি অম্লান বদনে চাকরিও ইস্তফা দিতে পেরেছিলেন।

কাউন্সিলে

১৯২৬ সনে লাহোর হতে ইকবাল পাঞ্জাব লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচিত হন। আইন পরিষদে তিনি কৃষক ও জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোশেশ করেন। তবে রাজনৈতিক চাল-চালিয়াতি এবং ধাপ্পাবাজী আল্লামার ধাতে ছিল না। পরবর্তী নির্বাচনের সময় তিনি আর প্রার্থী হতে রাজী হননি। তিনি বলেন-

> "ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্যই অনেকে কাউন্সিলে যায়। ব্যক্তিগত স্বার্থের বালাই আমার নেই।"

বক্তৃতা

১৯২৮ সনের ডিসেম্বর মাসে আল্লামাকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বক্তৃতা দেবার জন্য আহবান করা হয়। তিনি ছয়টি বক্তৃতা দেন। বাঙ্গালোর, হায়দরাবাদ এবং আলীগড়েও তিনি বক্তৃতা দিতে আহূত হন। সর্বত্র তিনি বিপুলভাবে সমাদৃত হন; এই সকল বক্তৃতাই পরে "*The Reconstruction of Religious Thought in Islam*" পুস্তকে প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তান

১৯৩০ সনে আল্লামা ইকবাল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। লীগের বার্ষিক অধিবেশনে এলাহাবাদে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাতে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের দাবী পেশ করেন। এই দাবীই পরবর্তী পাকিস্তান

আন্দোলনের বিস্‌মিল্লাহ। ১৯৩১ সনে তিনি দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য বিলাত যান। যাবার পথে তিনি ফিলিস্তিন এবং ফিরবার পথে স্পেনের কর্ডোভা যিয়ারৎ করেন। মুসলিম গৌরবের লীলাভূমি কর্ডোভা প্রভৃতি যিয়ারতের ফলে তিনি কয়েকটি প্রাণোন্মাদক কবিতা রচনা করেন "মসজিদে কর্ডোভা" অন্যতম।

কাবুলে

বাচ্ছাই-সাক্কার হাতে বাদশাহ আমানুল্লাহর পরাজয়ের পর আফ্‌গানিস্তানের জন্য আল্লামা নেহায়েৎ পেরেশান হয়েছিলেন। কাবুল যাবার পথে লাহোর রেল স্টেশনে ইকবাল জেনারেল নাদিরের সহিত মুলাকাৎ করেন। নিরালায় কবি জেনারেল নাদিরের হাতে ৫০০০ টাকা দিতে চান। জেনারেল নাদির বলেন- "আমার কাছে মাত্র ১০০ টাকা রয়েছে, কিন্তু কবির কাছ থেকে কী করে এ হাদিয়া কবুল করবো।"

বাচ্ছাই-সাক্কাকে শিকস্ত করে জেনারেল নাদির আফগানিস্তানের বাদশাহ হয়ে আল্লামাকে কাবুলে আহবান করেন। বাদশাহ নাদিরের দাওয়াতে আল্লামা বিনা কাজে একা আফগানিস্তান যেতে অস্বীকার করেন। রাজকীয় আহবানেও আত্মসম্মানের মর্যাদা ক্ষুন্ন করতে রাজী হননি। আফগানিস্তানের শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন উদ্দেশ্যে বাদশাহ নাদিরের দাওয়াতে ডক্টর রস মসউদ ও মওলানা সোলায়মান নদভীসহ আল্লামা পরে কাবুল গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণেরই সওগাত তাঁর মুসাফির কাব্য কণিকা।

চরিত্র

ইকবাল শুধু বিশ্ববিখ্যাত কবি, দার্শনিক এবং চিন্তানায়ক ছিলেন না, তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন সবর, সাদাকাৎ, শুজায়াৎ এবং কেনায়াতের জীবন্ত প্রতীক- সত্যবাদিতা এবং দৃঢ়চিত্তেরও প্রতীক। নিম্নের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হতে তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে।

স্কুলে পড়ার সময় ইকবাল একদিন দেরীতে স্কুলে যান। দেরীর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে বালক মাস্টারকে বলেন ঃ

'ইকবাল অর্থাৎ উন্নতি বা খোশ্ নসীবী দেরীতেই আসে।'

কাঙ্গরার ভীষণ ভূমিকম্পের সময় খিদ্‌মৎগারকে আল্লামা বলেন-

"আলী বখ্‌শ! ছুটোছুটি না করে নীচের সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াও।"

আল্লামা কিন্তু শুয়ে শুয়ে বই পড়তে থাকেন- যেন কিছুই হয়নি।

নির্লোভ

সুবিখ্যাত ধুমরাও-রাজ মোকদ্দমায় কোনও আইনগত বিষয়ে সাক্ষী দেবার জন্য আল্লামাকে পাটনা আসতে হয়। তিনি তখন লাহোরের ব্যারিস্টার। উক্ত মামলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমূখ একপক্ষে এবং মিস্টার মতিলাল নেহরু প্রমূখ অপর পক্ষে ছিলেন। দেশবন্ধু দাশ আল্লামাকে পাটনা থাকতে বলেন। দৈনিক ১০০০ রূপী পাবেন এবং কমপক্ষে দু'মাস থাকবেন। দরকার মত লাহোর বা কলকাতাও যেতে পারবেন। আল্লামা রাজী হননি। লিখিত অভিমত পেশ করে ঐ দিনই লাহোর চলে যান।

চাকরি জীবনে পদোন্নতির প্রাক্কালেই আল্লামা স্বেচ্ছায় প্রফেসরী ছেড়ে দেন। ব্যারিস্টারীতেও তিনি ইচ্ছা করলে প্রভূত অর্থোপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু অর্থাকাঙ্ক্ষা আল্লামার ছিল না। খোর-পোষের মত টাকা হাতে হলে তিনি আর নতুন মামলা গ্রহণ করতেন না।

কনিষ্ঠ পুত্র জাবিদের নামে আল্লামা কর্তৃক নির্মিত জাবিদ মনজিলেই তিনি জীবনের শেষ কয় বছর কাটিয়ে ছিলেন। মাসের প্রথমেই তিনি জাবিদের নামে ব্যাংকের একাউন্টে জাবিদ মনজিলের মাসিক ভাড়া সর্বপ্রথমে জমা দিতেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি তা রীতিমত আদায় করে গেছেন।

আল্লাহর দরবারে

সরকার হতে জমি পাবার জন্য দরখাস্ত লিখে দেবার অনুরোধকারী জনৈক মাওলানাকে আল্লামা বলেন-

> দরখাস্ত আমি লিখে দিতে পারি, তবে গভর্নমেন্টের দরবারে নয় - আল্লাহর দরবারে, কেননা আল্লাহই জায়গা-জমির সত্যিকার মালিক।

মাশ্‌রাব

একবার জনৈক দরবেশ ইকবালের সঙ্গে মুলাকাতে আসেন। দোয়ার অনুরোধে দরবেশ সুধান ঃ

> আপনি কি ধন-দৌলত চান?

আল্লামা - না, টাকা-পয়সার আকাঙ্খা আমার নেই। আমি ফকীর। আল্লাহই আমাকে যা দরকার দান করেন।

দরবেশ- তা হলে আপনি কি দুনিয়াবী শান-শওকৎ চান?

- না, তাও আমার দরকার নেই। আল্লাহ্ আমাকে যথেষ্ট ইজ্জৎ দিয়েছেন।

দরবেশ- তা হলে কি আল্লাহর দিদার দেখতে চান?

ইকবাল- আল্লাহর দিদার? তা কি করে হতে পারে? আমি বান্দা, তিনি মুনীব। আল্লাহর ইবাদতই আমার কাজ। আল্লাহ্ যদি আমাকে দেখা দিতে আসেন, তা হলে আমি বিশ মাইল দূরে দৌড়ে পালাবো, কেননা অসম সিন্ধু যদি বিন্দুর সঙ্গে মিলতে আসে, তবে বিন্দুর অস্তিত্বই থাকবে না। বিন্দু হিসাবে আমি বাঁচতে চাই, সিন্ধুতে মিশতে চাই না। তবে বিন্দুর মধ্যেই সিন্ধুর সৃষ্টি আমার আকাঙ্ক্ষা।

দরবেশ অবাক হয়ে বললেন- ইকবাল বাবা! তুমি নিজেই মাশরাব-পানাধার। তোমার জন্য দরবেশের দোয়ার দরকার নেই।

কর্ম ও সংগ্রাম

জনৈক ব্যর্থ মনোরথ যুবক আল্লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসে নিজের বদ্ নসীবির জন্য আফসোস করতে থাকে। আল্লামা তাকে মানসিক শক্তি ও সবর বজায় রাখতে নসীহৎ করে বলেন-

কর্মই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কর্মই ইবাদৎ। সকল মানুষ ছোটখাট স্রষ্টা, মানুষের সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার বিনষ্টি পাপ। আমাদের আখেরী নবী দুনিয়ায় এসেছিলেন মানুষকে কোন কাজ ভাল, কোন কাজ মন্দ – তা বাৎলাতে। সফলতা-বিফলতার খেয়াল না করে জীবন সংগ্রামে ব্রতী হও।

আত্মনির্ভরতা

একদিন কয়েকজন কলেজের ছাত্র আল্লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আল্লামা বলেন-

জাতিভেদ প্রথার অভিশাপ অচিরাৎ বিদূরিত হওয়া দরকার। মুসলমানের জাতি ইসলাম। জাতীয় পরিচয় দিতে হলে তোমাদের শুধু বলা উচিত- আমরা মুসলমান। বিশ্বাসী যে-কোন ইমামের পেছনে তোমাদের নামাজ পড়া উচিত। ধনী-দরিদ্র সকল মুসলমানকে অলসতা পরিত্যাগ করতে হবে। নিজের চেষ্টায় সকলের ভরণ-পোষণের সমান সংগ্রহ করা উচিত- তা যতই কম-বেশী হোক।

ইকবাল দর্পণ

ইকবালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তাঁর কাব্য এবং রচনায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ইকবালের লেখা তাঁর অন্তরের দর্পণ, কেননা Art for Art's sake-এর চেয়ে Art fro Man's sake-ই ছিল ইকবালের আকীদা। লোক শিক্ষার জন্য অন্তরের রক্তাক্ষরেই তাঁর লেখা। ইকবাল সাহিত্য ইকবাল দর্পণ।

বীমারী ও মৃত্যু

মৃত্যুর ১১ বছর পূর্বে আল্লামা রেনেল কলিক রোগে আক্রান্ত হন। খাজা হাসান নিজামী, হাকিম আবদুল ওহাব আনসারী (নাবীনা হাকিম) প্রমুখ আল্লামার এলাজ করেন। কিছু ফায়দা হয়। ১৯৩৪ সনে শাহী মসজিদে ঈদের নামাজ পড়বার সময় তাঁর ঠাণ্ডা লাগে এবং পরে সেমাই খাবার সময় গলার আওয়াজ বসে যায়। দু'বার ভূপালে গিয়ে বৈদ্যুতিক চিকিৎসা করেন। হাকিমী এলাজও চলে। ফায়দা হলেও ব্যারাম সম্পূর্ণ সারে না।

১৯৩৫ সনে আল্লামার স্ত্রী দু'টি শিশু সন্তান জাবিদ ও মুনিরাকে রেখে মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যুতে আল্লামার স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়। মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে কার্ডিয়াক এজমার নিশানা দেখা যায়। যথাসাধ্য চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফল দেখা যায়নি। ১৯৩৮ ইং ২১ শে এপ্রিল সকাল ৫-১৫ মিনিটের সময় আল্লামা ইনতেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল কিঞ্চিদধিক ৬৫ বছর।

শোক ও সমাধি

ইকবালের মৃত্যুতে লাহোর এবং দেশের সর্বত্র গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। বিরাট মিছিল এবং শান-শওকতের সাথে লাহোর বাদশাহী মসজিদের পাশে হুজুরীবাগে আল্লামার দাফন-কাফন করা হয়। পারস্যের বাদশাহ রেজাশাহ পাহলভী, আফগানিস্তানের বাদশাহ জহীর শাহ, পাঞ্জাবের গভর্নর, মহাত্মা গান্ধী, মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জার্মানীর কন্সাল জেনারেল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ হাজার হাজার বিশিষ্ট লোক আল্লামার মৃত্যুতে শোক বাণী

পাঠান। জনসাধারণের তো কথাই নেই। আল্লামার জানাযায় কমপক্ষে সত্তর হাজার লোক শরীক হয়েছিল।

নিম্নলিখিত স্বরচিত কবিতাটি তাঁর কবরে লেখার জন্য আল্লামা অছিয়ৎ করে যান ঃ

"চুরুখ্‌তে খাবেশ বর বস্‌তম আজি খাক
হামেহ গোফ্‌তান্‌দ বা মা আশ্‌না বুদ
ও লেকিন কিছ্ নাদানিস্‌ত ইয়ে মুসাফির
চেহ্ গোফত ও কেহ্ গোফত ও আজ কুভা বুদ।"

- ধূলার ধরণী ছেড়ে চলিনু যেদিন
বল্‌লে সবাই- ছিলেন তিনি
মোদের আপনজন।
কিন্তু কেহ চিনেনিক এই মুসাফিরে
বল্‌লে কী বা, কাহার কাছে,
এলো কোথা থেকে।"

শেষ নিঃশ্বাসের পূর্বে আল্লামা যে কবিতাটি রচনা করেন, তার দু' লাইন এই ঃ

"নেশানে মরদে মোমেন বা তু গোয়াম
চু মরগে আয়েদ তাবাছছুম বর লবে উছ্‌ত।"

- "প্রকৃত মোমেন কেবা,
শোন তার পরিচয়।
মরণ আসিবে যবে
অধরেতে হাসি রয়।"

"আমি মুসলিম ডরিনা মরণে"- মৃত্যুর পূর্বে জার্মান কন্‌সালকে তিনি অকম্পিত কণ্ঠে এই জওয়াবই দিয়েছিলেন।

কবির শোকবাণী

কবী রবীন্দ্রের শোক বাণীতেই হোক উপসংহার ঃ

ইকবালের মৃত্যুতে আমাদের সাহিত্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তাহার পরিপূরণ সময় সাপেক্ষ। মৃত্যুঘাতী ঘা সহজে শুকায় না। বহির্বিশ্বে বর্তমান ভারতের স্থান সংকীর্ণ; এমতাবস্থায় বিশ্বজনীন আবেদন-কুশল কবিকে হারানো ভারতের দুর্ভাগ্য।"

- মীযানুর রহমান

বৃটেন

লন্ডনের ইসলামিক কালচারাল সেন্টার-এ ইকবাল দিবস পালন উপলক্ষে অধ্যাপক রাশব্রুক উইলিয়ম্‌স্‌ বলেন -

ইকবাল প্রতিভা নিয়ে আলোচনা প্রায় অফুরন্ত কাল ধরেই চলতে পারে। তাঁর সাথে লাহোর এবং লন্ডনে কয়েকবার সাক্ষাতের সৌভাগ্য আমি লাভ করেছি। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেও একবার তাঁর সাথে দেখা হয়েছে। আজকে সংক্ষেপে আমি দেখাতে চেষ্টা করবো তাঁর চিন্তাধারা কায়েদ-ই-আযমের চিন্তাধারার উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। এক্ষেত্রেও আমি বিশেষভাবে সৌভাগ্যবান; কেননা, কায়েদ-ই-আযমের সাথেও আমার অনেকবার সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সাবেক ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে আমি তাঁর সাথে বসেছি। গোল টেবিল বৈঠকে আমি তাঁর কার্যকলাপ অনুধাবন করবার বিশেষ সুযোগ পেয়েছি। তারপর, সম্ভবত নিজ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে তিনি যখন লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন, তখনও আমি বহুবার তাঁর সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেছি। এর ফলে, স্বভাবত আমার নিজের দিক থেকে এই দুই মহামানবের চরিত্র বিশ্লেষণ এবং একের ওপর অপরের প্রভাবের পরিমাপ আমি করতে পেরেছি। ইকবালের প্রভাব ক্বায়েদ-ই-আযমের ওপর পড়েছে- একথা যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে এও সমানভাবে সত্য যে, ক্বায়েদ-ই-আযম ও তাঁর জাতি গঠনমূলক ভাবধারা ইকবালকেও অতি গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এবং শেষ জীবনে তাঁকে নবতর আশায় আশান্বিত করে তুলেছিল। সে-কালের ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের উপস্থিত বিপদ ও ভবিষ্যৎ আশা সম্বন্ধে দু'জনার মনোভাব তুলনা করে দেখা বেশ চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। ক্বায়েদ-ই-আযমের দু'টি বৈশিষ্ট্য তাঁর সব কাজের মধ্যে উকি-ঝুঁকি দিয়েছে।

প্রথমতঃ তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি এত অধিক উঁচুস্তরের ছিল যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তা প্রতিভাত হতো উত্তুঙ্গ গিরিশিখর সদৃশ – যার নিকটস্থ হওয়া ছিল তাদের সাধ্যাতীত।

দ্বিতীয়তঃ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানের আশা তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন এবং আমার ধারণায়, তাঁর জীবনের প্রায় শেষ পর্যায় পর্যন্ত বলা যায় ১৯৩৫ কি ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দুই বৈশিষ্ট্য থেকে তিনি একটুও স্খলিত হননি।

প্রথমতঃ তিনি ছিলেন একজন বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজাত। তাঁর সাথে দেখা করতে যেয়ে প্রত্যেকেই বুঝতে পারতো যে, স্পষ্টতঃ সে একজন অতিমানবের পাল্লায় পড়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতের জন্যে এ একটি পরম লাভজনক ব্যাপার ছিল। কিন্তু এ কারণে ক্বায়েদ-ই-আযম তাঁর অনুসারী সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দৃঢ়ভাবে আশা পোষণ করতেন যে, আপোষ-আলোচনার মাধ্যমে তিনি নিজ সম্প্রদায়ের জন্যে এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা আনতে পারবেন, যার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতে তাদের অবস্থান নিরাপদ হবে। আমার মনে হয়, সোজাসুজি ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি কখনও এ ধারণা ও আশা পরিত্যাগ করেন নি। এখন, স্যার মুহম্মদ ইকবালের দিকে তাকালে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, তাঁর ভাবধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইসলাম ধর্ম এবং বিশেষ করে পবিত্র কুরআন তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন; এ কারণে, মুসলিম ভারতের জন্যে কি চাই, সে সম্বন্ধে ক্বায়েদ-ই-আযমের, অন্ততঃপক্ষে রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিকে, যে ভাবধারা ছিল, তার চেয়ে অনেকখানি স্পষ্ট ও মৌলিক ছিল ইকবালের চিন্তা। তিনি অবিচল চিত্তে বিশ্বাস করতেন যে, মুসলিমরা ইসলামকে রক্ষা করবে। তিনি রাজনৈতিক আপোষ-মীমাংসার সম্ভাবনার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন না। নিবিষ্ট অধ্যয়ন থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে উত্তম মুসলমানরূপে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না, যদি না তারা যথাযথভাবে ইসলামী রীতি-নীতি অবলম্বন করতে পারে। এ কথাও স্মরণীয় যে, ইসলাম তাঁর দৃষ্টিতে বিশিষ্ট অর্থপূর্ণ একটি কর্মশীল প্রোগ্রাম ছিল। তিনি ছিলেন একজন মহান সংস্কারক; কেননা, সমকালীন মুসলিম সম্প্রদায়কে তিনি কুরআনের মূলনীতির প্রতি আহবান জানিয়ে এ কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, ইসলাম হলো একটি গতিশীল ও কর্মপ্রবণতামূলক জীবন পন্থা, নিছক নিক্রিয় দর্শন সূত্র নয়। কিন্তু এর সাথে সাথে তাঁর এই দৃঢ় প্রতীতি ছিল যে, ইসলাম প্রকৃতই যেভাবে আচরিত হওয়া প্রয়োজন, তা সম্ভব কিছুতেই হতে পারে না, যে পর্যন্ত না এ ধর্মের অনুসারীরা একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে নিজেদের শাসন ক্ষমতা লাভ করে। এ কারণেই আমরা তাঁর ১৯৩০ সালের এলাহাবাদ বক্তৃতায় পাই ঃ

> আমি চাই যে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্তান একটি স্টেট (শাসনতান্ত্রিক অঞ্চল)-এ পরিণত হোক। অন্ততপক্ষে পৃথিবীর এই অংশে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে হোক বা বাইরে হোক, একটি উত্তর-পশ্চিম মুসলিম রাজ্য সংগঠনই, আমার মতে, মুসলমানদের শেষ নিয়তি।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি মুসলিম জাতীয় আবাসভূমি পত্তন করা, যেখানে শরীয়তের মূলনীতি অনুযায়ী ইসলাম ধর্মে আচরিত হতে পারবে এবং এ জন্যে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে কোনো প্রকারের দেশ বিভাগের দ্বারাই তা সম্ভব হতে পারে। এটি লক্ষণীয় যে, যে সময়ে জওহরলাল নেহরুর ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতন্ত্রবাদ ভারতের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল সমর্থন লাভ করেছিল, সেই সময়ে ইকবাল পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ এ মতবাদ ভুল। ১৯৩১ সালে ক্বায়েদ-ই-আযমকে লিখিত এক চিঠিতে তিনি যুক্তি-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে প্রয়াস পান যে,

ইসলামী শরীয়তে সর্বস্তরের মানুষের জন্যে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি রয়েছে, তা-ই হলো জওহরলাল নেহরুর নাস্তিকতামূলক সমাজবাদের যোগ্য প্রত্যুত্তর।

তিনি লিখেছেন (২৮ শে মে, ১৯৩১)ঃ

ইসলামী আইন বহুদিন ধরে এবং পরম অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করে আমি এ সিদ্ধান্তে এসেছি যে, যদি এই কানুন-পদ্ধতি যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম ও কার্যকর করা হয়, তবে প্রত্যেকের জন্যে অন্ততপক্ষে জীবন যাপনের অধিকারসমূহ সংরক্ষিত হবে। কিন্তু স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রবলীর পত্তন ব্যতীত এ দেশের ইসলামী শরীয়তের প্রয়োগ ও বিকাশ সাধন কিছুতেই সম্ভব হবে না।

তিনি আরও বলেন ঃ

ইসলামের জন্যে সুবিধাজনক আকারে এবং ইসলামী কানুনের নীতি অনুযায়ী সামাজিক গণতন্ত্র-পদ্ধতি গ্রহণ বিপ্লবাত্মক কিছুই নয়; বরঞ্চ এ হলো ইসলামের প্রাথমিক মৌলিক নীতির দিকে প্রত্যাবর্তন। অতএব আধুনিক জগতের সমস্যাবলীর সমাধান হিন্দুর তুলনায় মুসলমানের পক্ষে অনেকখানি সহজতর। কিন্তু আমি পূর্বেই বলেছি যে, ভারতীয় মুসলমানেরা যাতে এসব সমস্যা সমাধান করতে পারে, তার জন্যে আবশ্যক হলো দেশের এমন পুনর্বন্টন ব্যবস্থা যাতে এক বা একাধিক রাজ্য সম্পূর্ণরূপে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

ক্বায়েদ-ই-আযম, অল্পদিনের জন্যে হলেও, নিজ সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাহত হয়ে যতদিন ইংলন্ড প্রবাসে ছিলেন, ততদিন ধরে ইকবাল তাঁকে অনেক ক'টি অতি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি লিখে উজ্জীবিত করতে থাকেন। সাথে সাথে তিনি নিজের অফুরন্ত উদ্যম ও চিন্তাশক্তি দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, তাঁর ব্যাখ্যাত গতিধর্মী ইসলামই হলো তাদের উত্তরণের একমাত্র পন্থা; এতেই নিহিত রয়েছে তাদের আত্মবিকাশের নির্ভুল উপায়। আমার কাছে আশ্চর্য মনে হয় যে, ইকবালের জীবন ও কর্মধারার এই বিশেষ দিকটি অনেকখানি অপ্রকাশই রয়ে গেছে যে, যদিও একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি তখনকার হাল-হকীকতের প্রতি অসন্তোষ পোষণ করে গেছেন, তবুও প্রায় একজন ঋষির অন্তদৃষ্টি দিয়ে তিনি মুসলিম সমাজের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ভুলভাবে অবলোকন করতে পেরেছিলেন।

উদাহরণতঃ ১৯৩২ সালে মুসলিম কন্‌ফারেন্সে তিনি যা বলেছিলেন তার উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

"ভারতীয় মুসলমানদের একটিমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত, সমগ্র দেশব্যাপী এ প্রতিষ্ঠানের প্রদেশ ও জেলাভিত্তিক শাখা-প্রশাখা থাকবে।

তিনি আরও বলেন যে,

এর কার্যাবলী সম্পাদনের জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার একটি তহবিল চাই, আর বিভিন্ন পর্যায়ে যুব সংগঠন ও সুসজ্জিত স্বেচ্ছাসেবী দল দেশব্যাপী কর্মরত থাকবে সেই কেন্দ্রীয় সংস্থার অধীনে ও নেতৃত্বে।

১৯৩৪ সালে ক্বায়েদ-ই-আযম ভারতে ফিরে এসে ঠিক এই পরিকল্পনাই মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্যে গ্রহণ করেন। ইকবালের ইন্তেকালের চার বছর পরে লেটার্স অব ইকবাল টু জিন্নাহ (জিন্নাহকে লিখিত ইকবালের পত্রাবলী) গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ক্বায়েদ-ই-আযম বইয়ের ভূমিকায় যা লিখেছেন, আমার বক্তব্যের সমর্থনে তার কিছুখানি উদ্ধৃত করতে পারি।

তিনি লিখেছেন ঃ

"মুসলিম লীগের এ একটি মহৎ কৃতিত্ব যে, এর নেতৃত্ব মুসলিম সংখ্যালঘু উভয় শ্রেণীর প্রদেশে স্বীকৃত হয়েছে। যদিও সে সময়ে লোকসমক্ষে প্রকাশ করা যায়নি, তবুও একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, স্যার মুহম্মদ ইকবালের অবদান এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ধারণাবলী আমার নিজের চিন্তাধারার সাথে বিশেষভাবে সুসামঞ্জস্য ছিল এবং শেষ পর্যন্ত আমাকে তাঁরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।

এখন থেকে ইকবাল ক্বায়েদ-ই-আযমের ওপর ধীরে ধীরে যে প্রভাব বিস্তার করে চলেছিলেন, তার অন্যতম কারণ হলো ঃ তখন তিনি নতুন পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ইকবাল অক্লান্তভাবে দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলেন।

প্রথমতঃ

তিনি ক্বায়েদ-ই-আযমকে পাকিস্তান পরিকল্পনায় বিশ্বাসী করে তুলতে প্রয়াস পেলেন;

দ্বিতীয়তঃ তিনি মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বীকৃত মুখপাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে লাগলেন। আমি বলেছি যে, ইকবালের মৃত্যুর চার বছর পরে ক্বায়েদ-ই-আযম তাঁর বইয়ের ভূমিকা মারফত তাঁকে সে জন্যে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ১৯৩৭ সাল নাগাদ ক্বায়েদ-ই-আযমের মনোভাবে দ্বিধাতীত পরিবর্তন এসে গেছে এবং তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুসলিম লীগকে একটি মুসলিম জন-আন্দোলন সংস্থায় পরিণত করতে। এ প্রসঙ্গে তাঁকে লিখিত ইকবালের ২৮শে মে, ১৯৩৭-এর চিঠি থেকে কিছুখানি উদ্ধৃত করা যায়;

আমি নিঃসন্দেহ যে, ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থার গুরুত্ব আপনি সম্যক উপলব্ধি করেছেন। মুসলিম জনগণ এখন পর্যন্ত মুসলিম লীগের প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি; এবং তাদের দিক থেকে তার যৌক্তিকতাও আছে। এখন লীগকে শেষবারের মতো সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে কি উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় মুসলমানদের মুখপাত্র হয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, না মুসলিম জনগণের নিকটে এসে দাঁড়াবে?

২১ শে জুন, ১৯৩৭-এর আর একটি চিঠিতে তিনি বলেন ঃ

উত্তর-পশ্চিম ভারত এবং সম্ভবত সমগ্র ভারত জুড়ে যে প্রভঞ্জন ঘনিয়ে আসছে, তার মুকাবিলায় আজকে আপনিই একমাত্র মুসলিম, নির্ভুল নেতৃত্বদানের জন্যে যাঁর প্রতি তাকিয়ে দেখবার মুসলিম সম্প্রদায়ের কথঞ্চিৎ অধিকার রয়েছে।

তিনি আরও বলেন ঃ

> আমি যেভাবে প্রস্তাব করেছি সেভাবে পুনর্গঠিত মুসলিম সংখ্যাগুরু প্রদেশসমূহের একটি আলাহিদা যুক্তরাষ্ট্রই হলো একমাত্র উপায়, যদ্দারা একটি শান্তিপূর্ণ ভারত গড়ে উঠতে পারে এবং সাথে সাথে অমুসলিম আধিপত্য থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে বাঁচানো যেতে পারে। উত্তর-পশ্চিম ভারত ও বাংলার মুসলমানদেরকে কেন এক একটি জাতি বলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না, যাতে তারা ভারতের এবং ভারতের বাইরের অন্যান্য জাতিসমূহের মতো আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পেতে পারে ?

ইকবাল তাঁর কর্তব্য এত সুচারুরূপে সম্পন্ন করে গেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর দু'বছর পরে, ১৯৪০ সালে, ক্বায়েদ ই আযম বলতে পারলেন; পাকিস্তান অপ্রতিরোধ্য।

ইকবালের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর পুত্রকে ক্বায়েদ ই আযম যে চিঠি লিখেছিলেন, তা থেকে একটু খানি উদ্ধৃতি দিয়ে আমি এ সংক্ষিপ্ত ভাষণ শেষ করবো ঃ

> আমার কাছে তিনি বন্ধু, নেতা এবং দার্শনিক গুরুর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। মুসলিম লীগের চরমতম সংকটকালে তিনি পর্বতের মতো অটল থেকে তাকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, এবং কখনও এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি সংকল্পচ্যুত হন নি।

প্রথিত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক আর্থার জে. আর্বারী বলেছেন-

একালের সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাবলী সম্পর্কে আলোচনাকালে আমাদের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকরা নিঃসন্দেহে একটি ব্যাপারকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করবেন। তা হলো ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবর্তীকালে প্রায় দশ কোটি মানুষের সমবায়ে এমন একটি স্বাধীন জাতির আকস্মিক ও বিস্ময়কর অভ্যুদয়, জাতীয়ত্বে যার প্রধান দাবীর ভিত্তি হলো বাসভূমির অতি অধিকসংখ্যক মানুষের ধর্মবিশ্বাস। ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক সমস্যার এই নাটকীয় ও দুঃসাহসিক সমাধানের আমরা এখনও এত কাছাকাছি রয়েছি যে, এর পূর্ণ তাৎপর্য ও বিকাশ সম্ভাবনা-বিচারকের দৃষ্টি দিয়ে নির্ধারণ করা আমাদের জন্যে সহজসাধ্য নয়। আমাদের পিতা-পিতামহের কাছে তো সমস্যাটির এহেন সমাধান কল্পনাতীত ছিল–বলতে বাধা নেই। কিন্তু বিশ্ব সংবাদের একান্ত অসতর্ক পাঠকের কাছেও এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে পাকিস্তান সৃষ্টির ঘটনা পরম্পরা ও ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতি আর অধিককাল অমনোযোগী থাকা সম্ভব নয়। ইউনাইটেড ন্যাশন্স্-এর বিতর্কসভায় পাকিস্তানের মুখপাত্রেরা কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে বলুন, অথবা মরক্কো বা তিউনিসিয়ার দাবী-দাওয়ার সমর্থন ব্যাপারেই বলুন তাঁদের বলিষ্ঠ পরিচিতি দ্বারা এতখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন- এবং মর্যাদা অর্জন করেছেন যে, আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটের অতি সাধারণ দর্শকও নিশ্চয়ই ভবিষ্যৎ বিশ্ব ইতিহাসে এই নবোদ্ভূত দেশের গৌরবময় ভূমিকা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবেন।

পাকিস্তান সৃষ্টি এবং পাকিস্তানের গঠন-প্রকৃতির মূলে নিহিত কারণসমূহ বিশ্লেষণের বেলায় ভবিষ্যতের ইতিহাস পাঠক বিশেষ করে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারবেন না। তিনি হলেন স্যার মুহম্মদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮), যাঁকে কেউ কেউ মনে করেন পাকিস্তানের প্রকৃত স্রষ্টা বলে। অন্ততঃপক্ষে সকলেই স্বীকার করেন যে, তিনি ছিলেন পাকিস্তান সৃষ্টির প্রধানতম প্রবক্তা। অধ্যাপক ডইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ তাঁর বিখ্যাত 'মডার্ন ইসলাম ইন্ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে ইকবালকে শতাব্দীর প্রখ্যাততম মুসলিম কবি ও চিন্তাবিদ বলে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, বিশ্বব্যাপী তিনি যে স্বীকৃতি ও সম্মান পেয়েছেন তা থেকেই উপলব্ধ হবে তাঁর মহত্ত্বের বিশালতা। তৎকালীন ভারতের মুসলিম জনগণ অধ্যুষিত প্রদেশসমূহ নিয়ে একটি স্বাধীন জাতি গঠনের যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা বলতে গেলে প্রত্যাশাতীত ত্বরিতে বাস্তবায়িত হলো; কিন্তু তিনি তা দেখে যেতে পারেন নি। দুঃখের বিষয়, যে চিন্তা-ভাবনা নিয়ে তিনি নিজের শেষ জীবনে অশেষ মানসিক দ্বন্দ্বে ও এমন কি, দৈহিক ক্লেশে কালযাপন করেছেন, তা যে এত শীঘ্র ফলপ্রসূ হতে যাচ্ছে, এ সান্ত্বনাবাণীও তাঁর কাছে কেউ পৌঁছাতে পারে নি। কিন্তু স্বাধীন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সহস্র সহস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধে ও বই-পুস্তকে তাঁকে পৃথিবীর এই বৃহত্তম ও সমৃদ্ধতম মুসলিম রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠাতা বলে অভিনন্দিত করা হয়েছে। তারপর বছরের পর বছর গত হয়ে চলেছে, কিন্তু তাঁর প্রতি নিজ দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাবোধ একটুও শিথিল হয়নি।

ইকবাল ছিলেন একজন কবি এবং সাথে সাথে একজন দার্শনিক। তিনি তাঁর দার্শনিক মতবাদ গদ্যের চেয়ে কবিতার ভাষায় প্রকাশ করাটাই বেশী পছন্দ করতেন। সম্ভবতঃ

বিশেষ করে এ কারণেই তিনি এখন পর্যন্ত পাশ্চাত্য দেশসমূহে যথোচিতভাবে পরিচিত হতে পারেন নি, কিম্বা অনেকক্ষেত্রে তাঁর মতবাদের অপব্যাখ্যা হয়েছে। তা ছাড়া তাঁর গদ্য রচনা অতি অপ্রতুল, এবং এগুলোর বেশীর ভাগ ইংরেজী ভাষায় লিখিত। অন্য পক্ষে, তাঁর কবিতাবলী রচিত হয়েছে উর্দু ও ফার্সী ভাষায়। সে-সব ভাষার আঙ্গিক ও বর্ণনারীতির অনুসরণে। ফলে, এসব কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করে নেওয়া হলেও, তা পাশ্চাত্যের পাঠকদের কাছে বিদেশী ও অপরিচিত মনে হয়। অধিকন্তু তাঁর রচনারীতি অত্যন্ত ইডিয়ম-পুষ্ট এবং ভাবধারাও অনেক সময় অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ্মরূপ নেয়। এ সব ভাষার সাথে যে পাঠকের গভীর পরিচয় নেই, তার জন্যে কবির বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ ও সঙ্গতি অনুধাবন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রাচ্যের এমন আর কোনো কবির সাথে পরিচয়ের ভাগ্য আমার হয়নি, যিনি অনুবাদকের জন্যে এত বহুবিধ ও দুর্লঙ্ঘ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পেরেছেন। এমন কি, অধ্যাপক নিকলসন হেন বিশ্ব প্রসিদ্ধ আরবী ফার্সী ভাষাবিদ্ তাঁর আস্‌রার ই খুদীর অনুবাদের ভূমিকায় বলেছেন,

> জানি না, আমি ঠিক মতো এর অর্থ বুঝতে পেরেছি কি-না এবং যথাযথভাবে তা আমার ভাষায় প্রকাশ কাতে পেরেছি কি-না।

ইকবালের বহুমুখী প্রতিভার সাথে আমাদের প্রথম পরিচয় হয় তাঁর ফার্সী ভাষায় রচিত দর্শনধর্মী মহাকাব্য আসরার ই খুদীর মাধ্যমে। পরলোকগত অধ্যাপক আর এ *নিকলসন দ্য সিকরেট্‌স্ অব দ্য সেলফ্‌* (খুদী-রহস্য) নাম দিয়ে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে এ গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থে ইকবাল সমাজ-ব্যক্তি সম্পর্ক সংক্রান্ত তাঁর মতবাদের প্রথম অংশের বিকাশসাধন করেছেন। তিনি অধ্যাপক নিকলসনকে লেখেন-

" ধরাপৃষ্ঠে আল্লাহর রাজত্বের অর্থ হলো ঃ যতখানি সম্ভব বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমবায়ে গঠিত গণতন্ত্র। আসরার-এর প্রধান বিষয়বস্তু হলো 'খুদী' (অহং) বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন যে, মানুষের নৈতিকত্ত ধর্মীয় আদর্শ আত্ম-অস্বীকৃতিতে নয়, বরং আত্মপ্রতিষ্ঠায়, মানুষ এ আদর্শে উপনীত হয় অধিক থেকে অধিকতর বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, একমাত্র আদর্শ ইসলামী সমাজেই (অবশ্য এ সমাজকে তিনি যেভাবে বুঝেছেন) ব্যক্তি এ রকম পরিপূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করবার আশা করতে পারে।

এ মতবাদের দ্বিতীয় অংশ তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর *রমুয-ই বেখুদী* কাব্যগ্রন্থে। এ বইটি আমি *'দ্য মিস্ট্রীয অব সেলফ্‌লেস্‌নেস্'* (আত্মবিলোপন রহস্য) নাম দিয়ে অনুবাদ করেছি। এ কথা সহজবোধ্য যে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যদি ইকবালীয় ব্যক্তিত্ব মতবাদের বিকাশ সম্ভাবনাকে বিচার করা হয়, তবে দেখা যাবে যে, তাতে অবাধ আত্মসর্বস্বতা এবং অরাজকতার পথ প্রশস্ত হবে। কিন্তু ইকবাল শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও আত্মপ্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়েই চিন্তা করেননি, সাথে সাথে একটি আদর্শ সমাজ (Society) তার কথায়, আদর্শ সম্প্রদায় (Community) উদ্ভবের কথাও বলেছেন। এহেন একটি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি হিসেবেই, দ্বন্দ্ব এবং আপোষমূলক দ্বৈত নীতির সহায়তায় মানুষ পরিপূর্ণভাবে এবং আদর্শভাবে নিজেকে বিকশিত করে তুলতে পারে। অপরপক্ষে, এ রকম আত্মপ্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাহার রূপেই প্রকৃত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হতে পারে

এবং তা আদর্শ সম্প্রদায় রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। এ ভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ইকবাল একদিকে যেমন ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব করে এবং ব্যক্তিকে একটি সুসামঞ্জস্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে অতি উদারপন্থীদের দল থেকে আলাদা রয়েছেন, অন্যদিকে তেমনিই ব্যক্তির ওপর সম্প্রদায়ের অধিকারের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করে এবং সম্প্রদায়কে ব্যক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রয়াসের ক্ষেত্রে উপলক্ষ্যরূপে দাঁড় করিয়ে, আর ব্যক্তির জন্যে সে পথের বাধা-বিপত্তি-উল্লঙ্ঘন সম্ভাবনাকে স্বীকৃতি দিয়ে সমাজ-সর্বস্বতার খপ্পর থেকেও নিজেকে মুক্ত রেখেছেন।

অতি সংক্ষেপে ও সহজ দৃষ্টিতে এ দু'টি কাব্য গ্রন্থের এ-ই মৌলিক ভাববস্তু। এসব ধারণা অবশ্য একান্তই অভিনব নয়; আর ইসলামই যে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার একমাত্র ভিত্তিভূমি- এ কথাও নতুন বলা হয়নি। অবশ্য এ চিন্তাপরম্পরার একটি নতুন দিক রয়েছে, যার জন্যে ইকবালকে এ ক্ষেত্রে আধুনিককালের চিন্তানেতা বলে স্বীকৃতি দিতে হবে। তা হলো ঃ ইসলাম যে অন্য সব ধর্মবিশ্বাস ও সমাজপদ্ধতির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, এই ধর্মীয় রাজনৈতিক মতবাদে ইকবালের ব্যক্তি সম্প্রদায় সম্পর্কমূলক দর্শনের কৃতকার্যতাপূর্ণ প্রয়োগ। বর্তমানকালে ইসলামী একত্বের জন্যে প্রচারকার্য আরম্ভ হয়েছে জামালুদ্দীন আফগানী (১৮৩৭-৯৭)-এর সময় থেকে এবং তা অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে। ইকবাল এ প্রবক্তা দলের শেষের দিকের একজন এবং সর্বাধিক প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তি। সাধারণভাবে ভাবপ্রবণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি আন্দোলনকে তিনি অনেকখানি চিন্তা ও বিচারভিত্তিক আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন।

রমুয-এ ইকবাল ইসলামকে বিশ্বজনীন ভিত্তিতে দাঁড় করিয়েছেন। জীবনের এ পর্যায়ে তিনি নিবিষ্টভাবে চিন্তা করেছিলেন- কি করে খিলাফতের পুনরাবির্ভাব ঘটিয়ে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে পৃথিবীর ত্রিশ কোটি মুসলমানকে একত্র করা যায়। পরবর্তীকালে উস্‌মানিয়াহ্ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়লো, খিলাফত অন্তর্হিত হলো, তুরস্ক ধর্মনিরপেক্ষ রূপ নিলো এবং আরব জাতিগুলি কতিপয় তথাকথিত স্বাধীন অথবা অর্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে অভ্যুদিত হলো। এসব কারণে তাঁকে নিজের আশাবাদী কল্পনাবলীর সাথে নতুন করে বোঝাপড়া করতে হলো, এবং তিনি তার অনেক কিছু সংশোধন করলেন। এ সম্পর্কে তিনি তাঁর *রিকন্‌স্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম* (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন) গ্রন্থে (১৯৩৪) বলেছেন,

> বর্তমানে প্রত্যেকটি মুসলিম জাতিকে তার নিজ দেহের গভীর অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করতে হবে; কিছুকালের জন্যে তার চিন্তার পর্দায় নিজেরই ছবি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এ ভাবে সব ক'টি মুসলিম জাতি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিমান হবার পরই তারা একটি জীবন্ত গণতন্ত্র সমাহার গড়ে তুলতে পারবে। জাতীয়তাবাদী চিন্তাবিদদের ধারণানুযায়ী সত্যিকারের এবং জীবন্ত একতা শুধু একটি প্রতীক-নির্ভর অধি স্বামিত্ব আরোপ করে অর্জন করা সম্ভব বলে মনে করা চলে না।
>
> এহেন একতা সত্যিকারভাবে দেখা দিতে পারে, এমন কতকগুলো স্বাধীন-সার্বভৌম ইউনিট সমবায়ে, যাদের পরস্পরের মধ্যেকার জাতগত (Racial) প্রতিদ্বন্দ্বিতার বোঝাপাড়া ও মীমাংসা হতে পারে একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক আশা-

> আকাঙ্ক্ষাজনিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের দ্বারা। আমার মনে হয় যে, আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে ধীর মন্থরে এই সত্য বোঝাতে চান যে, ইসলাম জাতীয়তাবাদও নয়, সাম্রাজ্যবাদও নয়; ইসলাম প্রকৃত প্রস্তাবে হলো একটি জাতিসংঘ-যা কৃত্রিম সীমারেখা ও জাতগত বৈশিষ্ট্য মানে শুধুমাত্র পরস্পরের পরিচিতি সৌকর্যের খাতিরে এ সব নিয়ে পরস্পর সামাজিক সংশ্রব ও সম্পর্ককে ক্ষুণ্ন করবার জন্যে নয়।

এ মনোভাব থেকেই তিনি চেয়েছিলেন ভারতীয় জাতীয়তার ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে মুক্ত করে আনতে এবং আলাদা সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তন করতে। স্বর্গরাজ্য পত্তনের তারিখ পিছিয়ে দেয়া হলো; কিন্তু এর মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদনের দায়িত্বের প্রতি নির্দেশ করতে ইকবাল ভোলেননি।

একদিন যাঁরা ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বকে নগণ্য মনে করে আত্মতুষ্টি লাভ করেছিলেন, ১৯৫২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারীতে সংঘটিত কায়রোর কালো শনিবার (Black Saturday) তাঁদের চোখ খুলে দিলো। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, এ পরিস্থিতি সত্যিই বিপদসঙ্কুল। এহেন বিপদাশঙ্কার সব সতর্কতা চিহ্ন যে এতদিন নির্বিকারচিত্তে এড়িয়ে যাওয়া হলো– এই আশ্চর্যের বিষয়। অনেক দিন থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে ,ব্যাপারটি অবহেলাযোগ্য নয়।

ইকবাল লিখেছিলেন ঃ

> "আপনারা বিশ্বাস করুন, মানুষের নৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা আজকের দিনে উপস্থিত হয়েছে।

তিনি এ সতর্কবাণী যে পূর্বেও উচ্চারণ করেন নি, তা নয়; তা ছাড়া আজকে একথাও তিনি মানুষকে শুধু শুধু উত্তেজিত করে তুলবার জন্যে বা ভয় খাইয়ে দেবার জন্যে বলেন নি। এমন কি, এ অরণ্য রোদন তিনি যে একলাই করে গেছেন, তাও নয়। পৃথিবীর শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি এ কালীন হুমকি বিভিন্ন দিক থেকে এসেছে ও আসছে। যে আপোষহীন শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা এককালে নাটকীয় ও রক্তাক্ত ক্রুসেডে পর্যবসিত হয়েছিল, বর্তমান অবস্থা কোনো অংশেই তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

জটিল বিষয়কে অতিরিক্ত সহজ করে দেখা একটি বড় অন্যায়; এর মধ্যে অনেক সময় অসাধু বুদ্ধিও জড়িত থাকে। বিংশ শতাব্দীর সম্ভবত এ একটি বিশিষ্ট প্রবণতা। বর্তমান পৃথিবী বয়স্কদের শিক্ষার জন্যে মননশীল সাহিত্যের চেয়ে জনপ্রিয় খবরের কাগজাদির ওপর অধিকতর জোর দিয়ে থাকে। মানুষ মোটামুটি শিক্ষিত মানুষই বলবো, বর্তমানে পত্রিকাদির শিরোনাম পাঠ করেই জগত ও জীবনকে জানতে অভ্যস্থ হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায়, এটা আর সম্ভব মনে হয় না যে, কোনো ব্যাপারে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আন্তরিকতাপূর্ণ– অতএব বিনম্র মূল্যায়ন বেশী সংখ্যক মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হবে। কোনো কার্যরত দার্শনিকের সামনে দাঁড় করাবার জন্যে ইকবাল তাঁর মতবাদকে বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে সূত্রাবদ্ধ করতে সতত প্রস্তুত ছিলেন। তিনি লিখেছেন, ইউরোপের আদর্শবাদ কখনও ইউরোপীয় জীবনে জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়নি; এবং তাতে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, একটি বিকৃত অহমিকা কতগুলো পরস্পর অসহিষ্ণু গণতন্ত্রের মাধ্যমে অভ্যুদিত হয়ে ধনশালীর স্বার্থে দারিদ্র্য পীড়নকেই তার জীবনের উদ্দেশ্যরূপে

গ্রহণ করেছে। ইকবালের এ ধরনের মতামতের জন্যেই এমনকি কম্যুনিস্ট সম্প্রদায় পর্যন্ত তাঁকে নিজেদের বলে দাবী করতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। অবশ্য পৃথিবীকে শাদা ও কালো দু'বর্ণে অঙ্কনের প্রয়োজনীয়তা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় অঞ্চলের রাজনীতিকদের জন্যে সমভাবেই রয়েছে; কিন্তু যখন কোনো রাজনীতিক প্রফেট্ (ভবিষ্যৎদর্শী মহাপুরুষ)-এর ভেক ধরেন, এবং সাঙ্গপাঙ্গরা তাঁকে সেভাবে গ্রহণ করেও চালাবার চেষ্টা করে, তখন তাঁর জন্যে সস্তায় বাজিমাৎ করবার ছেলেমানুষী চিন্তা ও কর্ম দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক হয়ে দাঁড়ায়, যদি না তিনি হিট্লার হেন উচ্চাশা নিয়ে কিছু একটা ত্বরিত সংঘটনের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করে থাকেন।

আমার নিজ চিন্তা-ভাবনায়, সমসাময়িক রাজনীতির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও বিপদসঙ্কুল ব্যাপার হলো বর্তমান প্রাচ্যের প্রতীচ্যের প্রতি ঘৃণাভাব। পরাজিত ও অনুতপ্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র বিজয়ী সুলভ প্রতিক্রিয়া বলে একে উড়িয়ে দেওয়া উচিত হবে না। নিঃসন্দেহে এ মতের অনেকখানি সত্য; কিন্তু আসলে এর শিকড় আরও অনেক গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে। এ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে যে ক্ষুদে বুদ্ধিজীবীরা পৃথিবীময় প্রচার করে বেড়িয়েছিলেন যে, ইউরোপীয় সভ্যতা একেবারে ধ্বংসোন্মুখ এবং মনে করেছিলেন, যে কুলায় তাঁরা বর্ধিত তা আর মোটেই তাঁদেরকে ধরে রাখবার যোগ্য নেই, তাঁদের ক্রিয়াকর্মকে অবশ্য এ দুর্দশার জন্যে পুরোপুরি দায়ী করা চলে না, যদিও তাঁদের ইতস্তত ছড়ানো বীজ এখন মোটা ফসলই ফলাচ্ছে। দু'টি বিশ্বযুদ্ধে যে নর-সংহার পর্ব উদ্‌যাপিত হয়েছে, তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াও বিশেষভাবে এর জন্যে দায়ী নয়, যদিও তাতে আমাদের আত্মপ্রসাদের অনেকখানি বাস্তব যৌক্তিকতা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এসব কিছুই এ ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে বর্তমান রয়েছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এসব কিছুর অন্তরালে রয়েছে সেই দৃপ্ত চ্যালেঞ্জ যা তেরোশত বছরেরও পূর্বে আরব মরুভূমি থেকে উত্থিত হয়েছিল, এবং বার বার ইকবাল এবং তাঁর পূর্বসূরী ও উত্তরসূরীবৃন্দের দ্বারা নতুনভাবে উৎক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে। ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় দাবী জানায় যে, ইসলামই হলো মানুষের জন্যে বিশ্ববিধাতার দেওয়া শেষতম ঐশী ব্যবস্থাপত্র এবং এর আবির্ভাব অন্য সব ধর্ম বিধানকে বাতিল করে দিয়েছে।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপ ইসলামের প্রতি অবজ্ঞা ও অন্যায়াচরণ দেখিয়ে এসেছে- এই অর্থে যে, মুসলিম সভ্যতার বিশিষ্ট অবদানসমূহকে সে অবহেলার চোখে দেখেছে, যথাযথ স্বীকৃতি দেয়নি; এবং এ ক্ষেত্রে ইউরোপের বিদ্বজ্জনেরা ধর্মাচার্যদের অনুচররূপে কাজ করে গেছেন। এই অবিচারের বিরুদ্ধে আমীর আলী ও তাঁর সহকর্মীরা ন্যায্যতই প্রতিবাদের সুর তুলেছেন। আর যেহেতু যুক্তি-তর্কই এক্ষেত্রে ইউরোপের প্রধান অস্ত্র ছিল, ইসলাম যখন সেই একই অস্ত্র ইউরোপের বিপক্ষে প্রয়োগ করতে শিখলো, এবং এমনকি, সমান কৌশল ও উদ্যমের সাথে সে অস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করলো, তখন তা নিয়ে ইউরোপের নালিশ-দরবারের আর কীই বা যুক্তি থাকতে পারে? বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে যে উদারপন্থী আন্দোলন চলে এসেছে, তার ফলে মানব সভ্যতায় ইসলামের দান সম্বন্ধে অনেকখানি বাস্তবপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশ লাভ করলো। আমীর আলীর জন্মের অনেক পূর্ব থেকেই ইউরোপীয় বিদ্বজ্জনেরা গণিত শাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, বিজ্ঞান, ললিত কলা, সাহিত্য, আইন, দর্শনশাস্ত্র, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রের যে-সব অবদানের জন্যে উদার এবং সরল দৃষ্টিতে ইসলামকে দায়ী করা চলে, পরমোৎসাহে সেগুলো আবিষ্কার ও

প্রচারে লেগে যান। এই পূর্বসূরীদেরকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাঁদের সেই মধ্যযুগীয় আবিষ্কৃতি ও তথ্যাবলীকে খুঁটিয়ে বের করা এবং প্রচার করা এখন একটি ফ্যাশনে পরিণত হলো। এভাবে মধ্যযুগীয় ইসলাম থেকে ইউরোপ যা গ্রহণ করেছে তা দৈনন্দিন যথাযথ স্বীকৃতি লাভ করে চললো।

তাঁদের বিগত দিনের মহত্ত্ব সম্বন্ধে পন্ডিত ব্যক্তিদের এসব অপক্ষপাত প্রশংসাবাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলিম লেখকরা দিন দিন অধিকতর প্রত্যয় ও কড়াকড়ির সাথে বলতে লাগলেন যে, ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে যা কিছু ভাল আছে তা হলো ইসলাম থেকে নেওয়া এবং যা খারাপ আছে তা অন্যান্য সূত্রে আহরিত। জনৈক পাক ভারতীয় লেখক (এফ. কে. দুররানী) এমন পর্যন্ত বললেন যে,

> "সপ্তম শতাব্দী থেকে আজকের দিন পর্যন্ত জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা প্রত্যক্ষভাবে হোক বা পরোক্ষভাবেই হোক ইসলাম প্রতিষ্ঠাতার মানস থেকেই উদ্ভূত।" এর থেকে সামান্যই অল্প উৎফুল্লচিত্তে ইকবাল বললেন-

"আমাকে বিশ্বাস করুন, ইউরোপ আজ মানুষের নৈতিক অগ্রগতির পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। অপর পক্ষে, যে-সব চরমতম ধারণা মানবাত্মার নিগূঢ় প্রদেশ থেকে কথা বলে ওঠে, এবং বাহ্যদৃষ্টিতে বহির্মুখীরূপে প্রতিভাত- অনুভূতিসমূহকে আন্তর্জাতিকতা গুণে গুণান্বিত করে, মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে সেগুলো ঐশীবাণীর মাধ্যমেই প্রাপ্ত ও আয়ত্ত। মুসলিমের কাছে জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি একটি দৃঢ় প্রত্যয়ের ব্যাপার; এর জন্যে সে সহজেই জীবনপাত করতে পারে। এছাড়া, ইসলামের মৌলিক নীতি অনুসারে আর কোনো ঐশীবাণী অবতীর্ণ হতে পারে না যা মানুষের ওপর বাধ্যতামূলক হবে। মুসলিম সম্প্রদায়ই আধ্যাত্মিক জীবনে পৃথিবীর সবচেয়ে অধিক বন্ধনমুক্ত জাতি হতে বাধ্য। আজকে আমাদেরকে নিজেদের অবস্থা ও অবস্থিতি সম্পর্কে সজাগ হতে হবে। আমাদের কর্তব্য হলো ইসলামের মৌলিক উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে নিজেদের সমাজকে পুনর্গঠিত করা এবং এখন পর্যন্ত মাত্র আংশিকভাবে বিকাশপ্রাপ্ত ইসলামী ধারণাবলীকে আত্মস্থ করে সেই আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা- যা ইসলামের চরম লক্ষ্য।'

দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে, টেবিল এদিক থেকে ওদিকে ঘুরে গেছে। প্রতীচ্য নিজ উদ্যোগে এগিয়ে গিয়েছিল প্রাচ্যকে নতুনভাবে শিক্ষিত করে তুলতে; কিন্তু ফল হলো এই যে, প্রতীচ্যকেই এখন প্রাচ্যের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হচ্ছে।

ব্যাপারটিকে কতোখানি কিভাবে নিতে হবে? লন্ডন, প্যারিস কিম্বা নিউইয়র্কে আরাম কেদারায় গা হেলিয়ে দিয়ে আপনি বলতে পারেন; পাগলামী, বাকযুদ্ধ, ফাঁকা আওয়ায। এহেন মনোভাব আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই যে নয়- তা যে কোনো চক্ষুষ্মান পরিব্রাজক মুসলিম বিশ্বের বাস্তব অবস্থা দেখে এলে বুঝতে পারবেন। কায়রোর কালো শনিবারের ঘটনাকে কেউ কেউ ইচ্ছা করলে বলতে পারেন যে, তা হলো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র উত্তেজনার একটি বহিঃপ্রকাশ মাত্র; কিম্বা বলুন এ হলো কম্যুনিষ্টদের বিফল উত্থান প্রয়াস, অথবা প্রাচ্যবাসীদের চিরকালীন শৃঙ্খলাভঙ্গকরণ প্রবণতার প্রকাশ। কিন্তু সে প্রসঙ্গ ছাড়াও, যে-কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি মরক্কো থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত পৃথিবীর একটি অধিকতর অর্ধেক স্থলব্যাপী অঞ্চলে যদি একটি দিনও যাপন করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, ইসলাম এবং ইউরোপ এখন একটি যুদ্ধোন্মুখ অবস্থায় পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে কালাতিপাত করছে। শান্তি এবং সংগ্রামের সীমারেখা অদূরবর্তী। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়

আমরা ইউরোপীয়, আফ্রিকান বা এশিয়ান যা-ই হই না কেন, একটি বিপদসঙ্কুল যুগে বাস করছি। যে কোনো সময় হয়তো আমরা এমন বৃহৎ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়বো যেমনটি রিচার্ড সালাহুদ্দীন দ্বন্দ্বের পরে আর ঘটেনি। এখনও কি আমরা সত্যি সত্যি মনে করতে পারি যে, বাস্তবের সাক্ষ্য ভিন্নরূপ?

যদি এই ভীতিপ্রদ অথচ অনাবশ্যক আশঙ্কা থেকে আমরা মুক্ত হতে চাই, তাহলে আমাদের অবশ্যই উচিত নতুন সূত্রে এবং অবিরতভাবে চেষ্টা করা পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝে নেবার। আমরা এখনই

প্রথমতঃ পরস্পরের মধ্যেকার বর্তমান উত্তেজনা হ্রাস করা,

দ্বিতীয়তঃ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক বোঝাপড়ার আশা এবং শেষ পর্যন্ত, দু'পক্ষের সাধারণ আদর্শের দিকে এগিয়ে যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত হতে পারি। রমুযই বেখুদীর অনুবাদ করবার বেলায় আমি একজন বিশিষ্ট মুসলিম চিন্তাবিদ ও কবি দ্বারা শক্তিমান ভাষায় উচ্চারিত মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। আমার নিজ দিকে থেকে, আমার খৃষ্টধর্মীয় পিতৃপুরুষগত বিশ্বাসের দ্বারা আমি কোনো মুসলিমকে প্রভাবিত করতে চাই না। আমি অবশ্য বিশ্বাস করি যে, খৃষ্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে বর্তমানে যে বিরোধ রয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত করা সম্ভব না হলেও তাকে অন্ততপক্ষে এমন একটি পথে চালিয়ে আনা যায়, যাতে তা ভাবপ্রবণতার বিপদসঙ্কুল অঞ্চল পার হয়ে এসে অধিকতর নিরাপদ বুদ্ধি-আশ্রয়ী বাদানুবাদের পর্যায়ে এসে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় স্পষ্ট দেখা যাবে যে, এই দুই ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে বিবদমান অঞ্চলের তুলনায় মিলনসুলভ অঞ্চলের পরিধি অনেকখানি বৃহত্তর, এবং কালক্রমে বিরোধের চেয়ে সহযোগিতা স্পৃহাই এদের মধ্যে বড় হয়ে দেখা দিতে পারে। এটি সত্যিই সম্ভব এবং এ সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হবে যদি খৃষ্টান এবং মুসলমান দু'সম্প্রদায়ই যথাশীঘ্র এবং স্পষ্টত বুঝতে পারে যে, তারা এখন এমন একটা সাধারণ শত্রুর সম্মুখীন হয়ে পড়েছে যে, তারা যদি একযোগে একে প্রতিরোধ করতে না দাঁড়ায় তবে তাদের দু'পক্ষকেই একযোগে ধ্বংস করবার ক্ষমতা সে রাখে।

আমেরিকা

ওয়াশিংটন ইকবাল সোসাইটি কর্তৃক অনুষ্ঠিত ইকবাল মৃত্যু দিবস পালন (২১-৪-৪৬) উপলক্ষে ডক্টর মিস্ শীলা ম্যাকডোনফ বলেন-

ইকবাল *আর্ট ফর আর্টস্ সেক* (ললিত কলার বিকাশেই ললিত কলার চরিতার্থতা) পন্থীদের একজন ছিলেন না, একমাত্র আত্মোপলব্ধি ও আত্মপ্রচারণার উদ্দেশ্যেও তিনি লেখনী ধারণ করেননি। তিনি বরঞ্চ তাঁদের দলের একজন, যাঁদের অন্তরে সৃষ্টিশীল আবেগ দুঃখজনক হয়ে দেখা দেয়। কেননা, তিনি তাঁর প্রেরণা অন্যে সংক্রমিত করতে চাইতেন- এবং সাথে সাথে গভীরভাবে অনুভব করতেন যে, ভাষা এবং ভাষণরীতি তাঁর অন্তরের আবেগকে মূর্ত করতে অসমর্থ। নিজ উপলব্ধিকে প্রকাশের বেলায় ভাষার দৈন্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

> ভাষার কঠিন আবরণের অন্তরালে সত্যের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।

এ প্রসঙ্গে টি. এস. ইলিয়টের অনুযোগও আপনাদের মনে পড়বে। তিনিও বলেছেন যে,

> ভাষার গুরুভার কবিমনকে উন্মুক্ত করে ধরবার পথে দুর্লঙ্ঘ বাধার সৃষ্টি করে।

তাঁর কথায় ঃ

> Words strain,
> Crack and sometimes break under teh burden.
> (এ বোঝার চাপে, ভাষা মচ্‌কে যায়, দুমড়ে যায়, কখনো বা ভেঙ্গে পড়ে।)

ইকবাল ও ইলিয়টের মধ্যে যে-সব সাদৃশ্য রয়েছে, তার বিস্তারিত আলোচনা উপস্থিত ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। দু'জনেই নিঃসন্দেহে এ শতাব্দীর বিশিষ্ট ধর্মীয় কবি। এই দুই আন্তরিকতাধর্মী কবিই মনোভাব প্রকাশের বেলায় ভাষার অসামর্থ্যহেতু নৈরাশ্যের সম্মুখীন হয়েছেন; দু'জনেই অন্তরের দিব্যদৃষ্টির ভারে নিজেদেরকে পীড়িত বোধ করেছেন। ইকবাল বলেছেন ঃ

> ঈমান হলো অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপণোন্মুখ ইব্রাহীমের মতো,
> অন্য কথায়- আত্মসম্মানবোধ ও আল্লাহ-এ তন্ময়তা।
> অমার কথা শোনো!

ইকবালের এ ঐকান্তিকতা তাঁর ধর্মবিশ্বাসের গভীরতার নিদর্শন। ইব্রাহীমকে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করার কুরআনীয় কাহিনী থেকে তাঁর যে অবিচল ধর্মবিশ্বাস ও আল্লাহ্-

নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছিল, তেমনই ঐকান্তিক নিষ্ঠা ইকবাল চেয়েছেন জীবন-যাপন ক্ষেত্রে এবং তাঁর নিজের বেলায়, তাঁর কাব্য প্রচেষ্টায় আহ্বান করতে। ইকবাল বিশ্বাস করতেন ঃ যারা সাহসিকতা ও সৃষ্টিধর্মী প্রবণতা নিয়ে অস্তিত্বের অভিব্যক্তিসমূহের সাথে মুকাবিলা করতে চায়, তাদের জন্যে জীবন হলো যেন একটি সর্বক্ষণ প্রজ্বলন্ত অগ্নিশিখা–যা তাদের বিশ্বাসকে অনবরত যাচাই করে চলেছে।

তিনি যখন বলেন, '

> আমার কথা শোনো!' তখন তিনি নিশ্চয়ই বোঝাতে চান যে, তাঁর লেখার একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে; এবং তা হলো আমাদের প্রচলিত জীবন-যাপন পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া, আর আমাদের অন্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সঞ্চার করা।

আমার মনে হয়, আমাদের ইকবালকে বোঝার চেষ্টা করা উচিত কর্দোভা মসজিদ পরিদর্শন করে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে। এ প্রসঙ্গে আমি 'দিব্যদৃষ্টি অথবা ধ্বংস' কথাটার ওপর জোর দিচ্ছি। এর কারণ দু'টি।

প্রথমত ঃ এ থেকে বোঝা যায় মহান কর্দোভা মসজিদ দেখে তাঁর চেতনায় কাল-সমস্যা সম্বন্ধে তাঁর অনুভূতিকে সম্যক-রূপ দান করেছে। একে ইলিয়ট উল্লেখ করেছেন 'ইতিহাসের ভয়াবহতা' বলে। মুসলিমের চোখে এ সমস্যার সমাধান কি তা-ও আমরা ইকবালের কাছে জানতে পারি এ প্রেক্ষিতে। 'দিব্যদৃষ্টি অথবা ধ্বংস'–এর মধ্যেই রয়েছে কর্দোভা মসজিদ ইকবালকে কি বলছে তা বোঝবার চাবিকাঠি, অন্য কথায়-ইকবাল পরম আকুলতার সাথে আমাদের কি বোঝাতে চান তার হদিস।

দ্বিতীয়তঃ কথাটা অবশ্য ইংরেজীতে পাওয়া যাবে 'বুক অব প্রভার্বস্'-এ এভাবে–

Where there is no vision, the people perish

(যেখানে দিব্যদৃষ্টি নেই, সেখানে মানুষের অন্তিম দশা)। প্রতীচ্যবাসীদের যাঁরা ইকবালের উদ্দেশ্যের অনুধাবন করতে চেষ্টিত, তাঁদের জন্যে বোঝা প্রয়োজন যে, তাঁর লেখায় রয়েছে কিছুটা ভাববাদী আমস (Prophet Amos) অথবা ব্যাপ্‌টিস্ট জন (John the Baptist)-এর ব্যঞ্জনা। আমরা অনেক সময় মনে করি যে, প্রাচ্য দেশীয় কবিদের ভাবধারা হবে মৃদুমধুর ও আবেগপূর্ণ। ইকবাল অস্পষ্টতা ও তারল্য থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা তাঁর শর্তানুযায়ী তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করলে দেখতে পাবো যে, তিনি প্রায়শঃই দৃপ্ত ও কঠোর। তাঁর বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে অপরিচিত হবার কথা নয়। কেননা, সেমিতীয় ভাববাণীর একাগ্র প্রাখর্যে প্রোথিত রয়েছে এর মূল এবং তা আমাদের ঐতিহ্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

একজন প্রতীচ্যবাসী খৃষ্টান হিসেবে আমি যদি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি; ইকবাল কি সূত্রে আমার অন্তরের কাছে সরাসরি এসে দাঁড়ান, তার জবাবে আমি বলবো ঃ তা হলো, উদাহরণতঃ ইতালীর আবিসিনিয়া আক্রমণ উপলক্ষে রচিত তাঁর কবিতার কষাঘাত। এ তিরস্কার আমার কাছে অতি স্পষ্ট ও প্রখর ঃ

> পাশ্চাত্যের এই গৃধ্রকুলের এখনও জানবার বাকী রয়েছে
> আবিসীনিয়ার শবদেহে কত হলাহল উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।
> হায়! চার্চ-এর প্রোজ্বল মহিমার কি পরিণতি!

ইকবাল ১৯৩৮ সালে পরলোকগমন করেন। কিন্তু মনে হয়, তাঁর বেশ স্পষ্ট ধারণা জন্মেছিল তাঁর সমকালে মানব জাতির জন্যে কি কি দুঃখ ভূমিষ্ঠ হবার অপেক্ষায় রয়েছে। উপরি-উদ্ধৃত বাণীতে তাঁর যে কঠোরতা আত্মপ্রকাশ করেছে, তা যুক্তিযুক্ত ছিল বলেই মনে করতে হবে।

আমাদের স্মরণীয় যে, ইকবালের মূল প্রচেষ্টা খৃষ্টানদেরকে একটা অধিকতর সততাপূর্ণ এবং সৃজনশীল আত্মবিশ্লেষণের দিকে আহ্বান করার ব্যাপারে ছিল না, বরঞ্চ তা ছিল মুসলমানদেরকে আত্মপ্রসাদ ও স্বপ্নমধুর পরজগত বিহারের বদভ্যাস থেকে মুক্ত করবার ব্যাপারে। খৃষ্টানদের প্রতি কার্যকারিতা থেকে আমি বুঝতে পারি, তিনি যখন সর্বপ্রচেষ্টায় এবং তুলনাহীন নৈপুণ্যের সাথে নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি সঠিক লক্ষ্যে তীর ছুঁড়েছেন, তখন তা কত বেশী প্রাণস্পর্শী হয়ে থাকবে। তিনি যখন বলেন 'আমর কথা শোনো!', তখন তিনি সাধারণত বোঝাতে চেয়েছেন যে, একথা তাঁর শ্রোতাদেরকে আঘাত হানবে; কিন্তু সাথে সাথে তিনি এ সান্ত্বনাও দিয়েছেন যে, এ আঘাত বিরূপাত্মক নয়; কেননা তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের মধ্যে সততাপূর্ণ ও সৃষ্টিধর্মী জীবন স্পন্দনের উদ্বোধন করা।

এখন 'মসজিদ-ই-কার্দোভা' কবিতাটির দিকে লক্ষ্য করে আমরা বলতে পারি যে, এর প্রাঞ্জলতা যে-কোনো পাঠককে তৎক্ষণাৎ বিমুগ্ধ করবে। যা হোক, যদিও ইকবাল কি বলতে চাচ্ছেন তা বুঝতে আমাদের একটুও বিলম্ব হয় না, তথাপি আমাদের মনে রাখতে হবে যে, তাঁর কবিতার ভাষার মূল রয়েছে উর্দু ও ফার্সী কাব্যের সুদীর্ঘ এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমিতে! ইকবালের রূপকল্পের সম্পূর্ণ সম্ভাব্যতার ব্যাখ্যায়নের দাবী কেউ করতে পারে নি; এ অক্ষমতা ততখানি অধিক করে দেখা দেয় তাঁদের কাছে, যাঁরা ইসলামী সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সাথে যত বেশী পরিচিত।

কাল-কে তিনি উপমিত করেছেন 'দু'রঙিন পশমী সুতো'র সাথে। এ একটা জটিল উপমা বটে। ডক্টর অ্যান মেরী শিমেল মন্তব্য করেছেন যে,

কাল সম্বন্ধে এ কল্পনা-অর্থাৎ, সৃষ্টিকর্তা কালকে দু'টা ভিন্ন রংয়ে রঙিত করেছেন, এ ধারণা-পুরাতন ইরানীয় ভাবধারার সাথে মেলে। এ ধারণা অনুসারে কালের দ্ব্যর্থবোধক রূপকে কল্পনা করা হয়েছে- এমন একটা স্বেচ্ছাচারী অস্তিত্ব বলে যা মানুষের প্রচেষ্টার প্রতি কোনো তোয়াক্কা না করেই তাকে পুরস্কৃত বা নিগৃহীত করতে দেখা যায়। সূফী কবিতা এবং প্রাক্ ইসলামী আরবী কবিতাতেও এ ধরনের বর্ণনা রয়েছে; এসব ক্ষেত্রেও মানুষের জীবনের অদ্ভুতত্ব নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ক্ষুধা ও আহার, তৃষ্ণা ও পানীয়, জীবন ও মৃত্যু জীবের কাছে এমন নির্বিচারে আসে যে, তার নিয়ন্তার কোনো খোঁজই পাওয়া সাধ্যাতীত।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ইকবাল প্রচলিত উপমা ও প্রতীক অনেক ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু তা পূর্বেকার ব্যবহারের পুনরুক্তি মোটেই নয়। তাঁর প্রতিভার অনেকখানি প্রকাশ পেয়েছে ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরাতন ভাবাদর্শের নতুন অন্তর্দৃষ্টির আলোকে স্বচ্ছন্দ বর্ণনায়। দ্বিবর্ণ-সূত্রের ব্যাপারেও তিনি কালগর্ভে অন্ধ ও নিয়মবর্জিত ঘটনাবলীর দ্বারা আরোপিত মানুষের সুখ-দুঃখ সূত্রের অজ্ঞেয়তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তিনি সেখানেই থেমে যাননি; বরঞ্চ তিনি আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন যে, কালের এই অবোধ্যতাই হলো

মানুষের কৃতিত্ব পরিমাপের কষ্টিপাথর। কালচক্রের নিষ্ঠুর নিবর্তনে কত মানুষের কত সাধনা বিফল হয়ে যায় তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু কাল-প্রসারের এক একটা বিন্দুতে, কালের এ আত্মমর্যাদাগুণে ভাস্কর হয়ে-কালজয়ী হয়ে দেখা দিয়েছে। ইকবালের দৃষ্টিতে মসজিদ-ই-কর্দোভা তেমন একটা কীর্তি। তাঁর ভাষায়, এ মসজিদ এমন একটা সৃষ্টি যার পরিপূর্ণতা প্রেমের দীপ্তিতে এখনও সমুজ্জ্বল।

প্রসঙ্গতঃ আমাদের চিন্তা করতে হয়, যে শব্দটাকে 'প্রেম' বলে অনুবাদ করা হয়েছে তার আসল তাৎপর্য কি এবং অনুভূতির কোন্ স্তর-পরম্পরা এতে নিহিত। উর্দু শব্দটি হলো 'ইশ্ক্'; ইকবালের লেখায় অনবরত এ শব্দটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে এবং নিশ্চয়ই তাঁর বিশ্বদৃষ্টি অধ্যয়নের চাবিকাঠি এতে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তবুও যেহেতু তিনি এ কথাটি এত বেশী করে ব্যবহার করেন, অতএব আমাদের বোঝা উচিত যে, তাঁর আরোপিত এ সামগ্রিক অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। নিম্নোক্ত কবিতাতে একে তিনি কি অর্থে নিয়েছেন তার কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়–

ইশ্ক্ হলো জিব্রাঈলের নিশ্বাস, মুহম্মদের প্রত্যয়পুষ্ট হৃদয়।
ইশ্ক্ হলো আল্লাহ্র দূত, আল্লাহ্র বাক্য।
আমাদের মরণশীল কর্দমও জ্বলে ওঠে ইশ্ক্-এর উন্মাদনায়।
ইশ্ক্ হলো নতুন-নিংড়ানো সুরা, রাজন্যদের সুরাপাত্র।
ইশ্ক্ হলো জীবনের উষ্ণতা।

এসব থেকে বোঝা যায় যে, ইকবাল ইশ্ক্কে বোঝাতে চেয়েছেন শক্তিধর দুঃসাহসী ক্ষমতা, আল্লাহ্র নির্দেশের এবং জীবনের স্বাস্থ্য-স্পন্দনের প্রতীকরূপে। সৃষ্টি সর্ব অভিব্যক্তির কার্যকরী জীবনীশক্তি আসে এই ইশ্ক্ থেকে। ইকবালের দৃষ্টিতে এই ইশ্ক্ই হলো অনাবিল মানব ব্যক্তিত্বে নিহিত শক্তিমত্তা। অন্য কথায়, যে পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি আত্মস্বার্থ চিন্তা এবং আত্মচেতনামূলক আশঙ্কাবলী নিয়ে পঙ্গু থাকবে, সে পর্যন্ত সে কোনো সৎকার্য সাধন করতে পারবে না। সৃষ্টিধর্মী মানুষ হলো আত্মচেতনামুক্ত মানুষ। সে নিজ পরিধির বাইরেকার সত্যকে গ্রহণে সক্ষম এবং সেই বহিরাগত সত্যের চ্যালেঞ্জ বীরদর্পে সাড়া দেয়। মানবীর ভাষায় ইশ্ক্ হলো পঙ্গুতাসৃষ্টিকারী শঙ্কা ও অস্থির আত্মচেতনার বিপরীত।

ইকবাল কর্দোভা মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে যে ভাবে বিস্ময়াবিষ্ট হবার কথা বলেছেন, আমাদের প্রত্যেকেই হয়তো কোনো না কোনো সময়ে তেমন কোনো শিল্পকার্যের সান্নিধ্যে এসে সে রকম প্রেরণা লাভ করে থাকবো। ইকবালের জন্যে এ মসজিদ সংক্রান্ত অনুভূতি দেখা দিয়েছিল এক প্রকার ভাবদর্শনের প্রকৃতিতে। তিনি এতে দেখে ছিলেন আদর্শ মুসলিমের প্রতীক। তিনি বলেছেন এখানে, "তোমার এই প্রস্তরখণ্ডসমূহের বুকে নিহিত রয়েছে তার (মুসলিমের) নিগূঢ় আত্মা।" এই দিব্যদৃষ্টি তাঁর প্রীতিকে দিয়েছিল নির্দিষ্ট স্ফটিকরূপ, যা এক কথায় হলো এই যখনই মুসলিম সম্প্রদায় আল্লাহর ক্ষমতা ও সৌন্দর্যের কাছে সুশৃঙ্খল বিশ্বাস ও উন্মুক্ত অন্তর নিয়ে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে পেরেছে, তখনই জীবনের সর্বক্ষেত্রে তারা সৃষ্টিধর্মী কর্মসাধনের শ্রেষ্ঠতম উদাহরণ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। আর এ নিদর্শন তাঁর অন্তরে এ নিশ্চিত অনুভূতি জাগিয়েছে যে, আবার সে

রকম পরিপূর্ণভাবে সুশৃঙ্খল সৃষ্টিধর্মিতার উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ তাঁর সম্প্রদায়ের জন্যে সর্বকালেই সম্ভব। মুসলমানদের নির্বুদ্ধিতাকে যখন তিনি কঠোর ভর্ৎসনা করেন তখন সর্বত্র তাঁর উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে আবার পূর্ব গৌরব অর্জনে সচেষ্ট করে তোলা।

অপর পক্ষে, কর্দোভা মসজিদের প্রতি মমতা ইকবালকে ইসলামের অতীতের প্রতি কোনো নির্বীর্য ভাবপ্রবণতার দিকে টেনে নেয় নি। মধ্য যুগের দিকে ফিরে যাবার তাঁর কোনোই অভিপ্রায় ছিল না। যেহেতু তাঁর চিন্তায় কালপ্রবাহ অতি গুরুত্বপূর্ণ, অতএব তিনি বিগত যুগের মৃত্যুকে সাধারণ ঘটনা বলেই মেনে নিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি চেয়েছেন যে, কাল বক্ষে সর্ব প্রকারের মৌলিক ও নবতর চ্যালেঞ্জেই মুসলিম জীবনকে আঘাত করুক এবং মুসলিমকে তার জড়তা থেকে বিমুক্ত করে তুলুক। তিনি জানেন যে, বিগত চারশো বছর ধরে খৃষ্টান সম্প্রদায়কে অনেকগুলো সংস্কার আন্দোলন ও বিপ্লবের দাপট সহ্য করতে হয়েছে; আর তিনি দেখতে পেয়েছেন যে, এ ধরনের নানা আঘাত মুসলমানদের জন্যেও এগিয়ে আসছে। এগুলোকে তিনি মূলত স্বাস্থ্যের চিহ্ন বলেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথায় ঃ

এখন ইসলামের আত্মা সে রকম ঝড়ঝঞ্ঝায় আন্দোলিত,
এতে কার্যকরী হচ্ছে আল্লাহর গোপন ইচ্ছা-
যার অর্থ ভাষায় অপ্রকাশ্য।
সেই সমুদ্রের গভীরতার দিকে তাকাও
এবং দেখ, কি এগিয়ে আসছে।
দেখ, কিভাবে বর্ণালীর পরিবর্তন হচ্ছে
সেই সুনীল গম্বুজের বেষ্টনীতে।

আল্লাহর গোপন ইচ্ছা- কথাটি হলো ইকবালের ইতিহাসধারা অনুধাবনের ইঙ্গিতবাহী। এর মূলে রয়েছে আল্লাহর কুরআনীয় রূপের একদিক। কুরআনে উক্ত হয়েছে যে, তিনি (আল্লাহ) অতি বিচক্ষণ এবং কুশলী।

ইকবালের মতে, ইতিহাসের ধারাকে অনুধাবনের চেষ্টা হলো আল্লাহর অঙ্গুলি সংকেত দেখার প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। একবার এ আবিষ্কার আয়ত্ত হলে বিশ্বাসী (মুমিন)-এর কর্তব্য হলো এরপর পরস্পরে সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা, এবং সুন্দর ও ন্যায়ের অধিকতর বাস্তব রূপায়ণের কাজে আল্লাহকে সহায়তাদান।

আমি মনে করি যে, এ ধারণা খৃষ্টীয় ধর্মবেত্তা পল টিলিচ ঘোষিত belief ful realism বা বিশ্বাসপ্রবণ বাস্তব চিন্তার সাথে তুলনীয়। টিলিচ বলেন যে, আমাদের সব দুর্দশা আসে হয়তো রোমান্টিক আকাশকুসুম কল্পনা থেকে, না হয় বন্ধ্য বস্তুবাদের আকর্ষণে জড়িয়ে পড়া থেকে। তিনি বলেন যে, একমাত্র খাঁটি সৃষ্টিধর্মী জীবনবোধ হলো ঃ প্রথমতঃ যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হলো তার সর্বদিককে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আয়ত্ত করে নেওয়া; তারপর সে অবস্থাপর্যায় ভেদ করে আশার ভিত্তি ভূমি আবিষ্কার করা; এবং সর্বশেষ সৃষ্টিধর্মী শক্তি অর্জন করে আর তার সোদ্যম প্রয়োগে বক্ষ্যমাণ কালকে রূপান্তরিত করা। তেমন সৃষ্টিধর্মিতা ইতিহাসের ভয়াবহতাকে জয় করার একটি যথার্থ পন্থারূপে দেখা দিতে পারে।

কখনো কখনো বলা হয় যে, ইকবাল বল্গাহীন গতিধর্মিতার প্রশ্রয় দিয়েছেন। একথা সত্য যে, ইকবালের পাঠক, বিশেষ করে উর্দু পাঠক এমন একটি আবেগের সম্মুখীন হন, যা উদ্দীপ্ত জীবনী শক্তির ধাক্কায় বিশ্বপ্রকৃতিকে কাঁপিয়ে তুলেও যেন শান্ত হয় না। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্যের আসল রূপের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, পাঠকের হৃদয় ও মনকে তিনি খেলাচ্ছেন বা হাল্কাভাবে উত্তেজিত করে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন বলে কিছুতেই মনে করা চলে না। ইকবালের নিজের বক্তব্য হলো ঃ পাঠকের মনকে নাড়া দেবার বেলায় তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। এর কারণ হলো, এই বিশ্বাসী (মুমিন) সম্প্রদায়কে এমন একটি শৃঙ্খলায় আনয়ন, যাতে তারা তীক্ষ্ণধার ছুরিকার মতো সতেজ হয়ে বেঁচে ওঠে এবং স্পষ্ট ও দৃঢ় চিন্তা ও কর্মের মাধ্যমে জীবনের সর্বপ্রকার অসঙ্গতিকে জয় করতে পারে।

শেষবারের মতো, তাঁর কথায়;

মুমিনের হাত হলো আল্লাহর হাতের মতো,
শক্তিমান এবং কৌশল চালিত।

যুক্তরাষ্ট্রে ইরানের রাষ্ট্রদূত মহামান্য ডঃ আলী কুলী আর্দালান ওয়াশিংটনে ইকবাল দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে বলেন-

পাকিস্তানের আল্লামা ইকবাল সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। মুহম্মদ ইকবাল ছিলেন একাধারে একজন মহানকবি ও দার্শনিক, মননশীল প্রবন্ধকার, উঁচুস্তরের ভাষাবিদ ও স্বয়ং একজন শিক্ষাদাতা, আইনজ্ঞ এবং রাজনীতিক। সর্বক্ষেত্রেই তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসামান্য।

পাকিস্তানী জনসাধারণের কাছে অবশ্য তিনি একজন কবি, দার্শনিক বা রাজনীতিকের চেয়ে অনেক কিছু বেশী ছিলেন। তিনি হলেন তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক। তিনিই সর্বপ্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম জনগণের জন্যে আলাদা একটা সার্বভৌম রাষ্ট্রের, দিয়েছিলেন তাদের মনে আশা ও প্রেরণা এবং অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাদেরকে বিদেশীর দাসত্ব নিগড় ছিন্ন করতে।

এ মহান প্রতিভাধর উর্দু এবং ফারসী দু'ভাষাতেই কবিতা রচনা করে গেছেন। দু'ভাষাতেই তাঁর প্রতিটি কবিতাই হয়েছিল এক একটি সুপরিপক্ক ফল স্বরূপ। তাঁর ফার্সী কবিতা গ্রন্থাবলীর মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি হলো অধিকতর সুপরিচিত ঃ

(১) আসরার ই খুদী (খুদীর রহস্য– এটি তাঁর প্রথম, এবং দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর খুদী তত্ত্ব ব্যাখ্যামূলক শ্রেষ্ঠতম রচনা। এ বই কেমব্রিজের অধ্যাপক আর. এ. নিকলসন ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন।

(২) রমুয ই বেখুদী (আত্মবিলোপন রহস্য)-এ বইয়ে ব্যক্তি সমাজ সম্পর্কের বিষয় ব্যাখ্যাত হয়েছে। লেখক এতে তাঁর আদর্শ ইসলামী সমাজ এবং সে সমাজের ভিত্তিভূমি, আদর্শ ও আদর্শ বাস্তবায়নের পন্থাবলী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। অধ্যাপক এ. জে. আরবারী ভূমিকা ও টিকাসমেত এ বইয়ের অনুবাদ প্রকাশ করেছেন।

(৩) পয়াম ই মশরিক (প্রাচ্যের বাণী)- এ বই লেখা হয়েছিল গ্যেটের ওয়েস্ট ইষ্টলিচের দীভান-এর উত্তরে।

(৪) গুলশান ই রায ই জ্দীদ (রহস্যাবলীর নবগোলাববাগ)-এটি রচিত হয়েছে মাহমুদ শাবিস্তারী লিখিত সুফী সাহিত্যে সুপরিচিত গুলশন-ই-রায-এর আঙ্গিকে। জনৈক সুফীর নয়টি প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন শাবিস্তারী তাঁর গ্রন্থে। ইকবাল বর্তমান যুগের চিন্তাধারার আলোকে সেই নয়টি প্রশ্নের পুনরায় জবাব দিয়েছেন।

(৫) জাবিদ নামাহ (শাশ্বতের বাণী)-এটি রচিত হয়েছে দান্তের ডিভাইনা কমেডিয়ার ধরনে। কবি এতে প্রসিদ্ধ সুফী কবি জালালুদ্দীন রূমীর নেতৃত্বে মহাজগতে ভ্রমণ করেছেন।

ইকবাল মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যে বিশ্বাসী ছিলেন; অতএব তিনি সমাজের এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর ওপর অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর গভীর ধর্মভাব তাঁকে বর্তমান জগতের বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাধারার প্রতি বিরূপ করে তুলেছিলো। তিনি আরবী, ফার্সী

ও ভারতীয় চিন্তাধারার ও দর্শনে ব্যুৎপন্ন ছিলেন; এসব থেকে তিনি প্রাচ্যের পুনরুজ্জীবন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কামনা করতেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে তিনি সেতুবন্ধ স্বরূপ ছিলেন এবং এ দু'য়ের মিলন ঘটানো তাঁর সবিশেষ কামনা ছিল।

প্রাচ্যকে জাগিয়ে তুলতে এবং মানুষের উপকারজনক কর্মে প্রাচ্যবাসীর অন্তরে প্রেরণা যোগাবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। জগত সভ্যতায় প্রাচ্যের অবদান যে অপ্রতুল নয়, তা স্মরণ করিয়ে দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

আমরা প্রেমকে শিক্ষা দিয়েছি কি করে হৃদয় জয় করতে হয়,
এবং শিক্ষা দিয়েছি কি করে মানুষ সৃষ্টি করতে হয়।
শিল্প নৈপুণ্য ও বিশ্বাস দুটিই প্রাচ্যের দান,
প্রাচ্যের পবিত্র ধুলি বেহেশতের ঈর্ষার কারণ,
আমরা তুলে ধরেছি যা পর্দার আড়ালে ছিল,
সূর্য আমাদের অঞ্চলে উদিত হয়, এবং আমরাও এসেছি সূর্য থেকে।
আমাদের ঝরণার বারিবিন্দু শক্তির অন্তরে জন্ম দেয় মুক্তার,
আমাদের ঝঞ্জা থেকেই সব সমুদ্র পেয়েছে তাদের মহিমা,
আমাদের হৃদয়ে সঞ্চিত রয়েছে একটি প্রোজ্বল বিন্দু,
এবং আমরাই এ আলো স্থাপন করেছি পথিপার্শ্বে।

ইকবাল প্রাচ্যবাসীকে উপদেশ দিয়েছেন তাদের রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক সমস্যাবলীর সমাধানের জন্যে নিজেদের একটি সংস্থা গঠন করতে। তিনি বলেন ঃ

প্রাচ্যের একটি সংস্থা গঠন করো
এবং শয়তানের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাও
এসব পুরাতন জাতিকে একত্র কর।
আন্তরিকতা ও সততার পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধর।

এর জন্যে তিনি তেহরানকে কেন্দ্র নির্বাচনের পরামর্শ দিয়েছেন ঃ

তেহরান যদি প্রাচ্যজগতের জেনেভা হয়
তা হলে হয়তো সমগ্র বিশ্বের অদৃষ্ট পরিবর্তিত রূপ নেবে।

ইকবাল তাঁর সমগ্র কবিতা ও গদ্য সাহিত্য কর্মে, অন্য কথায়, গতিশীলতার ওপর সর্বাধিক জোর দিয়েছেন। তাঁর কবিতার কয়েক পাতা ওল্টালেই দেখা যাবে তিনি নিষ্ক্রয়তা এবং পারিপার্শ্বিকতার সাথে আপোষমূলক আমাদের চিরাচরিত মনোবৃত্তির কী কঠোর প্রতিবাদ করেছেন।

মানুষের যদি শুধু পারিপার্শ্বিকতার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়েই চলতে হয়, তবে তার মানসিক এবং দৈহিক ক্ষমতার উন্নয়নের অতি অল্প সম্ভাবনাই থাকে। ঝড়-বৃষ্টি, তাপ-শৈত্য থেকে সর্বক্ষণ নিজেকে রক্ষা করে চললে মানুষের সৃষ্টিধর্মিতার উন্মেষ হতে পারে না। পারিপার্শ্বিকতার প্রয়োজনে নিজেকে খাটো না করে বরঞ্চ মানুষকে করতে হবে নিজের প্রয়োজন ও ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষার প্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিকতাকে গড়ে নেবার

শক্তিমান প্রয়াস। প্রকৃতির দৃশ্যমান ও অদৃশ্য শক্তিসমূহকে নিজের মতো করে গড়া এবং নতুন রূপ দেবার মধ্যেই রয়েছে জীবনের প্রকৃত আনন্দময় উপলব্ধি। প্রকৃতির শক্তির কাছে অবনত হয়ে থাকার অর্থ শুধু বেঁচে থাকা, জীবনধর্ম পালন নয়। ইকবাল বলেন ঃ

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই বলে ঃ পরিবেশের সাথে মিলে-মিশে চলো।
পরিবেশ যদি তোমার নির্দেশে না চলে
তবে তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করো।

প্রাচ্যবাসীদের মনে যে নিরাশা ও ভীতি বাসা বেঁধেছে, তার বিরুদ্ধে নিজের শক্তিমান কণ্ঠস্বর তুলে ইকবাল মানুষের নিয়তির গূঢ়ার্থ তাদেরকে শুনিয়েছেন। তিনি বিশেষ করে তাদেরকে শুনিয়েছেন তাদের অতীত গৌরবের কাহিনী এবং তাদের ভবিষ্যত উন্নতি ও অগ্রগতির আশার বাণী। ইকবাল শুধুমাত্র আদর্শবাদী ছিলেন না, নিজ জন্মকাল থেকে শুরু করে সমসাময়িক কালে তিনি মানুষের যে অবস্থা দেখেছেন, তা নিয়ে তিনি গভীরভাবে পড়াশোনা ও চিন্তা-ভাবনা করেছেন এবং বাস্তবধর্মী প্রস্তাবাবলী উত্থাপন করেছেন। তিনি অকাট্য যুক্তি দিয়ে ইতিহাসের উদাহরণ সম্মুখে ধরে তাঁর পাঠককে নিজ নিয়তি আয়ত্তে আনবার যোগ্য আত্মবিশ্বাস ও সাহস জুগিয়েছেন। মানুষকে তিনি স্বচ্ছ ও অকপট ভাষায় সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

হে সদ্ব্যক্তি! তুমি এ পৃথিবীতে এসেছো একবিধ জন্মগ্রহণের মাধ্যমে,
তুমি আর এক জন্মগ্রহণের মাধ্যমে এ জগত ছেড়ে যেতেও পারো।
যা তোমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।
কিন্তু এ নব জন্ম দৈহিক ব্যাপার নয়-
তা জানেন দিব্যজ্ঞানী জন।
প্রথম জন্মগ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক
কিন্তু দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ -
সে হলো তোমার নিজ প্রচেষ্টা সাপেক্ষ।
সে জন্মগ্রহণ ঘটেছিল অন্তরালে,
এ জন্মগ্রহণ খোলাখুলি ব্যাপার।
এটাতে তুমি দিবারাত্রিরূপ ঘোটকে সওয়ার।

উপসংহারে আমি বলতে চাই যে, আজকে মুহম্মদ ইকবালের বিমুক্ত আত্মা নিশ্চয়ই আমাদের আশে-পাশে পরমানন্দে বিহার করছে তাঁর কল্পিত আদর্শরাষ্ট্র স্বাধীন শান্তিপ্রিয় মহান পাকিস্তানের অভ্যুদয় দেখে। নিজ ঐতিহ্য বজায় রেখে এ নতুন রাষ্ট্র সুযোগ্য নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় সোদ্যমে এগিয়ে চলেছে। স্পষ্টত ইকবাল পাকিস্তানের হাতে একটি প্রাণবন্ত ঐতিহ্যসূত্র দিয়ে গেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস-এর মাননীয় সদস্য মিঃ ওয়াল্টার এইচ. জাড্ এ উপলক্ষে বলেন-

ঈশ্বরের ও মানুষের প্রতি বিশ্বাস পুন-স্থাপনের জন্যে আজকের দিনে আমরা যে-সব ক্ষণজন্মা পুরুষের কাছে প্রেরণা লাভ করতে পারি, মুসলিম কবি মুহম্মদ ইকবাল তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। তিনি দক্ষিণ এশীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্যে যে স্বপ্ন দেখে ছিলেন, তার সাক্ষাৎ ফল হলো আজকের পাকিস্তানী জাতি। মানুষের পরিচিতিকে ধ্বংস করে যারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ধ্বজা এমন কি গগনস্পর্শী উচ্চতায় উত্তোলিত করতে প্রয়াসী, ইকবাল কখনও তাদের পক্ষে যেয়ে দাঁড়াননি। বরঞ্চ তিনি গান গেয়েছেন মানব জীবনের পবিত্রতার, মানব আত্মার সমারোহের এবং মানব ব্যক্তিত্বের অপরাজেয়তার।

ইয়াহূদী খৃষ্টীয় মুসলিম ধর্মে বিশ্বাসী অন্যান্য সকলের ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, মানুষ সৃষ্ট হয়েছে আল্লাহর প্রতিমূর্তিতে। তাঁর দর্শনের অন্তর্নিহিত বাণী ছিল এই যে, আল্লাহর প্রতিবিম্ব স্বরূপ যে মানব ব্যক্তিত্ব, তাকে এমনভাবে বিকশিত করে তুলতে হবে যাতে সে তার আসল-এর প্রতিনিধিত্বের যোগ্য হয়। তাঁর মতে, যা কিছু মানব ব্যক্তিত্বকে শক্তিদান করে তা ভাল, আর যা তাকে দুর্বল করে তা মন্দ।

আমরা আমেরিকান ঐতিহ্যের বাহকেরা আমাদের জাতির স্রষ্টাদের কথা স্মরণ করে থাকি। তাঁরা বলেছেন ঃ "আমরা এ সত্যকে স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করি যে, সব মানুষের সৃষ্টি হয়েছে...... ইত্যাদি। তাঁদের ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি এই মূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, একজন মহান সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন যিনি হলেন সর্ববিধাতা; এবং মানুষ তাঁর সন্তান। অতএব মানুষ তাঁর প্রকৃতি আয়ত্ত করবে। মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা থেকে পেয়েছে নীতিনিষ্ঠ বিচারের ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। ইচ্ছা করলে সে অধিক থেকে অধিকতর করে পরম পিতার সাদৃশ্য অর্জন করতে পারে। এ অর্জনের মধ্যেই রয়েছে গভীর আনন্দ এবং জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিপূর্ণতা। সে যতই তাঁর সাথে অভিন্নতার দিকে এগয়ি যাবে, ততই তার বিশ্বমানবের সাথে একাত্মতা ঘটবে।

মানুষ, ঈশ্বর এবং বিশ্বজগতের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি সম্বন্ধে পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে ইকবালের এবং আমেরিকা মহাদেশে আমাদের যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতাদের বিশ্বাস সমস্তরের ছিল। আজ সর্বত্র এ বিশ্বাসকে নিরেট ও নির্দয় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পৃথিবীকে ছিন্নবিচ্ছিন্নকারী আজকের এ দ্বন্দ্বে নতুনত্ব রয়েছে। ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহাবলীর মতো এটা ভূমি দখলের সংগ্রাম নয়; এ সংগ্রাম হলো মানুষের মন, মানুষের আত্মা তথা সামগ্রিক মানুষকে জয় করবার সংগ্রাম। আজকে আমাদের একান্ত প্রয়োজন হচ্ছে ইকবাল হেন মনীষীদের পদপ্রান্তে বসে নতুন করে দীক্ষা নেওয়া যাতে গোষ্ঠী, জাতি, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি ছোটো ছোটো বিভেদাত্মক ব্যাপারগুলোকে পেছনে ফেলে আমরা ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, মানুষের মৌলিক ঐক্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে একটা সাধারণ মিলনক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারি।

ইকবালের মন ছিল বহুধা প্রসারিত। তাঁর কৃতকার্যতাও ছিল সর্বক্ষেত্রে অসাধারণ। কবি, দার্শনিক, আইনজ্ঞ, রাজনীতিক, চিন্তা-নেতা তিনি যা কিছুই হোন না কেন, মানুষ হিসেবে

তাঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চ; আর মানবসেবার সুযোগকেই তিনি দেখেছেন মানুষের অধিকারের মহত্তম প্রকাশরূপে।

পাঠ্য জীবনের প্রথম দিকে তিনি পন্ডিতপ্রবর মীর হাসান এবং শেষদিকে স্যার টমাস আর্নল্ড-এর ঘনিষ্ঠ প্রভাবে এসেছিলেন। এ দু'জন মহাবিদ্বান ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র। ইকবালের জীবনে যে প্রাচ্যের মূল্যবোধ ও পাশ্চাত্যের শৃঙ্খলা-জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ দেখা দিয়েছিল, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যেকার কাল্পনিক ব্যবধানগুলো তিনি যে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন, বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যে চেয়েছিলেন তাঁর দেশ যেন পূর্ণ কর্তব্য পালন করে চলে–এ সব কিছুর মূলে এই দুই মহান শিক্ষকের প্রভাব অনেকখানি ছিল বলে মনে করা যায়।

এক মানবতা ও এক বিধাতা আদর্শপুষ্ট ইকবালের জীবন দর্শন চেয়েছিল স্বাধীনতা, সাম্য ও প্রেমের ভিত্তিতে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। তিনি যে নতুন পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকল্পে দেশবাসীর অন্তরে অভূতপূর্ব প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, তাঁর ধারণায় তা ছিল এমন একটি দেশ যেখানকার মানুষ হবে মানবসেবায় উৎসর্গিতপ্রাণ, যেখানে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনে সকলে হবে সহায়ক এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যেখানে সকলের লভ্য হবে সমান সুযোগ। তাঁর অন্তরে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না (আপনার আমার মনেও তা না থাকা অসম্ভাব্য কিছু নয়)। একের যথার্থ স্বার্থ সাধনের চেষ্টা তাঁর ছিল অন্যের জন্যেও মঙ্গলপ্রসূ। পাক-ভারত উপমহাদেশে একটি সুগঠিত মুসলিম রাষ্ট্র তিনি চেয়েছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠতম স্বার্থে (in the best interest of India)।

ইকবাল তাঁর কর্মজীবনের বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করেন নিজ দেশবাসী এবং বিশ্ববাসীর কাছে এহেন শান্তি ও প্রেমের মতবাদ প্রচার করে। তাঁর কবিতাবলী সব মহাদেশ ও সব জাতির কাছে আজও এ মতবাদ ধ্বনিত করে চলেছে। মানুষের প্রতি তাঁর আস্থা বিফল হয়নি। আজকে এক দিকে যেমন বিশ্বময় হানাহানি ও দ্বন্দ্বের অন্ত নেই- এবং সেদিকে আমরা অনেকখানি মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়েছি- অন্যদিকে পৃথিবীর স্বাধীন মানবগোষ্ঠীসমূহের মধ্যেও একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে পরস্পরকে চিনবার এবং পরস্পরে বিশ্বাস ও সৌহার্দ্য সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে। এ আন্দোলন শুধুমাত্র পরস্পরে সহনশীলতায় শেষ হয়নি; একের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের প্রতি অন্যে আজ অনেকখানি অনুসন্ধিৎসু ও শ্রদ্ধাশীল হয়ে তাকাচ্ছে। বস্তুতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পূজারীদের আদর্শগত আক্রমণকে প্রতিরোধ করে একটা বিশ্ব সভ্যতার গোড়াপত্তন করা সম্ভব হতে পারে পরস্পরকে বোঝা, পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি আন্তরিকতার সাথে পর্যালোচনা, পরস্পরে আস্থা ও প্রীতি স্থাপনের দ্বারা।

আজকের এ জনসভার বৈশিষ্ট্যও এ উপলক্ষে স্মরণীয়। এখানে বিভিন্ন মনোভাবের, বিভিন্ন বৃত্তির, বিভিন্ন জীবনযাপন প্রণালীর মানুষ একসাথে জমায়েত হয়েছেন। এ করে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পরস্পরে ভাব বিনিময় হয়, পরস্পর পরিচয় নিকটতর হয়। আজকে আমেরিকান, ইউরোপীয়ান, মধ্যপ্রাচ্যবাসী, দক্ষিণ এশীয় খৃষ্টান, ইহুদী, মুসলমান ব্যক্তিবর্গ এখানে একত্রিত হয়েছেন একজন মহান মুসলিমকে একটি মুসলিম উপাসনালয় প্রাঙ্গণে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। আমরা একত্রিত হয়েছি- কেননা, একজন মহামানবকে শ্রদ্ধা জানাবার আমাদের আন্তরিক কামনা সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস ও জাতীয়তার গন্ডি উল্লংঘন করে উন্নততর মার্গে মিলিত হয়েছে।

যে আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতাকে ইকবাল বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবিতে সৃষ্ট হওয়া হেতু যথাযথ মর্যাদা অর্জন' (being worthy of having been created in the image of God) মনুষ্যজাতি সে পথে এগিয়ে যাবার পথে আজ অধিক থেকে অধিকতর পরস্পরের সহযোগিতা লাভ করছে।

অনেকদিন আগে চীন দেশের দুস্থ মানুষের দুঃখ লাঘবের আকাঙ্ক্ষা আমাকে পৃথিবীর সে সুদূরপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে আমি দশ বছরকাল চিকিৎসকরূপে নিয়োজিত ছিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে দশ বছরে আমি যতখানি শিক্ষা দিতে পেরেছিলাম, তার চেয়ে অধিক পেয়েছি। যখন মানুষ মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে পরস্পরে সহযোগিতার হাত বাড়ায়, তখন সাধারণত এ রকমই ঘটে থাকে। সেখানে আমি পরম সৌভাগ্যবশত 'বিশ্ব প্রতিবেশী সংঘ' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাথে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছি, জীবন মান উন্নয়নে সহায়তাদানের জন্যে স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন করেছি এবং সে সূত্রে সন্ধান পেয়েছি একটি নবতর জীবননীতি ও স্পৃহার।

ইকবাল জানেন যে, কোনো কোনো মানুষ অন্যায় ও নিষ্ঠুরতার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু সাধারণ মানুষের বেশীর ভাগই দয়ালু ও সত্যনিষ্ঠ। তিনি তাঁর বিশ্বজনীন আবেদনশীল ও মর্মস্পর্শী কবিতার মাধ্যমে সৎ ব্যক্তিদেরকে মানুষের সেবার ক্ষেত্রে একত্র হতে আহ্বান করেছেন এবং বলেছেন অন্যায়কে প্রতিরোধ করবার প্রয়োজনে সমবেত হতে–যাতে আগামী দিনের মানব সন্তানেরা আদর্শাবলী স্বচ্ছন্দে অনুকরণ করে চলতে পারে।

আজকে আমরা এই মহান মানুষ ও পুণ্যাত্মার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করি। তিনি নিজ জাতিকে যা বলেছেন, তা সমগ্র মানব জাতিকেও বলেছেন। তাঁর প্রার্থনা আজ আমাদেরও প্রার্থনা ঃ

হে আল্লাহ্! আমার জীবন যেন হয়
একটি মোমবাতির মতো–
যা-তে সর্বপ্রচেষ্টায় আমি দূর করতে পারি
অসত্যের অন্ধকার এবং
আমি সমগ্র জগতকে আলোক বিতরণ করতে পারি।

নেদারল্যান্ডস্

নেদারল্যান্ডস্-এর লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ইকবাল দিবস অনুষ্ঠান উপলক্ষে পাকিস্তান প্রেস ডেলিগেশন-এর নেতা, 'ডন' সম্পাদক মিঃ আলতাফ হুসেন বলেন—

পাকিস্তানে এবং অন্যান্য অনেক দেশে আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-দার্শনিক মুহম্মদ ইকবালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদন করা হবে। আমরা আপনাদের দেশের অতিথি হিসেবে এ মহান দিবসে এখানে উপস্থিত থাকতে পেরে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। এই বিদ্যজ্জন সমাজে আমাকে কিছু বলতে বলার জন্যে আমি আন্তরিক শুকরিয়াহ্ জানাই।

একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় কোনো মহান কবি-শিল্পীর কীর্তি ও শিক্ষার বিশদ বর্ণনা দান সম্ভব নয়। বিশেষ করে, ইকবালের ক্ষেত্রে তাঁর একক এবং গতিধর্মী প্রতিভার অনুধাবন করতে হলে, বিশ্বমানবের উন্নয়নের জন্যে তিনি যে বাণী প্রচার করে গেছেন তা জানতে ও বুঝতে হলে পাঠকের পক্ষে দীর্ঘ ও গভীর মনোযোগ দান অত্যাবশ্যক। অতএব উপস্থিত ক্ষেত্রে, আমি বর্তমানের মানুষ যে-সব অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও অপ্রতিরোধ্য সমস্যার সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে সম্বন্ধে ইকবালের বাণীর কথঞ্চিৎ মাত্র আলোচনার চেষ্টা করবো।

প্রথমতঃ এটা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে, যদিও ইকবাল মুসলিম প্রাচ্যে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত হয় প্রতীচ্যের জ্ঞানগর্ভ প্রতিষ্ঠানাবলীতে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য-দু'য়েরই জ্ঞান ও বিদ্যায় তিনি গভীর পারদর্শিতাও লাভ করেছিলেন। তাঁর লেখা থেকে দেখা যায় যে, একেবারে প্রথম ছাত্র জীবন থেকেই মানব কল্যাণের সমস্যাবলী তাঁর মনকে অধিকার করে বসেছিল। প্রতিভার বিকাশের সাথে সাথে তাঁর কবি-কল্পনা যে শক্তি, গভীরতা, রূপ ও মাহাত্ম্যে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে, তাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করেন কবিতা ও গদ্য রচনার মাধ্যমে ঐকান্তিক মানবীয় আর্তির প্রকাশে। অনেক বিজ্ঞ পাঠকের মতে, তাঁর এ অবদানের শ্রেষ্ঠত্ব এখনও আর কেউ অতিক্রম করতে পারেন নি।

ইকবাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখে গেছেন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবার খুব কাছাকাছি সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। সমকালীন বিশ্বের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং সে-সব ঘটনার পশ্চাৎপটের প্রতি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি তাঁকে নিজের বিশ্বাসের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাবান করে তুলেছিল। এতে তাঁর বিশ্বাসের রূপায়ণ আরও পেয়েছিল অগ্নিস্পর্শ, আরও হয়ে

উঠেছিল উজ্জ্বল ও শক্তিমান। নিজের চারিদিকে তিনি মানুষের যে দুঃখ-বেদনা অবলোকন করলেন, তার প্রতিকার চেয়েছিলেন তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারা ও জীবনযাপন প্রণালীর একটি সুষম সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, কেবলমাত্র প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা এবং প্রতীচ্যের বিশ্বপ্রকৃতির সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক আচরণের একটি স্থায়ী সামঞ্জস্য বিধান করতে পারলেই আজকের মানুষের আধ্যাত্মিক এবং বস্তুবাদমূলক উভয় সঙ্কটের অপনোদন হতে পারে।

ইকবাল উনবিংশ শতকের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের শেষ দৌড় পর্যন্ত দেখেছেন; তার পতনও তিনি দেখে গেছেন। রাশিয়ার নাস্তিক সাম্যবাদী বিপ্লব এবং তার ঠিক উল্‌টো-জার্মানী ও ইতালীর ফ্যাসিবাদী মতবাদের উদ্ভবও তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ইউরোপীয় চিন্তা-নেতাদের চেয়ে অধিক করে বুঝতে পেরেছিলেন, প্রাচ্যের জনগণের মধ্যে তখন রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে কি গভীর প্রেরণার উদ্ভব হয়েছিল এবং জীবনের সমস্যাবলীর ক্রমবর্ধমান জটিলতার সমাধানে তারা কতবেশী উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

এ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে মানুষের সামনে যে-সব ভয়াবহ সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার বিশ্লেষণ ও সমাধানকল্পে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি আত্মনিয়োগ করেছেন। স্পেঙ্গলারের অনপনেয় নৈরাশ্যবাদী প্রচারণা সত্ত্বেও অনেক চিন্তা-নেতাকে আমরা দেখতে পাই একটা সমাধান দেবার প্রচেষ্টায় ঃ বের্গসঁ-র উদ্‌বর্তনবাদ, টমাস ম্যান-এর বুদ্ধিবৃত্তিক মানবতাবাদ, টয়েনবীর খৃষ্টধর্মসম্মত আপোষবাদ, ওয়েল্‌স্‌-এর যান্ত্রিক স্বাপ্নিকতাবাদ এবং আরও কত কি! আজকের সঙ্কট শুধু যে– প্রাচ্য মহাদেশের প্রতি প্রযোজ্য তা নয়; পাশ্চাত্যের দিকেও তা সমভাবে এগিয়ে চলেছে। এমন কি, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি এর হামলা এখন প্রায় বিশ্বজনীনরূপে দেখা দিয়েছে।

আমি যতটা জানি, প্রাচ্যের দার্শনিকদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তিই এই বিরাট মানবীয় সমস্যার মুকাবিলায় দাঁড়িয়েছেন; তিনি হলেন মুহম্মদ ইকবাল। এ প্রসঙ্গে তাঁর সমাধান কি? তাঁর সমাধান হচ্ছে ঃ 'এক বিশ্ব'-যা ইদানিং পাশ্চাত্য জগতে অনেকখানি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এ সমাধানের কথা শক্তিশালী কাব্য ও গদ্য রচনার মারফত ইকবাল প্রচার করে গেছেন অন্তত পঁচিশ বছর পূর্বে– এমন কি, তারও আগে। ইকবালই সর্বপ্রথম বলেছিলেন যে, মানুষকে একটি সার্বজনীন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যমানের সহায়তা নিয়ে একটি মাত্র বিশ্ব-সম্প্রদায় গড়ে তুলতে হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, মানবসভ্যতা রক্ষার জন্যে এ ছাড়া কোনো গত্যন্তর নেই। এই 'নৈতিক' বা 'আধ্যাত্মিক' মূল্যমান বলতে কি বোঝায়, তা অনেক সময় স্পষ্ট বোঝা যায় না; কিন্তু এ সম্পর্কে ইকবালের উক্তি স্পষ্ট। তিনি যেভাবে এসব ধারণার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে ঘোলাটে কিছুর মিশ্রণ নেই। তাঁর মতে, এসব মূল্যমান আসে এক আল্লাহর বিশ্বাস থেকে। অতএব তিনি জানতেন যে, একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী সকলেরই পূর্ব থেকেই একটি সাধারণ মিলন ক্ষেত্র রয়েছে। অতএব, তাঁর এক বিশ্ব এবং এক মানব সম্প্রদায়ের মূলভিত্তি হলো একেশ্বরবাদ বা তৌহীদ।

ইকবালের মতবাদ ব্যাখ্যায় আর অধিক দূর এগুবার আগে আমি তাঁর প্রাথমিক জীবনের একটি কাব্যিক ঘটনার উল্লেখ করতে চাই। কেমব্রিজ ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি আক্রমণাত্মক জাতীয় রাষ্ট্র ধারণার ট্র্যাজেডি অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো শুধু নিজেদেরকে নয়, বরঞ্চ বিশ্বমানবের এক বৃহৎ অংশ এবং সাথে সাথে মানব সভ্যতার মূল্যবোধকে পর্যন্ত বিপন্ন করে তুলবে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে রচিত এক কবিতায় তিনি 'পাশ্চাত্যের নগরবাসীদেরকে' এই সতর্কবাণী শুনিয়েছিলেন যে, 'ভঙ্গুর শাখায় বাঁধা নীড়' কখনও স্থায়ী হতে পারে না। এ কথা বলে তিনি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন যে, পাশ্চাত্য দেশগুলো বৈষয়িক উন্নতির ভিত্তিতে যে গগনচুম্বী প্রাসাদ গড়ে তুলতে লেগে গেছে, তার নৈতিক সামর্থ্য অতি অল্প, অতএব যে কোনো মুহূর্তে তা ভেঙ্গে পড়া বিচিত্র নয়।

এই সাবধান বাণী থেকেই কবির দার্শনিক মতবাদের আরম্ভ। এটি ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায় এবং অবশেষে একটি সুস্পষ্ট নৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু তখন পর্যন্ত বিশ্বজনীন স্বীকৃতি তাঁর ভাগ্যে জোটেনি; যারা তাঁর কথা শুনলো, তারা হয়তো কানেই তুললো না, কিম্বা মনে করলো যে, এ আর একটি পূর্ব দেশীয় প্রহেলিকাবাদই হবে। কিন্তু কার্যত পাশ্চাত্যের প্রাসাদ একদিন সত্যিই ধসে পড়লো; দু'টি বিশ্বযুদ্ধ মেদিনীকে কাঁপিয়ে তুললো এবং মানুষের শত-সহস্র বছরে গড়ে তোলা সভ্যতা ও ঐতিহ্যকে ধ্বংসের মুখে টেনে নিয়ে গেলো। এ সব ঘটনার প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় চিন্তা-নেতাদের কণ্ঠে ইকবালের সমর্থন উচ্চারিত হলো–অবশ্য অনেকখানি বাধ্যতামূলকভাবে।

ইকবালের মতে, মানব সমাজের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে আজ যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা হলো মূলত নীতিভিত্তিক। যে-সব মৌলিক নৈতিক মূল্যমান যুগ যুগ ধরে মানব জাতির সৃষ্টিধর্মী উদ্‌বর্তন সম্ভব করে তুলেছে, সেগুলোর উপর আস্থা স্থাপন না করে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারব না। এ সব নৈতিক মূল্যমানের আলোকে আমাদের মানব সমাজকে দেখতে হবে একটি জীবন্ত দেহরূপে, প্রায় একজন ব্যক্তি মানুষকে আমরা যেমন দেখি। মানব সমাজ এবং ব্যক্তি মানুষের বিকাশ ও জীবন-যাত্রা পদ্ধতি এ ক্ষেত্রে এমন কিছু বৈষম্যপূর্ণ নয়। অন্য কথায়, মানুষ সমষ্টিগতভাবে একজন মানুষের মতোই আচরণ করে; এবং এ থেকে অনুভূত হবে যে, মানুষের সামাজিক ব্যক্তিত্বে সংস্কার আনতে হলে আমাদের আরম্ভ করতে হবে ব্যক্তি-মানুষকে নিয়ে।

এভাবে মানুষের সার্বজনীন উন্নয়ন এবং সাধারণ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষকে একটি মাত্র সম্প্রদায়ে একত্রিত করার চিন্তা থেকে ইকবাল তাঁর প্রষিদ্ধ খুদীতত্ত্বে উপনীত হন। তিনি শিক্ষা দিলেন যে, মানব জাতির সমষ্টিগত ব্যক্তিত্ব গঠনের উপাদান স্বরূপ প্রতিটি আলাদা ব্যক্তিত্বকে সর্ব প্রথমে এই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ স্বীকার করে নিতে হবে। তিনি ঘোষণা করলেন যে, ব্যক্তিসত্ত্বা বা একক খুদী মাত্র নিম্নোক্ত উপায়ে বিকাশ লাভ করতে পারে। প্রথমতঃ এ জন্যে চাই স্বাধীন পরিবেশ; যেখানে খুদী প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হয়, সেখানে সে পরিবেশের সাথে যুদ্ধ করে এবং তাকে পরাস্থ করে খুদীর আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। এভাবে বিজয় অর্জন করেই খুদী, ইকবালের কথায়, পরিপূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তিত্ব স্বরূপ আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। ইকবালের এই

অতি চিত্তাকর্ষক দার্শনিক মতবাদই অমরত্ব লাভ করেছে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ আস্‌রার ই খুদী (খুদীর রহস্য)-তে।

দ্বিতীয়তঃ খুদীর বিকাশও মালিন্য প্রক্ষালনের জন্যে তার নিজস্ব আহার্য। এ আহার্য আহরিত হবে নির্মলতম নৈতিক উপাদান থেকে, যা সাথে সাথে হবে অতিশয় দৃঢ়ভিত্তিক। ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে, এ জন্যে শ্রেষ্ঠতম উপাদানের উৎস হলো পবিত্র কুরআন। এখানে আমি আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, প্রতীচ্যের মহান চিন্তানেতা গ্যেটে কুরআন সম্বন্ধে কি বলেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

'এর শিক্ষা কখনও আপনাকে বিমুখ করবে না। আমাদের সব রকম বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে আমরা (এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে কোনো মানুষই) এর বেশী এগুতে পারি না।'

ইকবালের কাব্যিক দৃষ্টি এ সত্য স্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছিল; তাঁর সুপরিণত লেখনী নিজ শক্তি ও মাহাত্ম্য নিয়োজিত করেছিল একে বিকাশ করতে। তিনি বলেন, পৃথিবীকে পূর্ব ও পশ্চিম বলে দুটো ভাগে এবং প্রত্যেকটি ভাগকে আবার জাতীয়, উপজাতীয়, গোষ্ঠিগত, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি শত শত টুকরোতে বিভক্ত করার অর্থ হলো সামগ্রিক মানব ব্যক্তিত্বের জীবন্ত দেহচ্ছেদ করা। এই জীবচ্ছেদন কর্মই মানুষের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ এবং এতে সৃষ্টির গূঢ় উদ্দেশ্য তথা ক্রমবর্ধমান হারে পূর্ণতা অর্জন করে মানুষ যে তার সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী হবার যোগ্যতা ও স্বাধীনতা লাভ করবে, তা ব্যাহত হয়।

এভাবে যে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সব মানুষের ব্যাপারে সমভাবে প্রযোজ্য, তা আয়ত্ত্ব না করতে পেরে মানব ব্যক্তিত্ব শত-সহস্র খন্ডে খন্ডিত হয়ে পড়েছে। এসব মূল্যবোধকে অবশ্যই পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। তার জন্যে একটি অপরিহার্য শর্ত হলো এই যে, প্রত্যেকটি নর ও নারীর তার খুদীকে বিকশিত করে তুলতে হবে।

এই সিদ্ধান্তে আসবার পর এবং এই সাধারণ সত্যের অনুভূতি সূত্রে ইকবাল তাঁর নিজ পরিবেশের দিকে ঘুরে তাকিয়েছেন। এ পরিবেশ হলো ইসলাম ও মুসলিম সমাজ। তাঁর কবিতার বজ্রনির্ঘোষে তিনি স্বধর্মাবলম্বীদের ডাক দিলেন কুরআনের প্রতি সত্যিকার আন্তরিকতা নিয়ে ফিরে আসতে যে, কুরআন হলো, অন্ততপক্ষে তাদের জন্যে, শ্রেষ্ঠতম পথপ্রদর্শক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণের আকর। নিম্নে এ কথাটি আমি আর একটু ব্যাখ্যা সহকারে বলবার চেষ্টা করবো ঃ

প্রথমে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে ঃ কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থা খুদীর বিকাশের জন্যে সর্বাধিক উপযোগী হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আদর্শ সমাজের প্রকৃতি নির্ধারণের পূর্বে আবার আমাদের বিবেচনা করতে হবে, সমাজ ও ব্যক্তির সম্পর্ক কতখানি ব্যাপক হতে পারে। এক দিকে এমন ব্যক্তিরা আছেন যাঁরা মনে করেন যে, ব্যক্তির বিকাশই জীবন ধারণের প্রকৃষ্টতম উদ্দেশ্য এবং রাষ্ট্রের একমাত্র কাজ হলো এতে সহায়তা দান। অন্যদিকে এমন লোকেরাও আছেন যাঁরা মনে করেন যে, রাষ্ট্রই হলো আসল গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার পথে ব্যক্তির দাবী-দাওয়ার কোনো মূল্যই নেই। এই দুই গোঁড়া মতবাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইকবাল মনে করেন যে, কোনো মানুষ বা মানবগোষ্ঠী তার নিজ দলের ঐতিহ্য থেকে আধ্যাত্মিক জীবনরস আহরণ না করে কিছুতেই পরিপূর্ণ ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে

পারে না। অপর পক্ষে, সে দলেরও ব্যক্তির বিকাশমানতার পক্ষে একটি দায়িত্ব রয়েছে, যে জন্যে সে (সমাজ) তার (ব্যক্তির) ওপর ন্যূনতম সম্ভব কর্তৃত্ব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে এবং কর্তৃত্বের হাত তখনই মাত্র বাড়াবে যখন ব্যক্তির কার্য সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের বিরোধী হবে। এ রকম আদর্শ সমাজের জন্যে ইকবাল সাতটি অপরিহার্য শর্তের উল্লেখ করেছেনঃ

(১) এ সমাজ হবে একেশ্বরবাদ (তৌহীদ)-রূপ আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

(২) এর জীবনায়োজন হবে নবুয়ত-রূপ ঐশী প্রেরণালব্ধ নেতৃত্বের অধীনে।

(৩) এর দৈনন্দিন প্রগতির জন্যে একটি সর্বস্বীকৃত নীতিমালা থাকবে।

(৪) এর একটি সার্বজনীন কেন্দ্র থাকবে।

(৫) এর এমন একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে যার প্রতি সমগ্র সম্প্রদায় সর্বদা এগিয়ে যেতে চেষ্টিত থাকবে।

(৬) একে এমন শক্তিমান হতে হবে যাতে প্রাকৃতিক শক্তিগুলো হবে এর আজ্ঞাধীন।

(৭) এ সম্প্রদায়ের কার্যক্রম এমন হবে যাতে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বা খুদী যেভাবে বিকাশ লাভ করে, তেমনি ভাবে এর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে থাকে।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সমাজ সম্বন্ধে ইকবালের ধারণা একটি অবিচল আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত আর তা হলো তৌহীদ বা একেশ্বরবাদ। এখানে একথাও বিশেষভাবে স্মরণীয় যে, এক ঈশ্বর ধারণার অপ্রতিরোধ্য পরিণতি হলো এই একক বিশ্ববিধাতার অধীনে বিশ্বমানবের একত্ব। অতএব, মানব সমাজ হলো অবিভাজ্য একক এবং মানুষ মানুষের সাথে ধর্ম, বর্ণ, জাতি বা ভৌগোলিক প্রশ্ন –নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ।

তৌহীদ মানুষের হাতে এমন একটি উত্তম মনস্তাত্ত্বিক হাতিয়ার যা অন্য মানুষকে শোষণ, অন্য দলকে ঘৃণা বা অন্য জাতির প্রতি বৈরিভাব থেকে তাকে রক্ষা করে। ইকবাল নিজেই তৌহীদের এই একত্ববিধায়ী শক্তি সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

সহস্র কণ্ঠ যার প্রভাবে এক সুর তোলে
তা হলো তৌহীদ রহস্যের এক দিক।
ধর্ম জ্ঞান কানুন হলো এরই ফল,
ক্ষমতা শক্তি উন্নতি এ থেকেই উদ্ভূত।
এর প্রভাব দাসকে উন্নীত করে মানবত্বে-
যারা জন্ম দেয় একটি নতুন জাতির।
এ হলো শঙ্কা ও দ্বিধার মৃত্যুবান,
কর্মস্পৃহা হলো এর নির্যাস,
এর দিব্যদৃষ্টি সোজাসুজি অবলোকন করে বিশ্বরহস্য।

এই বিশ্বজনীন মানবত্ব বোধই ইকবালের সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারার চরম উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁর ব্যক্তি-মানসের আর একটি দিক রয়েছে। তিনি শুধু একজন তত্ত্ববিদই ছিলেন না। তাঁর দেশ ও জাতির সম্মুখে যে সমস্যা তাঁর সময়কালে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল, সে সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল তাঁর বিশ্বজনীন মানবতাবাদের গন্ডির মধ্যেই বাস্তব কান্ডজ্ঞানের একটি সুষ্ঠু নিদর্শন।

ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব এবং মুসলিম জনগণ যাদের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর চিন্তাধারায় তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার ছিল অগ্রধিকার এবং বিশিষ্ট স্থান। ১৯৩০ সালে বিশ্বসমক্ষে তিনিই সর্বপ্রথম দাবী তুলেছিলেন যে, পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপিত হতে হবে এবং এই নির্দেশিত পথে এগিয়েই এখানকার মুসলমান সম্প্রদায় ক্বায়েদ-ই-আযম জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান রাষ্ট্র অর্জন করে। এ কথা আমাদের স্পষ্টভাবে মনে রাখা উচিৎ যে, পাকিস্তান ধারণা একটা অনুদার বা সংকীর্ণ জাতীয়তা বা ধর্মান্ধতা থেকে উদ্ভূত হয়নি। ইকবাল এ ধারণার উদ্বোধন করেছিলেন তাঁর চিন্তাধারার মৌলিক-মানবীয় প্রেরণা থেকে। পাকিস্তান ধারণা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদের সর্বপ্রকার বহিঃপ্রকাশের বিরুদ্ধে একটি মানবীয় চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এ কারণে এ নিয়ে বহুতর তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। কিন্তু নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ১৯৩০ সনের বার্ষিক অধিবেশনে ইকবাল তাঁর ধারণার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যা বলেছেন, তাতে এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর রয়েছে। তিনি বলেন ঃ

স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অর্থ এ নয় যে, এসব রাষ্ট্রে কোনো প্রকারের ধর্মীয় শাসন প্রবর্তিত হবে। সত্য কথা হলো ঃ ইসলাম যাজকতন্ত্র নয়। রুশোর অনেক পূর্বেই ইসলামে রাষ্ট্রকে একটি চুক্তিমূলক অখন্ড সংস্থারূপে ধারণা করা হয়েছে। এই নৈতিক আদর্শ এমন যে, এর দৃষ্টিতে মানুষ পৃথিবীর এই না, সেই অংশের সাথে সম্পর্কিত একটি মৃত্তিকা-নিবদ্ধ প্রাণীমাত্র নয়, বরঞ্চ সে হলো সমাজের কর্মপদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট অথচ নিজের অধিকার ও কর্তব্যের প্রেক্ষিতে সমাজদেহের জীবন্ত অঙ্গরূপে বিরাজিত একটি আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব।

দু'বছর পরে, ১৯৩২ সালে মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতির আসন থেকে, ইকবাল পুনর্বার তাঁর ধারণার ব্যাখ্যা দেন। তিনি বলেন যে,

> এ রাষ্ট্র শুধু এক দল মানুষের রাজনৈতিক স্বশাসন ব্যবস্থা নয়, বরং একটা উপকারমূলক নীতির বাস্তবায়ন।

তাঁর দূরদৃষ্টিতে স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছিল যে, ভারতীয় রাজনৈতিক মঞ্চে এমন কতকগুলো শক্তির অভ্যুদয় হতে যাচ্ছে যাকে যথাযথরূপে প্রতিরোধ করতে না পারলে মানব ব্যক্তিত্বের ধ্বংসের আশঙ্কা দেখা দেবে (যে ব্যক্তিত্বের গৌরবময় রহস্যের ব্যাখ্যা তিনি নিজের সুপ্রসিদ্ধ কবিতায় দিয়েছেন), এবং যার ফলে কোনো কোনো সমাজ এবং পরিণামে মানবগোষ্ঠি, দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হবে। এ অশুভ শক্তিরূপে তিনি বাস্তববাদী নিরীশ্বরবাদ এবং বাস্তববাদী ধনতন্ত্রবাদ দুটোকেই দেখেছেন। তাঁর কথায় ঃ

> এ সবের অভ্যুদয় একটি বিরাটাকার ঝড়ের পূর্বাভাস মাত্র। এ ঝড় আসলে তা সমগ্র ভারতবর্ষ এবং সমগ্র এশিয়াকে প্রকম্পিত করবে, ভাসিয়ে দেবে। সামগ্রিক

রাজনৈতিক সভ্যতার এ হলো অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। এ সভ্যতা মানুষকে মনে করে একটি শোষণের বস্তু রূপে, একটি উন্নতমানের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সহায়তায় বিকাশমান ব্যক্তিত্বের রূপে নয়। পাশ্চাত্যবাসীরা যে একটি স্বার্থান্ধ অর্থনীতির বিকাশ সাধন করে তা প্রাচ্য জগতের ওপর আরোপ করেছে, এশিয়াবাসীরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেই। একালের পাশ্চাত্যের নিয়ন্ত্রণহীন ব্যক্তি স্বাধীনতামুখীন ধনতন্ত্রবাদকে এশিয়াবাসীরা বুঝতে বা গ্রহণ করতে পারে না। তারা যে বিশ্বাসের অনুসারী, তা ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকার করে এবং আল্লাহর জন্যে ও মানুষের হিতার্থে তাদের সব কিছু উৎসর্গ করতে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। এ জীবনধারার সম্ভাবনাবলী এখনও নিঃশেষিত হয়নি। এখনও তা এমন একটি নতুন জগত সৃষ্টি করতে পারে যেখানে মানুষের সামাজিক মর্যাদা তার জাতি-প্রজাতি বা বর্ণ বা উপার্জনক্ষমতা দ্বারা নয়, বরং তার নৈতিক চরিত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে; যেখানে একজন অস্পৃশ্যের রাজকন্যার সাথে বিবাহে কোনো বাধা থাকবে না; যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা হবে একটা ন্যাস স্বরূপ; যেখানে মূলধনকে কখনও এমন অবারিত স্বাধীনতা দেওয়া হবে না যা তার স্রষ্টাদেরকে শৃঙ্খলিত করতে পারে। অবশ্য আমাদের এই উত্তঙ্গ আদর্শবাদকে তথাকথিত ধর্মতন্ত্রী ও ন্যায়বাগিশদের মধ্যযুগীয় কল্পনাজাল থেকে মুক্ত করে আনতে হবে।

যে-সব দানবীয় শক্তির অভ্যুদয় সম্বন্ধে ইকবাল আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলো ভয়ঙ্কররূপেই দেখা দিয়েছে। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের পরে একদিকে নাস্তিক্যপন্থী বস্তুতন্ত্রবাদ পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তে অভিযান চালিয়ে মানুষের অন্তর ও আত্মাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে চলেছে; অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক বাস্তববাদও, সম্পূর্ণ ধর্মবর্জিত না হয়ে থাকলেও, নিজের আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হারিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থায় ইকবালের বাণী অনুধাবন করা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দু'য়ের জন্যেই মঙ্গলজনক হবে বলে আমার দৃঢ় ধারণা। এতে জ্ঞানচর্চার উৎকর্ষের সাথে সাথে একটি বড় লাভ হবে এই যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শ্রেষ্ঠতম ভাবধারাবলীর একটি সুষম মিলনের পথ এর কল্যাণে প্রশস্ততর হবে। বলতে দ্বিধা নেই যে, মানুষের সার্বজনীন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার এবং তার গৌরবময় ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক সভ্যতা-সংস্কৃতি রক্ষার এ-ই একমাত্র উপায়।

ইতালী

রোম-এ ইতালিয়ান ইন্‌স্টিটিউট ফর দ্য মিডল অ্যান্ড ফার ঈস্ট-কর্তৃক বাৎসরিক ইকবাল দিবস পালন উপলক্ষে অধ্যাপক জিতুসী বলেন -

এ বছরও পাকিস্তানীদের সাথে সাথে আমরাও এখানে কবি ইকবালের স্মরণে সমবেত হয়েছি। পাকিস্তানের এ প্রথা আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে অনুকরণ করে থাকি। কেননা, আমাদের কর্তব্য হলো প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বিশ্বজনীন মূল্যবোধের সাথে আমাদের দেশের সংস্কৃতিবান ব্যক্তিদের পরিচিত করে তোলা।

আজকের এ প্রীতিপ্রদ উপলক্ষ কবি ইকবালকে স্মরণ করবার সুযোগ এনে দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে আনন্দদান করেছে । এর কারণ, ব্যক্তিগত জীবনে কবির বন্ধুত্ব লাভ করে আমি গৌরবান্বিত হয়েছিলাম। তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনায় আমি অনেক কিছু শিখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাদের এ সংস্থাও আজকের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পেরে আনন্দিত। তাঁর কবিতা যে সর্বপ্রথম ইতালীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছে, তা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। আমাদের অন্যতম বন্ধুদেশের এই যুগ প্রবর্তক কবি তাঁর সৃষ্টির বিশ্বজনীন আবেদনে আমাদেরকেও সমভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন। তিনি যে অধ্যাত্ম জগতের গীতিকার ও ব্যাখ্যাদাতা, তার সাথে আমাদের সম্পর্কও অতি নিবিড় এবং অবিচ্ছেদ্য। এই ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী ইতিহাস ও চিন্তাধারা আমাদের জাতীয় জীবনের ওপর গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আরস্তুর মুসলিম ব্যাখ্যাদাতারাই আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় চিন্তায় তাঁর দর্শনের বীজ বপন করেছিলেন, আর ইসলামী স্থাপত্য আমাদের অনেকগুলো সুপ্রসিদ্ধ সৌধের গায়ে স্পষ্ট ও দৃপ্তরূপে বিরাজমান। এই ইতালীতেই সুদূর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহান দ্বিতীয় ফ্রেডারিক ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের মধ্যে সহযোগিতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। এ ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতনতার ফলেই ইতালীর সুধী সমাজে সর্বকালেই বিশিষ্ট ইসলাম তত্ত্ববিদদের আবির্ভাব ঘটেছে। একালেও তাঁদের সংখ্যা একেবারে কম নয়।

কবি ইকবালকে আমরা অন্যান্য জাতির তুলনায় সম্ভবত অধিকতর নিকটে দেখতে পাই এবং হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। তাঁর নিজস্ব যে বাণী, তা আপন শক্তিতেই স্বতঃস্ফূর্ত আর তা শুধু সংস্কৃতিবান মানুষের জন্যেই নয়, বরঞ্চ মানুষের নিয়তির প্রতি যারা বিশ্বাস হারায়নি তাদের সকলের জন্যে। অতএব তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের ব্যাপারে আমাদের আন্তরিকতা ও সহযোগিতা অবধারিত।

আজকের পৃথিবীতে আমরা যে নিদারুণ অস্থিরতার মধ্যে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছি, যেভাবে আমরা অতি দ্রুত নতুনভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছি ও গড়ে উঠছি, যেভাবে আমরা চিরাচরিত জীবন যাপন পন্থাকে পেছনে ফেলে চলেছি, তাতে ইকবালের বাণী শুধু সান্ত্বনা জানিয়েই ক্ষান্ত নেই, অনেকখানি উদ্দীপনাও জোগায়। সর্বকালেই কালজয়ী কবিরা এহেন আশ্বাসবাক্য জগতবাসীর কাছে উচ্চারণ করে থাকেন। তাঁরা কখনও ব্যক্তিগত কল্পনাজাল বুনে তাতে জড়িয়ে পড়ে থাকেন না। জাতির বা যুগের বেদনাপ্লুত সঙ্কট ও সংগ্রাম স্পৃহাকে তাঁরা অন্তরের একান্ত নিভৃতে লালন করেন এবং বিশ্ব সমক্ষে তুলে ধরেন। ইকবালকে আমি এভাবেই দেখতে পাই। একদিকে তিনি নিজ ধর্মবিশ্বাস, নিজ জাতির ঐতিহ্যের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ, আবার অন্যদিকে পৃথিবীর ইতিহাস ও চিন্তাধারার সামান্য হেরফেরও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না।

ইকবালের বাণী সত্যি সত্যিই মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব ও প্রেম এবং একতার বাণী; তাঁর দৃষ্টিতে মানব ঐক্য দৈহিক নয়, আত্মিক। তিনি বলেছেন-

ভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের আসন হলো হৃদয়,
এর শিকড় হৃদয় জুড়ে-কাদা বা পানিতে নয়।

এ হলো পরস্পর বোঝা-পড়া ও শান্তির বাণী; তা ছাড়া, এ কোনো রহস্যাশ্রয়ী বা আত্মবিলোপনবাদী চিন্তা নয়; বরঞ্চ এ চিন্তা সাধনার মাধ্যমে উন্নত ও মহৎ হবার প্রেরণা যোগাচ্ছে।

জীবনে পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্যে ইকবাল নিজের সাথে যুদ্ধ ঘোষণার পরামর্শ দিয়েছেন; কেননা, বিশ্বাসী (মু'মিন) মানুষ হলেন জীবন্ত এবং এগিয়ে তাঁকে যেতেই হবে নিজের সাথে যুদ্ধ করে। তিনি এমনভাবে নিজেকে আক্রমণ করবেন যেন ব্যাঘ্র হরিণীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর মতে, এই জাগ্রত ও গতিধর্মী মানবাত্মার পরিপূর্ণতার পথে তিনটি আলোক বর্তিকা রয়েছে ঃ

প্রথমতঃ নিজের আলোকে নিজেকে দেখা,
দ্বিতীয়ত ঃ অন্যদের আলোকে নিজেকে দেখা,
এবং
তৃতীয়ত ঃ ঐশী আলোকে নিজেকে দেখা।

এর তাৎপর্য হলো মানবীয় প্রেরণা ও সত্যদৃষ্টির সংযোগে একত্ব অর্জন- যে স্বপ্ন আজকের পৃথিবীতে বিচূর্ণিত হয়ে গেছে বলে মনে হয়। নিজ দুষ্কর্মহেতু দুর্দশায় আপতিত আজকের মানুষের দুঃখ মোচন এবং উন্নয়নের জন্যে ইকবাল চেয়ে গেছেন তাঁর এ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র

কায়রোর আল জমহূরিয়াহ পত্রিকায় (৩-৩-৬৬) জনাব মুহম্মদ আলী আল হাব্‌রূক লিখেছেন-

মুহম্মদ ইকবাল একালের একজন সুপ্রসিদ্ধ মুসলিম ব্যক্তিত্ব। জামালুদ্দীন আল আফগানী, মিসরের মুহম্মদ আবদুহু এবং সিরিয়ার আবদুর রহমান আল কওয়াকবীর সাথে তিনি আধুনিক প্রাচ্যের ইতিহাসে একটি পরম গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ইকবাল প্রাচ্যভূমির একজন তেজস্বী চিন্তা-নেতা, দর্শন ও ধর্মীয় জগতের দিশারী এবং কবি। তিনি নিজের হৃদয় ও মন উৎসর্গ করেছিলেন মুসলিম জাতিসমূহের এবং বিশ্বমানবের কল্যাণ কামনায়।

তিনি ছিলেন একজন আকর্ষণীয় ব্যক্তিসত্ত্বার অধিকারী। তাঁর রচনার ঐন্দ্রজালিক আকর্ষণ কালজয়ী হয়ে থাকবে এবং সর্বদেশের মানুষের অন্তরে উদ্দীপনা যোগাবে। এর কারণ এই যে, তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত স্পর্শ-সজাগ কবি; তাঁর নিজস্ব গভীর দার্শনিক তত্ত্বাবলীও তিনি প্রকাশ করেছেন আকর্ষণীয় ও স্বচ্ছ ভাষায়- একটি সুদৃশ্য কাননে প্রস্ফুটিত পুষ্পসম্ভারের মতো করে।

পাঞ্জাবের সিয়ালকোট নগরীর একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৯ নভেম্বর তারিখে মুহম্মদ ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ব্রাক্ষণ পূর্ব পুরুষেরা তিনশত বছর পূর্বে ভারতীয় উচ্চ বর্ণের সমাজের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ত্যাগ করে জনৈক কাশ্মিরী সুফীর হস্তে পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নূর মুহম্মদ একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন; তাঁর কাছে ইকবাল শৈশবে পড়া ও লেখা শেখেন; কিন্তু তদধিক মূল্যবান যা তিনি পিতার কাছে শিক্ষালাভ করেন তা হলো পারিবারিক ও সামাজি আদব-কায়দাহ।

সিয়ালকোটে তাঁর প্রাথমিক ধর্মীয় শিক্ষাব্যপদেশে পিতা তাঁকে একদিন উপদেশ দিয়েছিলেন যে, পবিত্র কুরআন তিনি যেন এমনভাবে পাঠ করেন, যাতে তাঁর অনুভূতি জন্মায়। যেন সে বাক্যগুলো তাঁর নিজের কাছেই অবতীর্ণ হয়েছে। ইকবাল বলেছেন যে, এ উপদেশ পালনের ফলে পবিত্র গ্রন্থের অর্থ ও তাৎপর্য তিনি অনেক গভীর ও ব্যাপকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন। শামসুল উলামা মীর হাসানের নিকট থেকে তিনি ফার্সী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর লাহোর কলেজে ভর্তি হয়ে তিনি অধ্যাপক ডঃ টমাস আর্নল্ড-এর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। খুব সম্ভব আর্নল্ড-এর উৎসাহক্রমেই ইকবাল ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উচ্চ শিক্ষার জন্যে ইউরোপ রওয়ানা হন। এখানে তিনি

কয়েকজন প্রখ্যাত পন্ডিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন। তিনি কিছুকাল কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করেন এবং তৎপর হাইডেলবার্গ ও মিউনিখ-এ যান। শেষোক্ত স্থান থেকে তিনি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। তাঁর থিসিস ছিল ইরানে প্রজ্ঞান শাস্ত্রের বিকাশ। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টারী পাস করেন।

দেশে ফিরে এসে তিনি বিশেষ করে দর্শন, কবিতা ও রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি পাঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ লাভ করেন, ১৯৩১ ও ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন (এ বৈঠক লন্ডনে বসেছিল ভারতীয় শাসন সংস্কার উদ্দেশ্য), ভারতীয় মুসলিম লীগ-এর সভাপতিত্বে বৃত হন এবং প্রসিদ্ধ সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমানে হিমায়েত উল ইসলামকে নেতৃত্ব দান করেন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ইন্তেকাল হয় এবং লাহোরের শাহী মসজিদের সন্নিকটে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর মাযারে খোদিত রয়েছে যে,

> আফ্গান বাদশাহ্ মুহম্মদ নাদির শাহ তাঁর নিজের এবং তাঁর জাতির পক্ষ থেকে অমর কবির প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ এ সমাধিসৌধ নির্মাণ করে দিয়েছেন।

এ কথা স্মরণযোগ্য যে, মুহম্মদ ইকবালই সর্বপ্রথম দাবী করেছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়কে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে পৃথক করে একটি আলাদা জাতিরূপে গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের জন্যে এমন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের পত্তন করতে হবে যেখানে ইসলামের মর্মকথা হবে তাদের জাতীয় জীবনের মূলমন্ত্র এবং তারা জীবন যাপন করবে ইসলামী নীতি ও ঐতিহ্য অনুসারে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এ ঘোষণার পর এই আদর্শ মুসলিম রাষ্ট্রই হয় ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ধ্যান ও জ্ঞান এবং তারা প্রাণপণ করে এ রাষ্ট্রের বাস্তবায়নে। মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে এ মুসলিম রাষ্ট্র পৃথিবীর মানচিত্রে অভ্যুদিত হয়।

সমগ্র জীবনকাল ইকবাল জ্ঞানান্বেষণে নিমগ্ন ছিলেন। ফলে, তিনি একজন মহান ইসলামী চিন্তা-নেতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ছিলেন একজন সৃষ্টিশীল প্রতিভাধর; এবং সাথে সাথে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্বপ্রকার মতবাদের সাথে তাঁর ছিল নিবিড় ও গভীর পরিচয়। এ কারণে বিজ্ঞান, ধর্ম ও ললিতকলা সমন্বিত একটি সামগ্রিক ও পূর্ণ ব্যাখ্যা-সম্বলিত নিজস্ব দর্শন-পদ্ধতি গড়ে তুলতে এবং তা জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করতে তাঁর কিছুই অসঙ্গতি ঘটেনি। তাঁর মনীষা এ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যোগ্য ও যথাযথ বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি ইসলামী মরমীবাদে সুশিক্ষিত ছিলেন; বিশেষ করে, সুফী জালালুদ্দীন রুমীর শিক্ষা তাঁর বিশেষভাবে আয়ত্ত ছিল। পাশ্চাত্য চিন্তাজগতে কান্ট যেভাবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছিলেন, ইসলামী চিন্তাধারার পুনর্গঠনে ইকবালের অবদানও তাঁর সমকক্ষ ছিল। বিভিন্ন ফারসী ও উর্দু কবিতার মাধ্যমে ইকবাল তাঁর চিন্তাধারার অনেকখানি প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদেরকে এ চিন্তাধারা ও বর্ণনারীতি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। অতঃপর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইংরেজী ভাষায় প্রদত্ত কতকগুলো বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি তাঁর দর্শনধারা সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেন। এসব বক্তৃতা 'দ্য রিকন্সট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট্ ইন ইসলাম' (The Reconsturction of Religious Thought in Islam); ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন) নামক একটি পুস্তকে গ্রথিত

করা হয়। এখানে তিনি মুসলিম চিন্তাধারা ও পাশ্চাত্য দর্শনের সম্পর্ক বিচার করেছেন এবং দেখিয়েছেন, বিশ্বজগত সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান প্রদত্ত তথ্যাবলীর আলোকে, ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন না করে কিভাবে ইসলামী চিন্তাকে পুনর্গঠিত ও পুনরায় কার্যকর করা সম্ভব যা আজ একান্ত প্রয়োজন।

তাঁর ধর্মীয় দর্শনে ইকবাল মানবাত্মার অত্যন্ত গভীর প্রদেশ স্পর্শ করতে চান। তাঁর মতে, বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত তথ্যাবলীর মধ্যে প্রভেদ রয়েছে। কুরআন এমন আকারে অবতীর্ণ হয়েছে যে, বিভিন্ন মানস নিজ নিজ দিক থেকে সহজেই এর অন্তর্নিহিত সত্য বুঝতে পারে। কুরআনীয় সত্য বুঝতে হলে বহিরিন্দ্রিয়ের সাথে সাথে আন্তরিক জ্ঞানকেও সজাগ করে তুলতে হবে। আন্তরিক জ্ঞানের কেন্দ্র হলো হৃদয়। এর অর্থ হলো; এতে বাহ্যিক জ্ঞানের সাথে সাথে হৃদয়ানুভূতির প্রয়োগও একান্ত প্রয়োজন। কেউ কেউ মনে করেন যে, মন এবং ইন্দ্রিয়াবলীর, চিন্তা এবং অনুপ্রেরণার কাজ আলাদা। এগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। কিন্তু ইকবাল তা অস্বীকার করেন। তাঁর মতে, ইন্দ্রিয়ানুভূতি সহজভাবেই মানস কর্মের সাথে সম্পর্কিত; অনুপ্রেরণা চিন্তারই উন্নততর প্রকাশ। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, ইসলামে মানুষের স্বাধীনতা স্বতঃস্বীকৃত; কিন্তু কতিপয় ক্ষমতা দখলকারী ব্যক্তি নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণের জন্যে সাধারণ মুসলিম সমাজকে অদৃষ্টবাদের কঠোর শৃঙ্খলে বন্দী করে জাতির ও সমাজের অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করেছেন।

ইকবাল দর্শন মূলত ধর্মভিত্তিক। ইসলামের মহিমা প্রচার এবং মুসলিম জাতিপুঞ্জের মধ্যে নতুন রক্তধারা ও প্রেরণা সঞ্চারণ এর অন্যতম বিশেষ উদ্দেশ্য। তিনি বলেন যে, তারা নিজেদের ধর্মের নীতিসমূহ পালন করে চললে নিঃসন্দেহে তাদের ভবিষ্যৎ গৌরবময়। অবশ্য তাঁর দর্শন-পদ্ধতির উদ্দেশ্য বহুবিধ। অতএব তিনি তাঁর ভাবধারা ও মতবাদ প্রচারের জন্যে নানা পন্থা অবলম্বন করেছেন। কেবল তর্কশাস্ত্রনির্ভর করে তিনি তাঁর মতবাদ দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন নি; তাঁর শ্রোতাদেরকে সদ্‌জ্ঞান, কাব্য রসগ্রাহিতা ইত্যাদির প্রতিও তিনি আহবান জানিয়েছেন। ইকবালকে পাকিস্তানের কবি ও ইসলামের দার্শনিক বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ আখ্যায়ন যথাযথ হয়েছে। সাথে সাথে তিনি ইসলামের কবি ও পাকিস্তানের দার্শনিকও বটেন; কেননা, তাঁর কল্পিত পাকিস্তান ইসলামেরই একটি রাষ্ট্রীয় প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলামের গৌরব কীর্তনে তাঁর লেখনী পুনঃ পুনঃ নিয়োজিত হয়েছে; কিন্তু কীর্তনেই তা পর্যবসিত হয়নি। ইসলামের মর্মবাণী শুনিয়ে তিনি জনগণকে আহবান করেছেন –আলস্য ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াতে।

ইকবালের মতে, মানুষের সর্বকর্মের চরম উদ্দেশ্য প্রীতিপূর্ণ এবং সম্ভ্রমশীল জীবন যাপন। সর্বপ্রকার মানবীয় শিল্প কলা ও বিজ্ঞানচর্চাকে এ মূল উদ্দেশ্যের নিয়ন্ত্রণ মেনে নিতে হবে। এহেন প্রাণশক্তি সৃষ্টির ক্ষমতাই হবে মানুষের সর্বপ্রচেষ্টার মূল্যমান। শ্রেষ্ঠতম আর্ট হলো তা-ই, যা মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তোলে এবং জীবনকে সাহসিকতার সাথে মুকাবিলা করবার প্রেরণা জোগায়। যা কিছু আমাদেরকে ঝিমিয়ে তোলে এবং বাস্তব থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখে, তা হলো মৃত্যু এবং ধ্বংস স্বরূপ।

তাঁর মতে, বর্তমান ইউরোপীয়রা জীবনের বস্তুধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আচ্ছন্ন। তাদের মধ্যে মানবাত্মা ও অন্তরানুভূতির আকুতি মৃতপ্রায়। তারা কোনো নৈতিক বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ স্বীকার করে না। কারণ তারা মনে করে যে, এসব ব্যাপার নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। চিন্তার রাজ্যে আজকের ইউরোপবাসী নিজের মধ্যে এবং অন্যদের সাথে নিরন্তর দ্বন্দ্বে কালহরণ করছে। সে আজ নিজের স্বার্থ এবং পাশবিক আনন্দের প্রবণতাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। সে আজ বস্তুবৈভবে সম্মোহিত এবং বাস্তবের প্রাসাদ লাভ করবার প্রয়াস তাকে পদে পদে দুঃখ ও দুর্দশার আবর্তে আপতিত করছে।

কিছু কিছু পাশ্চাত্য ভাবধারা উদাহরণতঃ নীটশে ও বের্গস থেকে যদিও তিনি গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাই বলে এই পাকিস্তানী দার্শনিক ও কবি মুসলিম চিন্তাধারা ও মুসলিম অনুভূতি থেকে এক তিলও বিচ্যুত হননি।

ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে, ভ্রান্ত সুফীবাদের প্রভাবে পড়ে মুসলিম জাতিসমূহ আলস্যের কোলে ঢলে পড়ে। এতে করে তারা পার্থিব জীবন থেকে পলায়নের পথ খোঁজে এবং কর্তব্য ও কর্ম ত্যাগ করে বসে। তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন এই দুর্বলতা ও অলসতার বিরুদ্ধে জাতিকে জাগিয়ে তুলতে এবং পুস্তকাদি রচনা করলেন গতিধর্মিতা ও আশার বাণী প্রচার করতে।

এ উদ্দেশ্যে তিনি অহং বা খুদীর বাণী প্রচার করলেন। তিনি বললেন যে,

> জীবনের মূল ভিত্তি হলো ব্যক্তিসত্ত্বা। দার্শনিকেরা যে পরিপূর্ণ সামগ্রিক জীবনের মতবাদ প্রচার করে থাকেন, তা তিনি অস্বীকার করলেন। তাঁর মতে, আল্লাহ স্বয়ং হলেন একজন (পরম) ব্যক্তিসত্ত্বা। বিশ্বপ্রকৃতি হলো ব্যক্তিসমূহের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিশেষ- ম্যাকট্যা গার্টের এ মত ইকবাল সমর্থন করে সাথে সাথে বললেন যে, কিন্তু ম্যাকট্যাগার্টের মতে যে এ সম্পর্ক ব্যক্তি সংঘটিত নয়, বরং একটি স্বভাবজ দ্বন্দ্ব এবং অবিরাম বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ম প্রচেষ্টার ফল তা সত্য নয়। আমরা, মনুষ্য সন্তানেরা, নিজেদের পথ ধরে চলেছি। ইকবাল এ প্রসঙ্গে এ কুরআনীয় উক্তিটি অনেকবার উদ্ধৃত করেছেন ঃ
>
> অতএব আল্লাহর মহিমা (গীত হোক) শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্তা তিনি।

সূফী বিশ্বাস অনুযায়ী বিশ্বজগত হলো স্বয়ংসম্পূর্ণ ও একত্বায়িত। ইকবাল দর্শন তা অস্বীকার করে। সূফীদের মতে, মানুষের শেষতম আদর্শ হলো অনন্ত পরম জীবনে আত্মনিমজ্জন। ইকবাল দর্শনে পরিপূর্ণ মানব বা ইনসান-ই-কামিল হলেন ব্যক্তিত্ব ও আপনত্ববান এবং আল্লাহর নিকট সান্নিধ্যে আসীন। তিনি বিশ্বজগতে হারিয়ে যেতে পারেন না, বরঞ্চ বিশ্বজগত তাঁর আত্মস্থ। জীবন হলো একটি নিরবচ্ছিন্ন গতি, আর তার মূল অভিব্যক্তি হলো আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের সৃষ্টিতে। জীবন পথের সবচেয়ে বৃহৎ প্রতিবন্ধক হচ্ছে বস্তু ও নিসর্গ প্রকৃতি; কিন্তু এগুলো পাপাত্মক নয়; কেননা, এরা জীবনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাবলীর বিকাশে সহায়ক। সব প্রতিবন্ধক যখন পথ থেকে সরিয়ে ফেলা যায় তখন আত্মা মুক্তিলাভ করে; এবং এই আত্মা (খুদী) যখন পরম আত্মন রূপ আল্লাহর সান্নিধ্যে আসে, তখন সে হয় অধিকতর মুক্ত, আরও স্বাধীন। জীবন এই মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জনের বিরামহীন প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইকবালের এই খুদী বা ব্যক্তিত্ব থেকে শিল্প, ধর্ম ও রীতির একটি মূল্যমান পাওয়া যায়। এ থেকেই সম্ভব হয় ভালোমন্দের বিচার। যা কিছু ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী করে তা ভাল, আর যা কিছু ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে তা মন্দ। তাঁর মতে, খুদীর শক্তি নিহিত রয়েছে প্রেমে–যার অর্থ হলো উদ্যম ও সৃজনেচ্ছা। প্রেমের শ্রেষ্ঠতম মান অভিব্যক্ত হয় মূল্য ও মতবাদ সৃষ্টি এবং তাকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টায়। প্রেম খূদীকে শক্তি দেয়, আর ভিক্ষাবৃত্তি তার শক্তি হরণ করে। ভিক্ষাবৃত্তি হলো আলস্য, দুর্বলতা ও অকর্মের অন্য নাম।

গতানুগতিক জীবন-ধারা ও ভাবনা-চিন্তা তাঁর তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু তাঁর সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল মানবসমাজের সংস্কার সাধন এবং একটি সাধারণ মানবীয় বাণীর প্রচার। সে বাণী হলো জাগরণের, সজাগতার এবং কর্মের। মানবাত্মাকে তা চেয়েছে উন্নত ও শক্তিমান করে গড়ে তুলতে, চেয়েছে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগাতে এবং সৌন্দর্যবোধ ও পূর্ণতার মাধ্যমে উন্নততম সম্ভব স্তরে পৌঁছবার প্রেরণা জোগাতে।

ইকবাল বিশ্বাস করতেন যে, শিল্পকলা হবে যেন অনন্ত জীবনের অগ্নিশিখা স্বরূপ। যে শিল্পকলা দুর্বলশিখা, তা অর্থহীন। কোনো জাতি যতদিন সৃষ্টিশীল ও নবতর কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ থাকে, ততদিনই সে জাতি বেঁচে থাকে। যে শিল্পকলা সৃষ্টিধর্মিতা ও নব নবতর প্রয়াস হারিয়ে ফেলে, সে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়। শুধু কবিতা ও সংগীত দ্বারাই আর্টিস্ট-এর অন্তরাত্মা জীবন্ত থাকতে পারে না; এর জন্যে চাই বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য ও সত্যরূপের গভীরে অন্তর্দৃষ্টিদান ক্ষমতা। এ ক্ষমতা ব্যতিরেকে আর্টিস্ট-এর কর্ম হলো মূল্যহীন ও প্রভাবহীন।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইকবাল শুধুমাত্র পাকিস্তানের কবি ছিলেন না; তিনি ছিলেন ইসলামেরও কবি। তিনি সর্বান্তকরণে তাঁর স্বধর্মীয়দের দুর্দশা অনুভব করেছিলেন। নিজ দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করবার জন্যে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তা ছাড়া, সমগ্র পৃথিবীতে মুসলিম জাতিপুঞ্জের দুরবস্থা দৃষ্টে তিনি অত্যন্ত বিষণ্নবোধ করতেন। এ জন্যে তিনি সর্বপ্রচেষ্টায় চেয়েছিলেন তাদেরকে আবার জীবন্ত ও শক্তিশালী জাতিরূপে গড়ে তুলতে। তিনি চেয়ে ছিলেন, তারা যেন নিজেদের অতীত গৌরবের অনুসারী হয়ে, তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সহায়তায় বুদ্ধি ও কর্মের ক্ষেত্রে আবার উন্নতির পথে ধাবিত হয়। ভারতে একটি ইসলামী রাষ্ট্র পত্তন ছিল ইকবালেরই পরিকল্পনা যা পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাস্তবায়িত হয়েছে তাঁর পরলোকগমনের এক দশক পরে। কোনো সন্দেহ নেই যে, এক্ষেত্রে তাঁর আদর্শ ছিল পৃথিবীর বুকে এমন একটি আদর্শ জাতির অভ্যুত্থান, যা সমগ্র জগতের অন্ততপক্ষে সমগ্র মুসলিম জগতের জীবন যাপন প্রণালীকে প্রভাবিত করবে। সে উদ্দেশ্য সাধনে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

ইকবাল এই বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন যে, প্রতীচ্যের মন এবং প্রাচ্যের হৃদয়ের মধ্যে সত্যিকার ও ঘনিষ্ঠ মিলন না আনতে পারলে মানবতার ভবিষ্যত শান্তির কোনো আশা নেই। তিনি মনে করতেন যে, এ পথে এমন একটি নতুন জগত সৃষ্টি করা যায়, যার মূলনীতি হবে প্রেম, বিচারবোধ, ভ্রাতৃত্ব ও মানবত্ব।

কবি দার্শনিক মুহম্মদ ইকবাল এই সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির বাণী শুনিয়ে গেছেন শুধু তাঁর সমসাময়িক এবং মুসলিম জাতিসমূহকে লক্ষ্য করে নয়, বরং সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের বিবেককে উদ্দেশ্য করে।

কায়রোর সুপ্রীম কাউন্সিল অব আর্টস্ অ্যান্ড লিটারেচর কর্তৃক অনুষ্ঠিত ইকবাল সপ্তাহ পালন উপলক্ষে উদ্বোধনী বক্তৃতায় সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব সাজ্জাদ হায়দার বলেন-

ইকবাল ছিলেন একজন মহান চিন্তাবিদ, দার্শনিক, কবি ও বিপ্লবী। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বমানবতাবাদী, অধঃপতিত প্রাচ্যভূমির অক্লান্ত সৈনিক এবং সর্বোপরি, ইসলামের কবি।

আরব বিশ্বের কাছে তিনি অপরিচিত নন মোটেও। পাকিস্তানে নিযুক্ত প্রথম মিসরীয় রাষ্ট্রদূত ডঃ আবদুল ওয়াহহাব আযযাম-এর প্রচেষ্টায় আরব দেশসমূহের সর্বত্র তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ডঃ আযযাম এ পথে অগ্রণী এবং তাঁর আন্তরিক চেষ্টায় আজ আরব বিশ্বে অতিমাত্রায় ভাবাবেগের সাথে ইকবালের কবিতাবলী আবৃত্তি করা হয়ে থাকে, তাঁর দর্শন ধারা আলোচিত হয়ে থাকে। অবশ্য আরও অনেক কাজ আপনারা করে চলেছেন। আরব বিশ্বে ইকবালের রচনাবলীর আরও অধিকতর অনুবাদকার্য অভিপ্রেয়।

ইকবালের বহুবিচিত্র প্রতিভার কথা উল্লেখ করেছি। তাঁর অবদানের প্রতিটি দিক নিয়ে অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। আমি আজ চেষ্টা করবো তাঁর বিপ্লবী মানসের কিছুখানি পরিচয় দিতে । তাঁর রচনাবলীকে তিনটি স্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম এবং প্রাথমিক বিভাগে তাঁর পরিচিতি একজন উগ্র জাতীয়তাবাদীরূপে। এ সময়ে তিনি গান গেয়েছেন স্বদেশ ভারতভূমির গৌরব কীর্তন করে;

আমাদের হিন্দুস্তান সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে উত্তম।

এ পর্যায়ে তিনি ভারতীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিভেদ ভুলে একাত্ম হয়ে যেতে। তিনি তাদেরকে সাবধানবাণী শোনালেন ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে। তিনি তাদেরকে বললেন ঃ পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে মস্তক উঁচু করে দাঁড়াতে।

তাঁর কবিতা ও দর্শনের দ্বিতীয় পর্যায় আরব্ধ হলো কেমব্রিজে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে মুখোমুখি আসবার পর। তখন তাঁর অন্তরে সংশয় দেখা দিলো, মানসিক দ্বন্দ্ব তাঁর আত্মাকে উৎপীড়িত করে তুললো। অবশেষে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, পাশ্চাত্য দেশসমূহে জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায় এবং কার্যত জাতীয়তাবাদ যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা একটা সংকীর্ণ মতবাদ, আর তা মানুষকে নিয়ে চলেছে ধ্বংসের পথে। এর প্রতিক্রিয়ায় তাঁর অন্তর খুলে গেলো; তিনি জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানবজাতির দিকে ফিরে তাকালেন। বিশেষ করে তিনি প্রাচ্যের অধঃপতিত জনগণের মুক্তির দিশারীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন;

এশিয়ার জনগণ আজ কি অপার দুঃখে আপতিত; এবং তাদের ভবিষ্যৎ আরও কত বিপদাপন্ন-এ কথাটি বলবারও যে কেউ নেই।

অথবা

এশিয়ার দীপশলাকা আমাতে আরোপিত হয়েছে,
কেন না, আমার শিখা হলো উদ্যাম ও দুঃসাহসী।

তাঁর চিন্তার তৃতীয় ও পরিণত পর্যায় দেখা দিয়েছে ইসলাম ধর্মকে অবলম্বন করে। এ পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টি ইসলামের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে দৃঢ় সংবদ্ধ এবং ইসলামকেই তিনি দেখেছেন পৃথিবীর সর্বদুর্দশার অভ্রান্ত প্রতিকারস্থল রূপে। এতেই তাঁর কল্পনারাজ্যে নবতর জীবন স্পন্দন জাগলো। তিনি ইসলামের গৌরব ও ইসলামের পুনরুজ্জীবনের গান সোচ্চার কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন। সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম জাতি পুঞ্জকে আহবান করলেন তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করে জেগে উঠতে, জাতি গঠনের কাজে লেগে যেতে। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি পড়লো ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত আরব ভ্রাতৃবৃন্দের দিকে। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে একটি কবিতায় তিনি বললেন ঃ

হে নেতা! পৃথিবী থেকে শান্তি তিরোহিত হয়েছে।
যে জীবনের আমি আকাঙক্ষী তা কোথাও নেই।
এ বিশ্বের কাননে কাননে কুসুমরাজির ভিড় লেগেছে;
কিন্তু হায়। কোথাও নেই সত্যিকারের প্রেমমদির সুবাস।
আমি এলেম আমার সামান্য উপচার ও দর্পণটি হাতে নিয়ে;
এখানকার স্বর্গোদ্যানের কোথাও যা মিলবে না
তা-ই বিধৃত হয়ছে এর বুকে।
ত্রিপোলীর শহীদানের রক্ত এতে জমাট বেঁধেছে;
হে আমীন! তোমার মিল্লাত-এর ইযযত এতে প্রতিফলিত।

এখানে ত্রিপোলীর শহীদানের উল্লেখ লক্ষ্যণীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সুশ্রুষা করতে গিয়ে ফাতিমাহ বিনতে আবদুল্লাহ প্রাণত্যাগ করেন। ইকবাল এতে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। ফাতিমার স্মৃতিতে তিনি একটি সুন্দর কবিতাও রচনা করেন। মুসলিমদেরকে তিনি শুধু ঔপনিবেশিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে অনুপ্রাণিত করেননি, তার সাথে তাদেরকে তিনি শুনিয়েছেন স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী। তিনি তাদেরকে শিক্ষা দেন ক্ষুদ্র জাতীয়তার সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে একটি বিশাল মহাজাতিরূপে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে। তাঁর কথায় ঃ

আমাদের মূল কোনো একস্থানে নিবদ্ধ নয়।
আমাদের সুরার স্ফূর্তি কোনো একটি আধারে আটক নয়।
হে মুসলিম! তোমার হৃদয়কে আবদ্ধ করো না
কোনো একটি ভূখন্ডের প্রাচীরে।
এমন কি, গোটা পৃথিবীর আওতায়ও নিজেকে হারিয়ে ফেলো না।
সত্যিকার যে মুসলিম
সে কখনও কোনো দেশের চৌহদ্দিতে নিজেকে জড়ায় না।
তার হৃদয়াভ্যন্তরে
সিরিয়া ও রূম-এর ভেদরেখা বিলুপ্ত।
আবার

তোমাদের মিল্লত পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সাথে তুলনীয় নয়।
এ একটি একক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
পাশ্চাত্যের একতার ভিত্তি হলো দেশ ও জাতি,
তোমাদর মযহাবী একতা ধর্ম ও সংস্কৃতিভিত্তিক।

মুসলিম যুব সম্প্রদায়কে তিনি বারবার আহবান জানিয়েছেন। তাদেরকে তিনি কবি কল্পনায় উপমিত করেছেন বাজপক্ষীর সাথে। এতে তিনি তাদের সামনে দু'টি উদ্দেশ্য ধরেছেন;

এক ঃ মুক্তি সংগ্রাম,
দুই ঃ নিজ আত্মন বা খুদীর বিকাশ সাধন।

প্রথম উদ্দেশ্য সাধনের ব্যাপারে তিনি বলেছেন ঃ

হে মুসলিম! তুমি কি কখনও চিন্তা করে দেখেছ
ইস্পাত নির্মিত তীক্ষ্ণধার তরবারীর ভাষা কি?
এ হলো সেই কবিতার প্রথম ছত্র
যা তৌহীদের মর্মবাণী ধারণ করে।
কিন্তু আমি আরও বেশী করে ভাবি
এ কবিতার দ্বিতীয় ছত্রের কথা
আল্লাহ তোমাদেরকে বখশিশ করুন সেই 'ত্যাগী'র তরবারী
যখন মোমেন ধারণ করে এ তরবারী
তখন সে হয় বীর খালেদ ও দুর্দম হায়দার সদৃশ।

ইকবালের বহু আলোচিত খুদী দর্শনের মূলে রয়েছে একটি চিরন্তন প্রশ্ন ঃ
জীবন কি? সে প্রশ্নের জবাব তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর কথায় ঃ
জীবন হলো ব্যক্তির অভিব্যক্তি।

তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, জীবন সত্য মায়ামাত্র নয়। খুদীকে অবলম্বন করে মানবব্যক্তিত্ব একটি স্বনির্ভর ও অন্যনিরপেক্ষ কেন্দ্ররূপে দেখা দেয়; এবং ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ খুদীর উন্নয়নের মারফতই লভ্য হয়ে থাকে। মানবব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে পরিণত হয় সমাজ ব্যক্তিত্বে। এ উন্নততর অবস্থাকে বজায় রাখতে হয় ব্যক্তিত্বের সজাগতা দ্বারা। যদি ব্যক্তিত্বের এই সজাগতা রক্ষা না করা হয়, তবে তাতে আসে অস্বাদ। তাতে তিনি আরও বলেন ঃ দৈহিকভাবে এবং আত্মিকভাবে মানুষ একটি একাধারে আত্মনির্ভর ও পরনিরপেক্ষ কেন্দ্রস্বরূপ। কিন্তু তাতেই তার পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব অর্জন হলো না। পরিপূর্ণ মানব হলেন তিনি, যিনি আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করেছেন। তিনি আল্লাহর আত্মবিসর্জন করেন না, বরং আল্লাহকে আত্মস্থ করেন। সত্য ব্যক্তিসত্ত্বা জগত সত্ত্বায় হারিয়ে যেতে পারেন না, জগতজীবনই তাঁতে ন্যস্ত। তিনি বলেন ঃ

সে-ই বিশ্বাসভ্রষ্ট যে বিশ্বের মধ্যে নিজ অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে,
সমগ্র বিশ্বজগত অবলুপ্ত হয় বিশ্বাসীজনের হৃদয়কন্দরে।

কিন্তু এ বিশ্বাসের বেলায়ও ইসলামই হলো তাঁর মানদন্ড। তাঁর কথায় ঃ

খুদীর একান্ত মর্মকথা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই।
খুদী একটি তলোয়ার সদৃশ আর এ তলোয়ারের শান পাথর
–'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই'।

এ সঙ্গীত কোনো ফুল মৌসুমের অপেক্ষা করে না।
বসন্ত ও শরৎ সবাইর কণ্ঠে ধ্বনি ওঠে 'আল্লাহ ছাড়া আর
কোনো উপাস্য নেই'।

ইকবাল স্বয়ং ছিলেন একজন সত্যিকারের দরবেশ বা কলন্দর। নিজেরই মতবাদ অনুধাবন করে তিনি সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর নিজের কথায় ঃ

খোদামস্ত দরবেশ পূর্ব বা পশ্চিমে অবরুদ্ধ নয়।
আমার গৃহ দিল্লী বা ইস্পাহান বা সমরকন্দে নয়।

তিনি জাতি সৃষ্টির খেল পসন্দ করতেন না। জাতি সংঘ (League of Nations) গঠনের পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বমানব সংঘ (League of the People of the World) গড়ে তুলতে। জানা যায় যে, এ প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, প্রভু এবং ভৃত্যের ব্যবধান মানব সমাজের বিকৃতি ঘটায়; তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বজনীন মানব সমাজ সংক্রান্ত কুরআনীয় মতবাদকে বাস্তবে রূপায়িত করতে।

বলা হয়েছে যে, প্রথম জীবনে ইকবাল একজন দৃঢ়চিত্ত জাতীয়তাবাদী ছিলেন। এমন কি, ডঃ আযযাম বে তাঁর বইয়ে বলেছেন যে উপমহাদেশের অমুসলিম সম্প্রদায় তাঁকে নিজেদের বলে দাবী করেছে। এখন আমাদের চিন্তা করে দেখা উচিত ঃ এহেন একজন উদারচিত্ত ব্যক্তি কেন ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চেয়ে গেলেন।

উত্তর অবশ্য কঠিন নয়। মরহুম কায়েদ-ই-আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহও প্রথম জীবনে ভারতীয় মিলিত জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন এবং 'হিন্দু মুসলিম মিলনের দূত' বলে আখ্যা লাভ করেছিলেন। কিন্তু দু'জনই পরে বুঝতে পারলেন যে, সহস্রাধিক বছর ধরে এক সাথে বসবাস করা সত্ত্বেও, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় আসলে দু'টি সম্পূর্ণ ও স্পষ্টতঃ আলাহিদা মানবগোষ্ঠি। এ দু'সম্প্রদায়ের আশা ও আকাঙ্ক্ষা উদ্যম ও শঙ্কা আলাহিদা; তাদের ধর্ম, ভাষা ও ঐতিহ্যগত উত্তরাধিকার আলাহিদা। তারা দু'টি আলাহিদা জাতি। অতএব কবি-দার্শনিক ইকবাল ও সত্যিকার মহান দেশপ্রেমিক জিন্নাহ দশকোটি ভারতীয় মুসলিমের জন্যে একটি আলাহিদা সার্বভৌম রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনই একমাত্র যুক্তিযুক্ত পন্থা বলে সাব্যস্ত করলেন। কিন্তু তাঁরা তার চেয়ে কিছু অধিক করেছেন। তাঁরা দু'জনেই আমাদের আরব ও অন্যান্য মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের দিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। এই মৌলিক দৃষ্টিভংগি অনুধাবন করলেই সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যাবে, মুসলিম জাহানের কাছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের প্রকৃত তাৎপর্য কি। এতেই রয়েছে আমাদের সামগ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বীজ নিহিত। এ জন্যেই ইকবালকে আজ পাকিস্তানের কবি-দার্শনিক বলে আখ্যায়িত করা হয়।

স্বভাবতই ক্বায়েদ-ই-আযম জিন্নাহ ও ইকবাল দু-ই আমাদের পরম গৌরবময় স্মৃতি। দু'জনেই আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আমাদেরকে বিশ্বমানচিত্রে একটি সম্মানজনক আসনে অধিষ্ঠিত করে গেছেন। কিন্তু বিশেষ করে ইকবাল আমাদেরকে যা দিয়েছেন, যে উদ্দেশ্য ও পথে পরিচালিত করেছেন তা আমাদের একেলার নয়; আমরা যতখানি পাকিস্তানী, ততখানিই আপনাদের এবং বিশ্ব মুসলিম জাতিপুঞ্জের সহোদর।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র সরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিক্কর আল মা'সার' পত্রিকায় ইকবাল জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লিখিত প্রবন্ধে ডঃ আবদুল কাদির মাহমুদ বলেন-

জামালুদ্দিন আল আফগানীও তাঁর নিকট এবং দূর-প্রাচ্যের ওপর পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ইকবাল এলেন তারপর। তিনি মুসলিম চিন্তাধারার পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করলেন। এ ক্ষেত্রে সমসাময়িককালে তিনিই ছিলেন অগ্রণী। তিনি একাধারে প্রাচ্যের কর্মবিমুখতা এবং পাশ্চাত্যের মার্কসবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন।

এ দু'দল থেকেই কিছু কিছু নিয়ে এবং নিজেদের কিছুটা বৈশিষ্ট্য সমন্বয়ে আর একটি দল কার্যক্ষেত্রে অবতরণ করলো বিংশ শতকের প্রথম দিকে; এ দল হলো আল আক্কাদপন্থীরা।

এখন দেখা যাক, ধর্মীয় পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে ইকবালের বক্তব্য কি এবং সাধারণভাবে ইসলামী চিন্তাধারায় এই পুনর্গঠন প্রয়াসে তাঁর অনুপ্রেরণার উৎস কি।

ইকবাল ইউরোপীয় ও মুসলিম সংস্কৃতির বিস্তারিত ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে এ প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, বিগত পাঁচ শতাব্দী ধরে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় চিন্তাধারা সুপ্তিমগ্ন অবস্থায় ছিল; কিন্তু ইউরোপীয়রা এই মুসলিম চিন্তাধারা থেকেই প্রেরণা গ্রহণ করেছে। তাঁর দৃষ্টিতে, এ কালের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো আধ্যাত্মিকভাবে পাশ্চাত্যকে অনুকরণে বিশ্বমুসলিম সমাজের উন্মত্ত অভিযান। ইউরোপীয় বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতিধারায় যতখানি মুসলিম সংস্কৃতির কোনো না কোনো দিক এর বিকাশের ফলে লভ্য হয়েছে, ততখানির ব্যাপারে অবশ্য এ অনুকরণ অন্যায় নয়। কিন্তু ইকবাল শঙ্কিত হলেন এই দেখে যে, হয়তো তা করতে যেয়ে মুসলমানেরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাহ্যিক জাঁক-জমকের দ্বারা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার সত্যিকারের মৌলিক গুণাবলী আয়ত্ত করে নিতে ব্যর্থ হবে। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী মুসলিম জাতিপুঞ্জ যখন চিন্তাজগতে অনুপস্থিত, তখন অতীতের মুসলিম দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের আলোচিত ও ব্যাখ্যাত বিষয়াবলী নিয়েই ইউরোপীয় মনীষীরা চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন এবং এভাবে সমসাময়িক ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। ইউরোপীয়রা যখন প্রকৃতির ওপর নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হলেন, তখন প্রাচ্যের কোনো কোনো অঞ্চলের মুসলমানেরা বৌদ্ধ ও পারসিকদের অনুকরণে মরমীবাদের চর্চায় ব্যস্ত।

ইকবাল আশাবাদী ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এশিয়া-আফ্রিকার যুবসম্প্রদায় প্রাচ্যের এই মহাজাগরণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। অতএব তাদের মধ্যে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে একটু নতুন অন্তর্দৃষ্টি জাগিয়ে তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করা তিনি অবশ্য কর্তব্য মনে করলেন। এর জন্যে তাদের চাই একটি স্বাধীন চিন্তাপদ্ধতি, যাতে তারা ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারে এবং মুসলিম চিন্তাধারার পুনর্গঠনে সহায়তা করতে পারে।

বস্তুতঃ ইকবালের মতে, যে আদর্শবাদ ইউরোপ দাবী করে, তা তার নিজস্ব চিন্তাধারা থেকে স্বতঃ উৎসারিত নয়, আর সে চিন্তাকে সুপরিচালিত করবার কাজেও আসে না। এ কারণে ইউরোপ কতকগুলো অদ্ভুত ও পরস্পরবিরোধী ধারণার জালে জড়িয়ে পড়েছে। এতে তার ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, তার সন্ধানী দৃষ্টি দিশাহারা হয়ে পড়েছে; এবং যে গণতন্ত্রের এখানে অভ্যুদয় ঘটেছে তাতে সহনশীলতার অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়েছে। এ গণতন্ত্রের একমাত্র উপজীব্য হলো ধনীর স্বার্থে দরিদ্র শোষণ। তাঁর সময়কালীন ইউরোপ সম্বন্ধে ইকবাল বলেছেন যে, এ হলো জনগণের নৈতিক ও মানবীয় বিকাশের সর্বপ্রধান অন্তরায়। অপরপক্ষে, নিজ অনুসৃত সত্যপন্থা সম্বন্ধে মুসলমানের একটি পরিচ্ছন্ন এবং চূড়ান্ত মনোভাব রয়েছে, যার আলোকে সে নিজের বর্তমান সম্বন্ধে ধারণা করতে পারে, ইউরোপকে একদিন সে যে বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ অতীতকে স্মরণ করতে পারে এবং নিজের ও বিশ্বজনের ভবিষ্যতের বিকাশ সাধন করতে পারে।

ইকবাল দর্শনের কেন্দ্রীয় ধারণা হলো; হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-ই হচ্ছেন মুসলিম সংস্কৃতির মূল উৎস ও প্রাণস্বরূপ। এই মহামানব অতীত ও বর্তমান বিশ্বের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর বাণী উৎসারিত হয়েছে অতীত বিশ্ব থেকে, কিন্তু তার মর্ম এখনও সমভাবে প্রাণবন্ত। হযরত মুহম্মদ নির্দেশ দিয়েছেন সমসাময়িক ভাবধারা অনুযায়ী জীবন যাপন করতে। ইসলামের পুনরুজ্জীবন হবে বুদ্ধি, যুক্তিযুক্ততা, স্বাধীন চিন্তা এবং জীবনায়োজনে যথার্থের ওপর ভিত্তি করে। ওয়াহীর চিরন্তনতা সম্পর্কীয় মতবাদ ইকবাল অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন যে, এ মতবাদ গুরুতর পরিণতির সৃষ্টি করেছে এবং ইসলামের সত্যিকার মর্ম থেকে অনেক দলকে বিচ্ছিন্ন করেছে। তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে, রিসালাত-এর মাধ্যমে ইসলাম তথা ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে; অতএব রিসালাত-এরও সাথে সাথে পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে ইকবালের যুক্তি কি? তা হলো পুরোপুরি ইসলামী নীতি অনুসারী। ইসলামে ধর্মীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বীকৃতি নেই; ইসলাম উত্তরাধিকার সূত্রে রাজত্বের নীতিও গ্রহণ করে না। কুরআন মানুষকে বারংবার অনুপ্রাণিত করেছে চিন্তা করে দেখতে এবং অনবরত পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিয়োজিত থাকতে। মানুষের জ্ঞান ও শিক্ষার মূল উৎস হলো মহাবিশ্ব প্রগতির গভীরে নিহিত তথ্যাবলী নিরীক্ষণ এবং অতীতকালীন জাতিসমূহের ইতিহাস অধ্যয়ন। শেষ প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহম্মদ (সাঃ) -এর পরে আর কোনো ঐশীবাণী অবতীর্ণ হয়নি। আজকে আমি তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণতা দান করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহের দান সম্পন্ন করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্মরূপে মনোনীত করলাম। (কুরআন -৫ঃ৩)।

কিন্তু এ থেকে কি মনে করা চলে যে, ইকবাল মরমী অনুভূতি চর্চার বিরোধী যা নবুয়তের কাছাকাছি এবং তার সাথে কোনো বিরোধভাবাপন্ন নয়?

কুরআন বিভিন্ন জাতি ও পৃথিবীর চতুষ্কোণে ব্যাপ্ত তথ্যাবলীকে জ্ঞানের উৎস মনে করে। এতে কথিত হয়েছে শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (কুরআন অনুসারীদেরকে) দূরতম অঞ্চলস্থ আমাদের নিদর্শনাবলী এবং তাদের নিজেদের মধ্যে নিহিত (নিদর্শনাবলী) দেখাবো।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলী আমাদের অন্তরের মধ্যে এবং বহির্বিশ্বে সর্বত্র বর্তমান। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে প্রত্যেকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে আমাদের বোধ অতখানি স্পষ্ট নয়।

যা হোক, নবূয়তের সমাপ্তির ব্যাপারে ইকবালের ধারণাকে এমন ব্যাখ্যা দেওয়া আমাদের উচিত হবে না যে, এতে বুদ্ধিবৃত্তি মানবীয় অনুভূতি ও ভাবপ্রবণতার স্থান দখল করে নিয়েছে। এটা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনীয়ও নয়। বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে বলা যায় যে, এ মনোভাব মরমী অনুভূতিকে বিশ্লেষণের জন্যে একটি স্বাধীন প্রেরণার সৃষ্টি করতে চায়। এ ধারণা মানুষকে বিশ্বাস করাতে চায় যে, মানুষের ইতিহাসবক্ষে এখন অলৌকিক বলে কথিত ব্যক্তি শক্তির অস্তিত্ব আর নেই। এ ধরনের বিশাসের একটি নিজস্ব মনস্তাত্ত্বিক শক্তি আছে, যা ব্যক্তি শক্তি বিকাশের সামনে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। মানুষের আধ্যাত্মিক অনুভূতির ক্ষেত্রে এ ধারণা একটি নবতর পথের সন্ধান দেয়।

মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর অভিব্যক্তি সম্পর্কীয় কুরআনীয় বাণীসমূহের যে ব্যাখ্যা অনেকে দিয়ে থাকেন, ইকবাল সে সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে অনুধাবনযোগ্য হলো; এ ধরনের আন্তরিক অনুভূতি থেকে সাধারণত বহির্জগত সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের প্রতি একটি সমালোচনামূলক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। এ জ্ঞান প্রাকৃতিক উপাদানসমূহে পবিত্রতা আরোপের বিরোধী, মুসলিম সংস্কৃতির গোড়ার দিকে উদাহরণত ইখওয়ানুস্ সফা আমলে যেমন ছিল।

যা হোক, ইকবাল সব মরমীয় অনুভূতিকেই মনে করেন অসাধারণ এবং বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষ; এসবকে পবিত্র মনে করে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করবার কোনো কারণ নেই। ইকবাল বিশ্বাস করেন যে, মরমী পদ্ধতিতে ধর্মীয় অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লাভ সম্ভব। কিন্তু তিনি তাকে অনেকখানি বুদ্ধিবৃত্তির সাথে যুক্ত করে দেখেন।

কিন্তু ইকবালের এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে বুদ্ধিবৃত্তির সাথে যুক্ত করে দেখার অর্থ কি এই যে, তিনি দর্শনকে ধর্মের চেয়ে অধিকতর গৌরবের স্থান দিয়েছেন?

তাঁর ধারণায় ধর্ম জীবনের একটি আংশিক অধ্যায় মাত্র নয়, একটি নিরেট চিন্তা, মনোভাব বা কর্মও নয়। এ হলো মানুষের সার্বিক প্রকাশ স্বরূপ। অতএব দর্শন যখন ধর্মকে বিচার-বিবেচনার নিক্তিতে তুলতে চায়, তখন তার যথাযথ স্থান তাকে দিয়ে তবে এ কাজ সম্ভব। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যুক্তি এবং চিন্তার মাধ্যমে জীবনের অন্যান্য অভিব্যক্তি ও উপাদানাবলীর মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের ব্যাপারে ধর্মের একটি মৌলিক দায়িত্ব রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইকবালের চিন্তাধারা হলো আল গাযালীর ধর্ম-দর্শন সংক্রান্ত ধারণার একটি সুষ্ঠু বিকাশ। ইকবাল মনে করেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধারণাবলীর প্রাজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে; কিন্তু সেগুলো সে-সব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের ভিত্তি অনুভূতিরাজির ব্যাখ্যায়ন মাত্র নয়। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, বিজ্ঞানের বিকাশের পূর্বেই ধর্মীয় জীবনের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাবলী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার নির্দেশ ধর্মই দিয়েছিল।

এই সুপরিণামদর্শী ইঙ্গিতের পরিপ্রেক্ষিতে ইকবাল বলতে চেয়েছেন যে, হযরত মুহম্মদের (সাঃ) একান্ত আন্তরিক বাসনা ও কর্মপ্রচেষ্টা ছিল একটি সচেতন ও উদ্যমশীল সম্প্রদায় সৃষ্টি করা। ইকবাল জোরের সাথে বলেন যে, রাজনৈতিক অধঃপতন এবং কারামতিয়াহ ও

ইরানীদের দ্বারা প্রভাবিত হবার পূর্বে মুসলমানেরা কখনও বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়েনি। এরা চেয়েছিল জীবন সংগ্রাম থেকে পালিয়ে বাঁচতে এবং সে জন্যে মানব ব্যক্তিত্বকে উচ্ছেদ ও অস্বীকার করতে। প্রকৃতপক্ষে, অন্য কোনো জাতিও মুসলিমদের এ পথ অবলম্বন করলে এই একই রোগে আক্রান্ত হতো এবং কর্মবিমুখতা ও পলায়নী মনোবৃত্তির শিকার হতো। এ অবস্থায় জীবনযুদ্ধে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকবার জন্যে তারা নানা রকম যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিয়ে থাকে।

ইকবাল আরও বলেছেন যে, নৈরাশ্যবাদীরা তাদের চিন্তাধারা আহরণ করেছে ইহুদী ও খৃষ্টান-দর্শন থেকে। ওল্ড টেস্টামেন্ট আদমের প্রতি অবাধ্যতার জন্যে পৃথিবীকে অভিশম্পাত করেছে; নিউ টেস্টামেন্ট বর্ণনায় জাতিকে পাপমুক্ত করবার জন্যে যিশুকে জীবন দান করতে হয়েছে। এসব মহাগ্রন্থ থেকেই জন্মলাভ করেছে সর্বপ্রকার নৈরাশ্যবাদ ও অদৃষ্টবাদ, যার ফলে মানুষের স্বাধীনতা ও আত্মপ্রত্যয় এবং আল্লাহ্ ও জীবনের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস স্থাপন অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

নিবিষ্ট চিত্তে কুরআন পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই যে, পূর্বতন ধর্মগ্রন্থসমূহের এসব ভুল-ভ্রান্তি এতে সংশোধিত করেছে। কুরআনে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন একটি বাসস্থান এবং শস্যক্ষেত্ররূপে একটি প্রচেষ্টা স্থল এবং জীবনধারণের অবলম্বনরূপে, একটি অভিশপ্ত স্থল বা মানুষের পাপজনিত তাকে অবরোধ করে রাখবার স্থানরূপে নয়।

ইকাবল দর্শন অনুসারে, মানুষের প্রথম পাপকার্যের তাৎপর্য হলো এই যে, এতে করে সে নিজের পসন্দ অনুসারে পথ বেছে নেবার স্বাধীনতা পেলো এবং তার একটি স্বাধীন চিন্তাশক্তি লাভ হলো। মানুষ নিজ কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করলেন। সৎকর্ম সহজাত প্রবৃত্তিবশে নয়, বরং নীতি সূত্রানুযায়ী ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগে সম্পন্ন হয়। নিয়তি-আশ্রয়ী মানুষ একটি যন্ত্রের মতো; সে কোনো ভাল কাজ করতে পারে না। অতএব ইকবালের মতে, সৎকর্ম সাধনের পূর্ব-শর্ত হলো স্বাধীনতা; আল্-গায্যালী প্রেম ও জ্ঞানকে এবং স্বাধীনতা ও তৌহীদকে এক সূত্রে আবদ্ধ করতে গিয়ে ঠিক এ কথাই বলেছেন।

ইকবালের 'খুদী দর্শন' ইসলামী তৌহীদ-এর মতবিরোধী 'ওয়াহ্দাতুল ওজুদ' বা 'অস্তিত্বের একত্ব'-মূলক সমগ্র দর্শন-পদ্ধতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তাঁর খুদী-দর্শন চায় যে, আমরা বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে জিজ্ঞাসা করি "অহং (আমি) বা খুদী বলতে আমরা কি বুঝি?"

এ কি একটি স্থায়ী ব্যাপার, না, শুধুমাত্র কল্পনাবিলাস? তাঁর মতে, ব্যক্তির এবং সম্প্রদায়ের জীবন এ প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভর করে; আর এ উত্তর নির্ভর করা উচিত ব্যক্তির এবং সম্প্রদায়ের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের ওপর নয়, বরং তাদের ব্যবহার, চাল-চলন এবং দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। দূর-প্রাচ্যের বেশীর ভাগ ভাবুক ব্যক্তি মনে করেন যে, মানুষের 'খুদী' একটি কাল্পনিক ধারণা। মানুষ এ জোয়ার থেকে মুক্তি পেলেই তার উদ্ধার। এ মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল সে সময়, যখন বিভিন্ন ধরনের মতবাদ ও কার্যকলাপ পরস্পরে সংমিশ্রিত হয়ে হিন্দুদের হৃদয়-মন দখল করে নিয়েছিল। বিদ্বজ্জনেরা যে পর্যন্ত না সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে,

এই "অহং"-এর জীবন চিরন্তন এবং এ-ই সর্বপ্রকার বিপত্তির মূল, ততদিন এ ধারণা প্রচলিত ছিল।

তাঁরা মনে করতেন যে, প্রযত্ন আসে পরিশ্রম ও কর্ম থেকে, আর পুরোপুরিভাবে কার্যদ্বারাই মানব-অহং-এর অবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয়। এ স্থলে ভারতীয় আদিম চিন্তাধারা ও মুসলিম চিন্তাধারার মধ্যে মিল রয়েছে। মুহীউদ্দীন ইব্‌নুল আরবী যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, শঙ্করাচার্যের গীতাভাস্যও সেই একই রকম। দু'জনের ব্যাখ্যাই 'অস্তিত্বের' একত্ব-মূলক মনোভাব-ভিত্তিক। ইব্‌নুল আরাবী মনে করেন যে, এ মতবাদই মুসলিম চিন্তাধারার ভিত্তিমূল। ষষ্ঠ শতাব্দীর ইরানীয় কবিদের সকলেই এ মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় দার্শনিকেরা যখন এ মতবাদকে বুদ্ধিভিত্তিক করে দাঁড় করাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইরানী কবিরা তাকে হৃদয়ের বস্তুতে পরিণত করে তুললেন, এবং স্বভাবত এটি ছিল অধিকতর কর্মক্ষম ও বিপদসঙ্কুল। ফলে এই 'অস্তিত্বের একত্ব' মতবাদ সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে এবং তাতে ধীরে ধীরে মুসলিম জাতি থেকে কর্মস্পৃহা অন্তর্হিত হয়। অধিকন্তু এ মতবাদ প্রতীচ্য পর্যন্ত ধাওয়া করে; হল্যান্ডের ইহুদী দার্শনিক স্পিনোযার কণ্ঠে পর্যন্ত এ মতবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

কতকগুলো চিঠিপত্র মারফত অধ্যাপক নিকলসন ইকবালের কাছে 'অস্তিত্বের একত্ব', 'অন্যনিরপেক্ষ জীবন' এবং 'ব্যক্তি-জীবন' সম্বন্ধে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন। ইকবাল জবাব দেন যে, জীবন হলো ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট এবং পরনিরপেক্ষ। জীবনের কোনো বাহ্যিক অস্তিত্ব নেই। জীবনের যখন অভ্যুদয় ঘটে, তখন তা ছিল একটি ব্যক্তি-আশ্রয়ী অভিব্যক্তি, অর্থাৎ 'একটা কিছু'। এমন কি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত একজন ব্যক্তি; কিন্তু তিনি এক ও একক, তাঁর মতো কেউ নেই। এ মত বৃটেনের হেগেল-পন্থীদের সিদ্ধান্তের বিরোধী। এ মত তাঁদেরও ধারণার বিরোধী, যাঁরা অস্তিত্বের একত্বে বিশ্বাস করেন এবং মনে করেন যে, জলবিন্দু যেমন সমুদ্রে মিশে যায়, তেমনিই মানব জীবনের উদ্দেশ্যও হলো সেই 'পরম-অহং' বিশ্বস্রষ্টার অস্তিত্বের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া।

এখান থেকেই ইকবালের যাত্রা শুরু হয়েছে আল্লাহ্‌র গুণাবলী প্রদর্শনকারী 'পরিপূর্ণ মানব' (ইন্‌সান-ই-কামিল) মতবাদ গড়ে তোলার পথে। তাঁর এই মতবাদ হযরত রসূলুল্লাহ্‌র (সাঃ) নির্দেশ 'আল্লাহ্‌র গুণে বিভূষিত হও'-এর সাথে সঙ্গতিশীল। এভাবে মানুষ 'অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব' অর্জন করতে পারে। পরিপূর্ণ মানব 'বিপথাচারী না হয়ে' আল্লাহ্‌র প্রতিচ্ছবিস্বরূপ। তিনি অন্য প্রাণীবৃন্দের মধ্যে অবলুপ্ত হতে পারেন না; বরঞ্চ অন্যান্য প্রাণীরা তাঁর মধ্যে অবলুপ্ত হবে; অর্থাৎ অন্য সব প্রাণীই মানুষের কর্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত।

'অস্তিত্বের একত্ব'-মতবাদে পরিপূর্ণ মানব হলেন অন্যম সূফী, যিনি আল্লাহ্‌তে সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জন করে আদর্শমার্গে পৌঁছাতে প্রয়াস পান। ইকবাল-দর্শনে 'আত্মপরতা' হলো মানুষের অনুভূতি ও প্রেরণাকেন্দ্র; এবং মানুষের বাসনা, ভাবপ্রবণতা ও চিন্তার মধ্যে এ-ই সামঞ্জস্য বিধান করে। ইকবালের মতে, মানুষের আত্মন কতকগুলো বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার সৃষ্টি করে; এই অবস্থাগুলো আবার কতকগুলো কর্মকেন্দ্রের জন্ম দেয়-যেগুলোর পরস্পরে কোনো সম্পর্ক অবশ্য নেই। নানা শ্রেণীর বস্তুজাতীয় উপাদানাবলী পরিপূর্ণতা অর্জনক্ষম নয়। পরিপূর্ণতা অর্জিত হতে পারে কেবলমাত্র খুদীর কর্মপ্রচেষ্টার ফলে।

ইকবাল বিশ্বাস করেন যে, 'আত্মন্' শুধু মানুষেরই একচেটিয়া নয়। বিশ্বজগতের সবকিছুর মধ্যে এ রয়েছে– পরমাণু থেকে শ্রেষ্ঠতম চিন্তাধারণা পর্যন্ত সব কিছুতেই। কোনো কোনো প্রাণীর মধ্যে এর অভিব্যক্তি অতি ক্ষীণ হয়ে দেখা দেয়; অবশ্য মানুষের মধ্যে এর অভিব্যক্তি পরিচ্ছন্ন এবং পরিপূর্ণরূপ। এ মতবাদ থেকে আমরা মানুষের মহত্ত এবং প্রাণীজগতে তার শ্রেষ্ঠত্ব রহস্যের একটি ব্যাখ্যা পাই।

ইকবালের মতে, মানব জীবন হলো পরিপূর্ণতা লাভের উদ্দেশ্যে একটি বিরামহীন প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম বিশেষ। এর অর্থ হলো ঃ বিশ্বজগতের সবকিছুই ব্যক্তি স্বরূপ, তাদের রয়েছে স্বাধীন সত্তা যত ক্ষুদ্র বা সামান্যই হোক্ না কেন। এ থেকে আরও মনে করতে হয় যে, এইসব ব্যক্তিসত্তাসমেত বিশ্বজগত প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত নয়। পরিপূর্ণতা নির্ভর করে আত্মন-এর বিকাশের ওপর তা মানুষের ক্ষেত্রেই হোক্ বা অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেই হোক। মানুষের মন হলো তার অহং বা খুদীর অনুভূতির ফল; মানুষের এ অনুভূতি যত প্রবল হবে, সে পরিপূর্ণতার তত নিকটবর্তী হবে। জীব জগতের অন্যান্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষমতা মানুষের রয়েছে; তবুও তার নিজস্ব একটা বিশিষ্ট অনুভূতি আছে যা তাকে মানবীয় মর্যাদা দিয়েছে। এই অনুভূতিপুঞ্জই মানুষের অস্তিত্বকে সজীব রেখেছে এবং এ কারণেই একটি ব্যক্তিসত্তারূপে বিরাজমান।

ইকবালের পুনরুজ্জীবন দর্শন সাধারণ বা অন্যনিরপেক্ষ একত্ব-ধারণা অস্বীকার করে তা বিশ্বজগতের ক্ষেত্রেই হোক বা জীবনের ক্ষেত্রেই হোক। জগতের সবকিছুই এক একটি ব্যক্তিসত্তা এবং প্রাণ হলো আল্লাহ্র অন্যতম অভিব্যক্তি। মানুষের মধ্যে খুদীর বিকাশ দেখা দিলে তাকে বলা হয় 'অহং' বা 'আমি'। তার সত্যিকার পরিপূর্ণতা হলো খুদীর দৃঢ় প্রতিষ্ঠায়, তার অপনোদন চিন্তায় বা সুফি-পদ্ধতিসমূহের অনুসরণে তার বিলুপ্তির প্রচেষ্টায় নয়। কেননা, মানুষ যদি নিজ খুদীকে অস্বীকার করে, তবে সে তখন হয় পরিপূর্ণভাবে অবলুপ্ত, যার অর্থ মৃত্যু। আল্লাহ্র গুণাবলীতে ভূষিত হয়ে মানুষ যতই খুদীর প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়াসী ও কর্মরত থাকবে, ততই সে সর্বপ্রকার বিলুপ্তি ও অবনতিকে প্রতিরোধ করে চলতে পারবে। এর এক মহৎ উদাহরণ হলেন মহাপুরুষ মুহম্মদ (সাঃ), যিনি ছিলেন আদর্শ পরিপূর্ণ মানব এবং সত্যিকারের সূফী–যেমন, পরম সত্যের আলোকচ্ছটা দেখে তিনি স্মিতহাস্য করেছিলেন। (কুরআনে উক্ত হয়েছে ঃ তিনি চোখ ফিরিয়ে নেননি, আর সীমালঙ্ঘনও করেন নি।) এর অর্থ হলো ঃ শক্তিমান খুদী আত্ম-অবলুপ্তিকে জয় করেন এবং কখনও কোনো প্রকার পদ্ধতি-শৃঙ্খলে বাধা পড়েন না। খুদীর শক্তি এবং ব্যক্তিত্ব তাকে অবলুপ্তি এবং পরম অস্তিত্বের বিশাল পারাবারে নিমজ্জন থেকে রক্ষা করে। এমন কি, বিচার দিবসের পূর্বক্ষণে যে পরিপূর্ণ অবলুপ্তি ঘটবে, তা-ও আত্মার পরিপূর্ণতার ওপর কার্যকর হবে না বা তার স্থায়িত্বে ব্যাঘাত ঘটাতে পারবে না।

ইকবাল বলেন, 'তাঁর সন্নিধানে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর কিন্তু তাঁর আলোক সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে যেয়ো না। তুমি যদি সত্যিই তেমন আত্মপ্রত্যয় অর্জন করে থাক, তবে নিজেকে তুমি একেবারে তাঁর মতোই জীবন্ত ও চিরঞ্জীব মনে করতে পারো।' পরিপূর্ণ মানব যিনি আল্লাহর এবং তাঁর প্রেরিত পুরুষের গুণাবলীতে ভূষিত। যিনি পবিত্র কুরআনের দ্বারা

চালিত, তিনি আল্লাহ্‌তে আত্মবিসর্জনের দিকে এগিয়ে যান না, বরঞ্চ তিনি চেষ্টিত থাকেন নিজের অনন্ত-অসীম খুদীকে শক্তিমন্ত রাখতে এবং তার অগ্নিশিখাকে ভাস্বর রাখতে।

এখানে ওয়াহদাতুল ওজুদ (অস্তিত্বে একত্ব) মতবাদের অনুসারীরা একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন ঃ কি করে শান্ত খুদী অনন্ত খুদী থেকে দূরে অবস্থান করতে পারে? শান্ত খুদী কি অনন্তের পাশাপাশি নিজের সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব বজায় রাখবার ব্যাপারে নিশ্চিত?

ইকবাল এসব প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে অনন্তকে ভুল বোঝা হয়েছে। অনন্ত বলতে এ বোঝায় না যে, এর কোনো সীমায়ন নেই। এ অনন্ত ক্ষমতার পরিমাপের নয়। অবশ্য শক্তিমান খুদীতে অনন্ত খুদী থেকে পৃথক করে বুঝতে হবে, যদিও সে পার্থক্য স্থান বা কালে নয়। এর অর্থ হলো এই যে, প্রকৃত ব্যক্তিত্ব কোনো একটি বস্তু নয়, বরঞ্চ একটি কর্ম। খুদীকে কোনো একটি বিশেষ স্থানীয় ঘটনা বা কোনো একটি বিশেষ কালে সংঘটিত কতকগুলো নিরীক্ষা বলে মনে করা ঠিক নয়; একে ব্যাখ্যা করতে হবে এবং বুঝতে হবে এর বিচারবোধ, এর ইচ্ছাশক্তি, এর আদর্শ এবং এর আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে। এর তাৎপর্য এ-ও যে, শান্ত থেকে মুক্তিলাভ করাতেই শ্রেষ্ঠতম আনন্দ লভ্য হয় না; শ্রেষ্ঠতম এবং উচ্চতম আনন্দের চাবিকাঠি হলো আত্মসংযম এবং ব্যক্তিসত্তা অর্জন। কর্মের ফলেই মানুষ আত্ম-অবলুপ্তি অথবা উন্নত ভবিষ্যৎ জীবনের পথে এগোয়। সত্যিকার যে কর্ম খুদীকে অমরত্ব দেয়, তা হলো মানুষের নিজের ও অন্যের খুদীর প্রতি সভ্রমবোধ। এখানে ইকবাল তাঁর পাঠকদেরকে তাঁর অমরত্ব সম্পর্কীয় মতবাদ উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ পবিত্র কুরআন অনুসারে, মানুষকে বিশ্বপ্রকৃতির নিগূঢ় তাৎপর্যের অবিচ্ছেদ্য অংশীদার হয়ে অমরত্ব অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। অমরত্ব মানুষের স্বাভাবিক অধিকার নয়, বরঞ্চ একটি যথার্থ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ফল; মানুষ শুধুমাত্র এ অনন্তত্ব অর্জনের একটি যোগ্য পাত্র বৈ নয়। তিনি বলেন, এতে কোনো অস্বীকৃতির প্রশ্ন নেই; আর যিনি পথের নির্দেশ পান, আলোক লাভ করেন, তিনি শুধুমাত্র এ আলোকে আলোকিতই হন্‌ না; কেন না, যে কোনো স্বাধীনতাপ্রাপ্ত খুদীর প্রতিটি কর্ম থেকে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং তাতে নতুনতর সৃষ্টি এবং আবিষ্কৃতির পথ খুলে যায়।

ইকবালের পুনরুজ্জীবন দর্শন জীবনের প্রচন্ডতম প্রগতিশীলতার ভিত্তি আবিষ্কার করেছে। এ বস্তুজগতে নিউটনের এবং প্রাণীজগতে ডারউইনের আবিষ্কৃতির সমধর্মী। জীবন হলো একটি একক বৈশিষ্ট্য; জীবন প্রগতিবাদ বিশ্লেষণযোগ্য নয়। জীবন-কর্মে প্রগতিবাদী ধারণা আরোপের ফল এই দাঁড়ায় যে, এতে এমনকি, মনকেও বিবর্তনের সৃষ্টি বলে স্বীকার করতে হয়। এ কথা বলতে গেলে বিজ্ঞানের সাক্ষ্য আধ্যাত্মীয় গবেষণানীতির বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। এসব অবস্থায় প্রকৃতি এবং জীবনের অভ্যুদয় সম্পর্কীয় আমাদের ধারণাবলী অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। আমরা যদি বলি যে, মন হলো জীবন উদ্‌বর্তনের ফল, তেমন ধারণাও একেবারে অন্যনিরপেক্ষ হলো না; কেননা, সে উদ্‌বর্তন ঘটাবার জন্যেও একটি শক্তির দরকার।

প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেকটি সৃজনশীল কর্মই হলো স্বাধীন কর্ম। সৃজনকর্ম হলো পুনরাবৃত্তিবিরোধী, যা গতিশীলতার একটি বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞান চায় সাদৃশ্য সৃষ্টি করতে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবর্তন অর্থাৎ গতিশীল চিন্তাধারাকে সুসংবদ্ধ করতে। অন্যপক্ষে গভীর

অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন জীবন চায় নিজ সম্পদকে বিধানায়িত করতে; এ করে সে নিজেকে নিয়তিবাদ থেকে মুক্ত করে নেয়। এ জন্যেই বিজ্ঞান কখনও জীবনের সত্যিকার অর্থ-তাৎপর্য বুঝতে পারে না।

মরমীপন্থীদের অথবা দার্শনিকদের প্রচারিত নিয়তিবাদ অতীতে বা বর্তমানে কতকটা অস্বীকৃতই রয়ে গেছে। ইকবাল এ ক্ষেত্রে বলেন যে, বস্তু পাপাত্মক নয়, বরঞ্চ শুভাত্মক। এ হলো কতকটা মানব দেহের মতো। খুদীর প্রখ্যাতি এবং মহত্ত্ব বস্তুর বিলোপ সাধন করে কিংবা মানব দেহমন্দিরকে ধ্বংস করে লভ্য হয় না, হয় পথের কঠিন প্রতিরোধাবলীকে জয় করে এবং প্রতিকূল শক্তিসমূহকে মানুষের কর্তৃত্বাধীনে আনয়ন করে। খুদী অথবা পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত খুদী কখনও পথ চলার বিপদে তা যতই শিলাসদৃশ কঠোর হোক না কেন কাতর হয় না, দুঃখ-দ্বন্দ্বের কাছে পরাজয়বরণ করে না। অপরপক্ষে, বিপদের সম্মুখে এ নিজের নবতর সৃজনীশক্তিকে কাজে নামায়।

বস্তু অথবা মানবদেহ পরিপূর্ণ খুদীর বিবর্তনে কখনও বাধার সৃষ্টি করে না। এরা হলো বিশ্বজগতে আত্মার আলোকায়নের স্থায়ী উৎস। খুদী প্রতিরোধ জয় করে করে যতই অগ্রসর হয়, ততই সে নিজ ইচ্ছা বা পসন্দ অর্জনের স্বাধীনতা এবং সেভাবে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের নিকটবর্তী হয়। এসব কিছু নির্ভর করে আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কঠোর শ্রমের ওপর।

ইকবাল কি স্বাধীনতা সম্পর্কে মুতাযিলাদের মনোভাব গ্রহণ করে ছিলেন? না, খুদীর নিজ পছন্দ অনুযায়ী পন্থা অবলম্বনের স্বাধীনতা রয়েছে; এবং যখন এ পরিপূর্ণতার নিকটবর্তী হয়, তখন তার পসন্দ করবার ক্ষমতা সামগ্রিক ও সার্বিক রূপ লাভ করে। জীবন প্রকৃত পক্ষে হলো নিজ ইচ্ছাশক্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম; আর খুদী এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এমন একটি অবস্থান অর্জন করতে চায় যেখানে তার ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ স্বাধীনতায় অধিষ্ঠিত। খুদীকে যা শক্তিশালী করে তা ভালো, এবং খুদীকে যা দুর্বল করে তা মন্দ। এ জন্যেই ইকবাল পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যব্যাপী এবং অতীত ও বর্তমানব্যাপী প্লাতো ও তাঁর অনুসারীদের মতবাদের বিরোধিতা করেন। ইকবাল স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, এই খুদী এবং এ সম্পর্কিত বিষয়ের-বৈজ্ঞানিক মনের গাণিতিক তথ্য এবং খুদীর জীবনতত্ত্বের মধ্যেকার বিরোধের দ্বারাই প্রভাবিত এবং আকারপ্রাপ্ত হয়েছে খৃষ্টীয় দর্শন।

ইসলামের সম্মুখে যে সমস্যা দেখা দেয় তা হলো ধর্ম এবং সংস্কৃতির মধ্যে বিরোধ। এমন কি, প্রাথমিক খৃষ্টধর্মেও এ সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এ একটি দ্বিধা-দ্বন্দ্বহীন আধ্যাত্মিক জীবনের অনুসন্ধান করেছিল বহির্জগতে নয়, বরং খুদীর অন্তর্দেশে একটি নতুন জগতের মধ্যে। ইকবাল অস্বীকার করেছেন যে, ইসলাম এ মতবাদবিরোধী। তিনি বলেন যে, ইসলাম অন্য একটি আলোকের অনুসারী যা এ নতুন জগতকে আলোকিত করে এবং যা বস্তু ধারণার প্রতি বিরূপ নয়। এ আলোক মুসলিম চিন্তাধারার অন্তর্নিহিত সত্যের সহায়তায় বস্তুজগতকে আলোকায়িত করে।

ইকবালের মতে, বিজ্ঞান নয়, প্রধানতঃ ধর্মই মানুষকে সত্যপথে চালিত করে চিরন্তন সত্যের দ্বারে পৌঁছিয়ে দিতে পারে। অবশ্য এই সত্য পথও নিজ মহিমা ও শক্তি অর্জন করে ধর্ম থেকে।

তিনি এ কথা বিশ্বাস করেন যে, আজকের মানুষ বিজ্ঞানের পথে বিপুল সাফল্য অর্জন করে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমান মানুষ বাস্তব প্রগতির স্রোতে ভেসে চলেছে; হৃদয়ের বাণী আর তার কানে পশছে না। বস্তুবাদের প্রভাবে মানুষের মানবীয় কর্মধারা রুদ্ধ হয়ে গেছে- প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়খন্ডেই। তাঁর মতে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্য হলো হৃদয়-নির্ভর; বাস্তবধর্মী মানুষ যে পর্যন্ত না নিজের অন্তর্লোকে দৃক্পাত করবে, সে পর্যন্ত প্রকৃত সত্য তার চোখে প্রতিভাত হবে না।

ইকবালের মতে, বিশ্ব প্রকৃতি বৃথাই সৃষ্ট হয়নি। এতে একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে; এবং এই পার্থিব জীবনেই সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হবে। মানব নিয়তির বিধান হলো এই যে, মানুষকে বিশ্বপ্রকৃতি পরিব্যাপ্ত এ উদ্দেশ্য সাধনের সংগ্রামে নিজ অংশগ্রহণ করতে হবে; মানুষ তার নিজ নিয়তি এবং বিশ্ব নিয়তিকে গড়ে তুলবার যোগ্যতা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে। প্রকৃত পক্ষে মানুষের এ যোগ্যতা রয়েছে যে, সে বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিসমূহের সাথে সংগ্রাম করতে পারে, অথবা সে সব শক্তিকে বশীভূত করে নিজের উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙক্ষা চরিতার্থ করবার পথে নিয়োজিত করতে পারে। ইকবাল বিশ্বাস করেন যে, খুদীর শ্রেষ্ঠতম স্পৃহা হলো কোনো কিছু (তার আদর্শ বস্তু) দেখা নয়, বরঞ্চ কোনো কিছু হওয়া। এই কোনো কিছু হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই খুদী খুঁজে পায় নিজের অন্তর্মুখিতা অর্জনের এবং পরিপূর্ণতা লাভের সুবর্ণ সুযোগ। খুদীর সত্যরূপ প্রতিফলিত হয়েছে দেকার্তে বর্ণিত 'আমি চিন্তা করি' বাক্যে নয়, বরঞ্চ কন্ট-কথিত 'আমি পারি' বা দু'জনেরই পূর্বে গাযালী কথিত 'আমি ইচ্ছা করি'-তে।

ইকবাল বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক মুসলিমই তার চূড়ান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ অবস্থিতির সংজ্ঞা দিতে পারে, নিজ খুদীকে পুনঃ নির্মাণ করতে পারে এবং নিজ সামাজিক জীবন পুনর্গঠন করতে পারে। ইসলামের নীতিসমূহ যা আজ পর্যন্ত মাত্র আংশিকভাবেই উপলব্ধ ও কার্যকর হয়েছে, অনুসরণ করে সে এমন একটি আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের উদ্ভাবন করতে পারে, যা ইসলামের চরমতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

তিউনিসিয়া

তিউনিসিয়া সউসে নগরীতে ইকবাল দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক ও ইসলামী দর্শনবিদ্ ডঃ আহমদ খালিদ বলেন-

পাকিস্তানের জাতীয় কবি চিন্তাবিদ মুহম্মদ ইকবালের মৃত্যুদিবস উপলক্ষে বক্তৃতা দিতে আহূত হয়ে আমি পাকিস্তান দূতাবাসের কাছে সত্যই কৃতজ্ঞ বোধ করছি। কবিকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি; বলতে কি, আমার হৃদয়-মন তাঁর প্রীতি মমতায় কানায় কানায় পূর্ণ। আজকে আমি তাঁর গতিশীলতা নীতি ও খুদী দর্শন সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়াস পাব।

ইকবাল যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন পাক-ভারত উপমহাদেশ-ব্যাপী চরমতম তিমিরাচ্ছন্ন যুগ চলছে। ছয়শো বৎসর রাজত্ব করবার পর মুসলমানগণ বহিরাগত ইংরেজ জাতির হাতে পরাজয়বরণ করেছে এবং এ-ই প্রথমবারের মতো পরাধীনতার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। রাজনৈতিক শক্তি হারাবার সাথে সাথে তারা সবকিছু হারিয়েছে; তাদের ভাষা এবং তাদের আইন-কানুন পরিত্যক্ত হয়েছে। উপমহাদেশে তাদের এ অধোগতি একেলা আসলো না; সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য অঞ্চলেও তারা রাজশক্তি হারালো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ পতনের চেয়ে বড় অধঃপতন তাদের দেখা দিলো নৈতিক ক্ষেত্রে। তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির শাশ্বত মূল্যবোধের প্রতি তারা বিমুখ হয়ে পড়লো। তারা ভুলে গেলো যে, জীবন একটা বিকাশমান কর্মকেন্দ্র, আর তাদের যা সমস্যা তার সমাধান শুধু অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকলেই হবে না। তাদের নিজ ধর্মের গতিশীলতার প্রেরণা হারিয়ে তারা নিদারুণ আলস্য ও অজ্ঞতার অন্ধকারে ডুবে গেলো। এহেন অধোগতি ও অসহায়তার মধ্যে যখন তারা পাশ্চাত্যের উন্নততর সভ্যতার সংস্পর্শে এলো, তখন তার বাহ্যিক ঔজ্জ্বল্য দেখে তারা হতবুদ্ধি না হয়ে পারলো না। এটা ছিল আধুনিক যুগের প্রারম্ভিককালের অবস্থা।

যা হোক, মুসলিম সম্প্রদায় এরপর ধীরে ধীরে জেগে উঠলো এবং এই নতুন সভ্যতার অগ্রগতির সাথে গা মিলিয়ে চলবার সিদ্ধান্ত ও প্রয়াস গ্রহণ করলো।

বিশ্ব ইসলামের ক্ষেত্রে জামালুদ্দিন আফগানী এবং তাঁর শিষ্যমন্ডলী মুহম্মদ আবদুহু, রশীদ রিযা, কাওকাবী এবং ইবনে বাদিস প্রমুখ মনীষী কালধর্মের এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং নৈতিক ও ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন উদ্দেশ্য করে সংস্কার আন্দোলন আরব্ধ করলেন। তাঁরা চাইলেন, অতীতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করে ইসলামকে আধুনিক চিন্তাধারার আলোকে

ব্যাখ্যায়ন ও প্রতিষ্ঠিত করতে। এভাবে তাঁরা প্রয়াস পেলেন ইসলামের সাথে কালে কালে যে-সব অ-ইসলামী ভাবের সংযোগ ঘটেছে- সেগুলো থেকে নিজেদের ধর্মকে মুক্ত করতে।

ইতোপূর্বে হেনরী ল্যামেন্স লর্ড ক্রোমার, রেনান প্রমুখ উগ্রপন্থী ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্ ও মুসলিম বিদ্বেষী সমাজতাত্ত্বিকে দাবী করছিলেন যে, ইসলাম ধর্ম হলো প্রগতিবিরোধী এবং এর অনুসারীদের উন্নতির পথে অন্তরায় স্বরূপ। এখন এই মুসলিম সংস্কারকেরা নিজেদের ধর্মের বিরুদ্ধে এসব হাস্যকর কুৎসা রটনার প্রতিবাদে প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন। অনেক কবি-লেখকও এ কার্যে সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন। মারূফ আর রস্ফী বলেন ঃ

> ইসলাম ধর্ম তার অনুসারীদের উন্নতির পথে বাধা দেয় বলে যে ধারণা রয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তা যদি সত্যি হতো তবে প্রাথমিক যুগের মুসলমানেরা কি করে এতখানি উন্নতি করলেন? এ যুগের মুসলমানেরা অজ্ঞতায় নিমজ্জিত রয়েছে সত্য; কিন্তু তার জন্যে ইসলাম ধর্মকে কি করে দায়ী করা যায়? ইসলাম সকলের জন্যে বিদ্যার্জন বাধ্যতামূলক করেছে। বিদ্যার্জন ছাড়া কোনো জাতি কি উন্নতি করতে পারে? ইউরোপীয়রা যখন এ-সবের কিছুই জানতো না, তখন ইসলাম মানুষকে জাগরণের বাণী শুনিয়েছে এবং তাদের অন্তর্দৃষ্টিকে প্রাখর্য দান করেছে।
>
> ...... যারা আজ তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে আমাদের উপর উৎপীড়ন চালাচ্ছে, তাদেরকে তাদের এ পাপকর্ম সম্বন্ধে বলে দাও, বুঝিয়ে দাও। তোমরা যখন নিম্নস্তরে ছিলে তখন আমরা উন্নত ছিলাম; কিন্তু তখন আমরা তোমাদের সাথে এমন নীচ ব্যবহার করিনি। গভীর মতদ্বৈততা থাকা সত্ত্বেও, আমাদের নৈতিক কর্তব্যে আমরা কখনও অবহেলা করিনি; কেননা, তাই হলো একমাত্র ভদ্রজন সুলভ পন্থা। কিন্তু সৌভাগ্য যখন পক্ষ পরিবর্তন করলো, আর তোমরা উপরে উঠে গেলে, তখন আমাদের প্রতি তোমাদের ব্যবহার দেখা দিলো অতি লজ্জাষ্করূপে। অবশ্য মনে করো না যে, নির্বিবাদে তোমরা এ সুযোগ উপভোগ করে যাবে; সময়ের পরিবর্তন আগেও হয়েছে, আবার হচ্ছে।....

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতেও কয়েকটি সংস্কার আন্দোলন আরব্ধ হয়। এখানকার সংস্কারকেরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, মুসলমানদের অধোগতির কারণ হলো সত্যিকার বিশ্বাসের অভাব, যে জন্যে তারা বাস্তবের ওপর থেকে কর্তৃত্ব হারিয়েছে। এঁরা মুসলিম সম্প্রদায়কে কুরআনের দিকে ফিরে আসবার উপদেশ দিলেন। সময়ের ভাবধারা অনুসরণ করে তাঁরা অবশ্যই উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট হলেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান (জন্ম ঃ দিল্লী, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ) বুঝতে পারলেন যে, এ উপমহাদেশের মুসলমানেরা অজ্ঞতা ও অতীতের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের শিকার হয়েছে; এখন তাদের উন্নতির একমাত্র উপায় হলো শিক্ষার আলোক বিতরণ। অতএব তাঁর সংস্কার কার্যাবলী রূপ নিলো মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও তাদের নৈতিক চরিত্র শুদ্ধিকে কেন্দ্র করে। ১৮৭৭ সালে তিনি আলীগড় অ্যাংলো মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন, যা অল্পকালের মধ্যেই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হলো। তাঁর এই মহৎ উদাহরণ

অনুসরণ করে উপমহাদেশের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখা দিতে লাগলো। অবশেষে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলো।

একটি নতুন সমাজ গঠনের বেলায় মানুষের নৈতিক পুনরুজ্জীবনের গুরুত্ব কি তা স্যার সৈয়দ আহমদ খান সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর পত্রিকা তহযীব উল আখলাক-এর অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এ পত্রিকা মুসলিম জনসাধারণকে নিজেদের অবস্থা পুনর্বিবেচনা করে দেখতে এবং স্বাধীন ও সমালোচনামূলক আত্মজিজ্ঞাসায় আত্মনিয়োগ করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রেও নতুন রূপকার সৃষ্টিতে এর অবদান ছিল বিশিষ্ট। এ পত্রিকার কৃতকার্যতা সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সে-কালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের প্রায় সকলেই এর নিয়মিত লেখক ছিলেন।

সৈয়দ আহমদ খানের আন্দোলন তাঁর পরে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তির সহযোগিতা লাভ করে। এদের মধ্যে সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন অন্যতম। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম* (ইসলামের মর্মবাণী) ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা ও মিথ্যা অভিযোগাবলীর এক অত্যন্ত চমৎকার প্রত্যুত্তরবিশেষ। কিন্তু এ সংস্কারক দলের শ্রেষ্ঠতম ছিলেন ইকবাল। তিনি তাঁর অতুলনীয় মর্মভেদী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ইসলাম ও মুসলিম জাতির অতীত ইতিহাস অধ্যয়ন করলেন এবং তার ফলে কতকগুলো সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের অধঃপতন তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল; তিনি চাইলেন কালবিলম্ব না করে তাদেরকে জাগিয়ে তুলতে এবং অতীতের চেয়ে মহানতর গৌরবে উন্নীত করতে। আজকে আমরা তাঁর সপ্তবিংশতিতম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্যে সমবেত হয়েছি। কেননা, তিনি লোকান্তর গমন করেন ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে।

তাঁর পরিণত চিন্তাধারা তাঁর ইংরেজী ভাষায় লিখিত *দ্য রিকনস-ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম* (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন) গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। এ বই হলো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর সাতটি বক্তৃতার সমাহার। এতে তিনি চেয়েছেন দার্শনিক ভিত্তিভূমি থেকে ইসলাম ধর্মের পুনর্ব্যাখ্যা দিতে।

ইকবালের মতে, মুসলিম সম্প্রদায়ের অবনতির মূল কারণ হলো দু'টি ঃ

(১) প্রকৃতিকে আয়ত্তে আনতে এবং বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে অবহেলা এবং

(২) আধ্যাত্মিক বীর্য ও পুনরুজ্জীবনের অভাব।

তাঁর মতে, এই দুই দোষের গোড়ায় রয়েছে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে ইসলামের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা।

তাঁর কথায় ঃ গ্রীক দর্শন মুসলিম চিন্তানায়কদের মননসীমা অনেকখানি প্রসারিত করেছিল সত্য; কিন্তু মোটের ওপর তা কুরআনের মর্মের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি অনেকখানি ঝাপসা করে তুলেছিল। এ কারণে ইকবাল চেয়েছিলেন কুরআন ব্যাখ্যায়নে ভিন্ন একটি দর্শন-পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করতে যাতে ইসলামের সত্যিকার মূলনীতি থেকে এর বিচ্যুতি না ঘটতে পারে। এভাবে তিনি ধর্ম ও দর্শনের মধ্যেও একটা বোঝাপড়ায় আসবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

মুসলিম সংস্কৃতির মর্মকথা শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, পুরাতন দর্শন ছিল কুরআনের প্রকৃত শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরোধী। আত্মার অবিসম্বাদিত অস্তিত্ব ঘোষণা করেও ইসলাম বস্তুজগতের যথার্থকে কখনও অস্বীকার করেনি। কুরআনে উক্ত হয়েছে ঃ

> গগনরাজি, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা রয়েছে তার কিছুই আমরা ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। নিশ্চয়ই আমরা কোনো না কোনা বিশিষ্ট উদ্দেশ্য ব্যতীত এগুলো সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের (মানুষের) বেশীর ভাগই তা বোঝে না (৪৪ ঃ ৩৮)।

এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ইসলাম বস্তুজগতকে সত্য বলে মনে করে এবং কি করে তাকে আয়ত্ত ও বশীভূত করতে হবে তা শিক্ষা দেয়। কুরআনে আরও ঘোষিত হয়েছে ঃ

> তিনি রাত্রি ও দিবা, সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের আজ্ঞাধীন করেছেন; এমন কি তারকারাজি পর্যন্ত তাঁর নির্দেশে তোমাদের আজ্ঞাবহরূপে অস্তিত্বশীল। নিশ্চয়ই যারা জ্ঞানবান, তাদের জন্যে এতে ইঙ্গিতসমূহ রয়েছে (১৬ ঃ ১২)।

এহেন সুস্পষ্ট সির্দেশ সত্ত্বেও যে– সব মুসলিম চিন্তাশীল ব্যক্তি গ্রীকদের অনুসরণে ইসলামের বাণী বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তাঁরা এ ধর্মের সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারেন নি, বলতে হবে।

গ্রীক দর্শনের সব চিন্তা-ভাবনা হলো বিমূর্ত (Abstract)-কে নিয়ে, মূর্ত বাস্তবকে তা পুরোপুরি অস্বীকার করে। সাধারণভাবে গ্রীক দর্শনের পিতা বলে খ্যাত সক্রেটিস কেবলমাত্র মানুষকেই বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে সত্যিকারের জ্ঞান নিজেকে চেনার মধ্যেই সবটা নিহিত ছিল; বৃক্ষ লতা, গ্রহ, তারকারাজি এবং জীবজগতপূর্ণ বহির্বিশ্বের কোনো মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। প্লাতোও তাঁর গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে গেছেন। তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়ানুভূতি ছিল নিরর্থক; কেননা এ থেকে শুধুমাত্র মতামতই লভ্য বটে, সত্য নয়। বস্তুর জগত এবং ধারণার জগতের মধ্যকার পার্থক্য দেখিয়ে তিনি বলেছেন যে, সত্য শিব সুন্দর হলো ধারণার জগতের ব্যাপার। তাঁর রিপাবলিক গ্রন্থের সপ্তম পুস্তকে বিবৃত গুহা সংক্রান্ত প্রসিদ্ধ অতিকথনে তিনি বস্তুজগতকে দেখিয়েছেন ছায়া এবং ভ্রান্তিরূপে।

নবপ্লাতনীয় মতবাদভিত্তিক নির্গমীয় দর্শন বাস্তবের চেয়ে কবি কল্পনাকেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছে। এতে পরম সত্যকে কল্পনা করা হয়েছে স্থিতিশীলরূপে, দর্শন ও শরীআর মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছে বিপুল ব্যবধান এবং চিন্তা ও অনুসন্ধানের দ্বারে সৃষ্টি করা হয়েছে অবরোধ। এ কথা অবশ্য সত্য যে, এ চিন্তাধারার অনুসারীদের নেতা আল্‌ফারাবী নবপ্লাতনীয় নির্গমনতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে নবূয়ত, নির্গমন পর্যায়ক্রমে বিশ্বসৃষ্টি এবং দশ প্রজ্ঞান ইত্যাদি ধারণার ইসলামী ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে-সব প্রচেষ্টার অবধারিত পরিণতি ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যা হোক, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এ দর্শন প্রথমদিকে ইসলামী চিন্তাধারার বিকাশে সহায়তা করেছিল; এবং আরও আশা করা হয়েছিল যে, এভাবে ইসলামী দর্শনের অধিকতর উন্নয়ন সম্ভব হবে। কিন্তু এর মধ্যে গাযালীর আবির্ভাব প্রগতির মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিলো। গাযালী দৃঢ়কণ্ঠে এ দর্শনকে উদ্ভট ও নিরর্থক বলে ঘোষণা করলেন। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বললেন যে, যুক্তি কখনও অবতীর্ণ বাণীর স্থান গ্রহণ করতে পারে না;

দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। ইবনে রুশদের 'খন্ডনের খন্ডন'-ই সম্ভবত মুসলিম চিন্তাধারার ইতিহাসে মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদীদের পক্ষ থেকে শেষ প্রচেষ্টা ছিল; কিন্তু তা একেবারেই নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। ইকবালের প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যও ছিল গাযালীর সাথে অভিন্ন। তিনি চাইলেন ইসলামী চিন্তাধারায় গতিশীলতা ও উদ্যমের পুনরুজ্জীবন করতে। (ইবনে তাইমিয়া-ও সপ্তম হিজরী (চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে)-তে এই একই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইকবাল বললেন যে, মানুষ স্বভাবতই একটি সৃষ্টিধর্মী ও বিকাশমান শক্তি স্বরূপ, যা অবস্থা থেকে অবস্থান্তরে এগিয়ে চলবে; আর বিশ্বপ্রকৃতি একটি স্থিতিশীল বা রুদ্ধদ্বার গৃহ নয়। ঐশী বৈশিষ্ট্যকে প্রতিভাত করবার জন্যে এ নতুন নতুনরূপে আবির্ভূত হচ্ছে।

এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই ইকবাল প্রাচীন দর্শন শাস্ত্রের এ বিশেষ অধ্যায়ের পুনর্বিবেচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি ইসলামের অপরিহার্য শর্ত ইজতিহাদের রুদ্ধদ্বারে আঘাত দিয়ে তাকে আবার কার্যকর করতে সিদ্ধান্ত নিলেন। উপরিউক্ত ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন গ্রন্থের 'ইসলামী কাঠামোতে গতিশীলতার নীতি' শীর্ষক বক্তৃতায় তিনি ইসলাম ধর্মকে এমন একটি জীবন্ত ও সৃষ্টিধর্মী শক্তি বলে প্রতিপন্ন করবার প্রয়াস পেয়েছেন, যা জীবনের সর্বক্ষণ পরিবর্তনশীল এবং বিকাশমান শক্তিসমূহের সাথে পা মিলিয়ে চলতে থাকে। 'ক্রিয়েটিভ ইভল্যুশন' প্রণেতা অ্যারি বের্গসঁ-র চিন্তাধারার সাথে এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রচুর সাদৃশ্য রয়েছে। সেই একই বক্তৃতায় ইকবাল বলেছেন যে ঃ

> যেহেতু কুরআন অনুসারে বিশ্বপ্রকৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল, অতএব ইসলামের আইন-পদ্ধতি বিবর্তনমূলক বিকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু এই বিবর্তন একেবারে সামগ্রিক ও বল্গাহীন পরিবর্তনের রূপ নিতে পারে না; কেননা, জীবন নিজ অতীতের ভার পৃষ্ঠে নিয়েই এগিয়ে চলে' (পৃঃ ১৬৭)।

এখানেই আমরা ইকবালের ওপর বের্গসঁ'র প্রভাব প্রত্যক্ষ করি। বের্গসঁ মনে করেন যে, পার্থিব সম্পর্ক সত্য-ভিত্তিক এবং মৌলিক; অতএব আমাদের বর্তমানকাল অতীতের বোঝা কাঁধে নিয়েই ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। উইলিয়াম জেম্‌স্‌ও মনে করেন যে, চেতনা হচ্ছে একটা নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ; একে বিভক্ত করা বা এর মধ্যে কোনো ছেদরেখা টানা সম্ভব নয়। বের্গসঁ'র মতে, অতীত হলো একটি অনস্বীকার্য সত্য, যা বর্তমানের মধ্য দিয়ে অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে ধাওয়া করে। কিন্তু বর্তমানকে আমরা যেভাবেই বুঝতে চেষ্টা করি না কেন তা হলো একেবারেই গতিহীন।

–এর অর্থ হলো ঃ সব নতুন পরিবর্তন ও বিবর্তনের মূলে রয়েছে পুরাতন এবং অতীত; কেননা, মানুষের ঐতিহাসিক অস্তিত্ব পরম্পরার জন্যে এর প্রয়োজন রয়েছে। এখানে ইকবাল বের্গসঁ ও হেগেলের সাথে একমত হয়েছেন।

যে-সব নেতিবাচক ধারণা পরিবর্তন ও বিবর্তন, বিবর্তনের সম্ভাবনা অস্বীকার করেছে, ইকবাল সে-সবের বিরোধী। তিনি অতি গভীরভাবে রূমীর দ্বারা প্রভাবিত। ইরানীয় অ-ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সূফিবাদকে তিনি মুসলমানদের অবনতির অন্যতম কারণ বলে মনে করতেন। সূফিবাদ প্রচার করেছিল কর্মবিমুখ, (ঐশী প্রেমে) মত্ততা, আত্মবিসর্জন, আত্মবিলোপন, দেহ ও মনের মধ্যে পার্থক্য, বস্তু ও আত্মার মধ্যে পার্থক্য এবং শেষ

পর্যন্ত, দেহ ও বস্তুকে অসৎ বলে কল্পনা করতে। এই অ-ইসলামী মরমীবাদ মুসলিম জগতে সর্বত্র প্রসার লাভ করেছিল; এবং এর কুফল অন্যান্য স্থানের ন্যায় পাক-ভারত উপমহাদেশেও অনুভূত হচ্ছিল। 'আসরার-ই-খুদী'র (উর্দু) ভূমিকায় ইকবাল এ বিষয় নিয়ে অনেকখানি খোলাসাভাবে আলোচনা করেছেন।

সর্বেশ্বরবাদ সবকিছুকেই ঈশ্বরের মধ্যে বিলোপ করে দেবার শিক্ষা দেয়; বিশেষ ক্ষেত্রে এর শিক্ষা হলো সবকিছুর মধ্যে সবকিছুর বিলুপ্তি। এ থেকে ইসলামী মূল্যমানসমূহেরও একটা অপব্যাখ্যার সূচনা হয়– যাতে বিশ্বজগতের একটা স্থিতিশীল ও নিষ্কর্ম ছবি মুসলমান চিন্তাবিদ্‌দের সম্মুখে দেখা দেয়। এর পরিণতি হলো মানব জীবনকে একটি মৃত কর্দমের পিন্ড মনে করা। এই অবস্থা থেকে ইকবালের গতিধর্মী কর্মপ্রবণতার বাণী উৎসারিত হয়। সূফীদের নিষ্ক্রিয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি নিরঙ্কুশ ও সর্বব্যাপী কর্মকেই ব্যক্তি জীবনের প্রকৃত অবলম্বন বলে প্রচার করলেন। তাঁর বইগুলো তিনি এ বাণী অতিশয় দৃঢ়তার সাথে প্রচার করেছেন যে, জীবনে অনবরত প্রচেষ্টার ও নিরন্তর সংগ্রামের ফলে লভ্য হয় শক্তিমান মানব ব্যক্তিত্ব এবং এর সাথে যথাযথ শিক্ষার সংযোগে দেখা দেয় পরিপূর্ণ মানব (ইন্‌সান-ই-কামিল)-এর প্রতি একাত্মতা।

ইকবাল তাঁর আসরার-ই-খুদীর উপক্রমণিকায় খুদীর প্রকৃতি ও সত্যতার প্রশ্ন তুলেছেন। অনুভূতির এই একত্বটি কী যা তার কার্যের মাধ্যমে দৃষ্ট, অথচ প্রকৃতিতে অদৃশ্য? এ কি সত্যিই বাস্তব, না মায়া? এসব প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছেন, কেননা, তাঁর মতে, এগুলোর যথাযথ উত্তরের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তি মানুষের এবং মানব সম্প্রদায়ের চরিত্র এবং চরম নিয়তি। মানুষ অনবরত পরিবর্তনশীল এবং তার মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাবলী নিরন্তর প্রবহমান; কিন্তু এই অনুভূতিকেন্দ্রই তার সব পরিবর্তনের মধ্যে আনে যোগসূত্র এবং শৃঙ্খলা আর তার অতীতকে সম্পর্কিত করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাথে।

'মানবীয় খুদী তার স্বাধীনতা ও অমরত্ব' শীর্ষক তাঁর চতুর্থ বক্তৃতায় ইকবাল খুদীর আর একটা বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, প্রত্যেকটি খুদী এক একটি একক। আমার অনুভূতি, আমার ঘৃণা ও ভালোবাসা, বিচার ও মনোভঙ্গি একান্তভাবে আমার নিজস্ব। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে ইবনে সীনা (মৃত্যু ঃ ৪২৮ হিঃ ১০৩৭ খৃঃ)-এর কথা। তিনি এই যুক্তি অর্থাৎ বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক আবার বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্ব সূত্রে খুদীর এবং ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার ধারাবাহিক অস্তিত্বের প্রমাণ করেছেন।

এই অহং বা আমির প্রকৃতি বিচার করতে গিয়ে ইকবাল ইসলামী পান্ডিত্যের পুরোধারূপে গাযালীর, এবং কান্ট, লায়ার্ড, উইলিয়ম জেম্‌স প্রমুখ আধুনিক চিন্তানেতাদের ধারণাবলীর সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা করে দেখেন। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে, আমার প্রকৃত ব্যক্তির একটি বস্তু নয়, বরঞ্চ একটি কর্ম। আমার অনুভূতি হলো মাত্র এমন কতকগুলো কর্ম-পরম্পরা যা একে অপরে সম্পর্কিত এবং একটি নির্দেশমূলক উদ্দেশ্যের একত্বে পরস্পরে গ্রথিত।

আসরার-ই-খুদীতেও ইকবাল খুদীর প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি মানব অহং সম্পর্কে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রাচ্যে সাধারণত বিশ্বাস করা হয় যে, খুদী বা অহং একটি ভ্রান্তি; একে অস্বীকার করার

মধ্যেই রয়েছে মুক্তি। তিনি বলেন যে, হিন্দু চিন্তা-নেতারা অহং-কে অবিরাম কর্মশীলতার সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখে গভীর দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু যুক্তিসূত্রে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ব্যক্তিকে এর পরিপূর্ণ বিলুপ্তির জন্যে চেষ্টা করতে হবে; কেননা, তাছাড়া মানুষ কর্মের পাপাত্মক পরিণতি থেকে রেহাই পেতে পারে না। ইকবাল বলেছেন যে, এ মতবাদ মানব ব্যক্তিত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তিনি আরও বলেছেন যে, এই শিক্ষা ইসলামের মর্মবাণীরও সম্পূর্ণ বিরোধী; কেননা, ইসলাম জোর দেয় কর্মময় জীবন যাপনের ওপর। অবশ্য ইসলাম অনুসারেও মানব অহং সৃষ্ট বস্তু; কিন্তু তবুও বিরামহীন কর্মতৎপরতা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা দ্বারা তা অমরত্ব অর্জন করতে পারে। ইকবালের এ চিন্তা তাঁর প্রায় প্রতিটি গ্রন্থেই স্থান পেয়েছে। রিকন্সট্রাক্‌শন (পৃঃ ১১৯) থেকে অল্পখানিক উদ্ধৃতি দেওয়া যায় ঃ

> আত্মাকে কিভাবে বিকশিত করা যায় এবং কালিমামুক্ত রাখা যায়? কর্মের দ্বারা ঃ
>
> "ধন্য তিনি, যাঁর হাতে রয়েছে রাজত্ব! তিনি সব কিছুরই ওপর শক্তিমান। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু এবং জীবন যাতে পরীক্ষিত হয় কর্মবিচারে তোমাদের মধ্যে কে উত্তম। এবং তিনি শক্তিধর ও ক্ষমাশীল।" (কুরআন-৬৭-২)

নিঃসন্দেহে ইকবালের দর্শন হচ্ছে গতিপ্রবণ এবং তার কেন্দ্র হলো অবিরাম প্রচেষ্টা ও অনবরত সংগ্রাম। ডঃ আবদুল ওয়াহহাব আযযাম বেও তাঁর আরবী গ্রন্থে *মুহম্মদ ইকবাল তাঁর জীবন, দর্শন ও কাব্য* এই একই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বিশেষ করে, তাঁর দুইটি প্রসিদ্ধ বই *আসরার-ই-খুদী* এবং *রুমুয-ই-বেখুদীতে* এ মতবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। অবশ্য দর্শন চিন্তার সাথে সাথে কাব্য-সম্পদেও এ বইগুলো অসাধারণ। *আসরার-ই-খুদীর* উপক্রমণিকায় ইকবাল খুদী কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ শব্দটি উর্দুতে সাধারণত ব্যবহৃত হয় স্বার্থপরতা অর্থে। কিন্তু ইকবাল এটিকে ব্যবহার করেছেন আত্মচৈতন্য, আত্মপ্রতীতি, আত্মউপলব্ধি অর্থে। এভাবে বেখুদী কথাটির অর্থও তিনি করেছেন সামগ্রিক ব্যক্তি-চৈতন্য, সামগ্রিক সমাজ জীবনের সাথে ব্যক্তির সজ্ঞান একাত্মবোধ বলে। ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য হলো নিজ খুদীকে এমনভাবে শিক্ষিত ও পরিশীলিত করে তোলা, যাতে মানুষ হিসেবে তার যে-সব স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে বা থাকা উচিত, সে-সব বৃত্তি যথাযথরূপে বিকাশ লাভ করে। তাঁর ভাষায়, গঙ্গাকে সম্বোধন করে হিমালয় বলছে ঃ

> বেঁচে থাকার অর্থ হলো তোমার নিজের মধ্যে বিকশিত
> হওয়া –তোমার নিজের বাগিচা থেকে ফুল কুড়ানো।

ইকবাল সুফীদের সমালোচনা করেছেন তাঁদের আত্মবিলোপন মতবাদ এবং পানোন্মত্ততা ও সর্বেশ্বরবাদ প্রশস্তির জন্যে। তাঁর মতে, এ ধরনের মরমীবাদ সম্পূর্ণ ইসলামবিরোধী। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন যে, এ আত্ম-অস্বীকৃতিমূলক মতবাদের উদ্ভাবন হয়েছে ক্ষয়িষ্ণু সম্প্রদায়সমূহ দ্বারা। একথা বোঝাবার জন্যে তিনি একটি কাহিনীর অবতারণা করেছেন ঃ

> মেষ দলের বসবাস স্থান এক অরণ্যে একপাল হিংস্র সিংহ এসে দেখা দিলো এবং মেষ সংহারে লেগে গেলো। এই অতর্কিত বিপদ থেকে দলকে রক্ষা করবার জন্যে

একটি চতুর মেষ এক ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করলো। সে নিজেকে সিংহ সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত একজন নবী বলে ঘোষণা করে তাদের কাছে আত্মবিলোপন মাহাত্ম্য প্রচার করতে লাগলো। সিংহেরা তার বাক্‌চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে সে শিক্ষা গ্রহণ করলো। ফলে, ইকবালের ভাষায় ঃ

কঠোর সংগ্রামের কাজে সিংহ সম্প্রদায়ে দেখা দিলো ক্লান্তির ভাব,
তাদের মনপ্রাণ চাইলো বিলাসিতার আরাম।
সুনিদ্রার পরামর্শ হলো তাদের মনঃপুত,
বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে তারা মেষবরের যাদুতে মোহিত হয়ে গেলো।
সিংহগোষ্ঠি জীবন ধারণ করতে লাগলো তৃণপত্র আহার করে;
অবশেষে তাদের সিংহসুলভ প্রকৃতি ভেঙ্গে পড়লো।
এই খাদ্যের গুণে তাদের দাঁত ভোঁতা হয়ে গেলো।
নিভে গেলো তাদের দৃষ্টির ভয়ঙ্কর দীপ্তি।
ধীরে ধীরে বিদায় নিলো তাদের হৃদয় থেকে শৌর্য-বীর্য।
তাদের দর্পণের ঔজ্জ্বল্য হলো তিরোহিত।
উদ্যম এবং সংগ্রামী স্পৃহা আর নেই;
তাদের হৃদয়াশ্রিত কর্মতৎপরতা আর উঁকি দেয় না।
তারা হারিয়ে ফেললো শাসন ক্ষমতা,
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাদের হলো লুপ্ত।
তারা হারালো সুখ্যাতি, মর্যাদা ও সৌভাগ্য;
তাদের লৌহ সদৃশ থাবা শিথিল হয়ে গেলো;
তাদের আত্মা হলো জীবন স্পন্দন বিরহিত, দেহ হলো তার কবর।
তাদের দৈহিক শক্তি দিনে দিনে অন্তর্হিত হয়ে গেলো
আর আত্মা দিন দিন ভয়াতুর হতে লাগলো,
আধ্যাত্মিক ভীরুতা বিলুপ্ত করে দিচ্ছিলো তাদের সব সাহসিকতা।
ভীরুতা ডেকে আনলো সহস্র রোগ শোক,
দারিদ্র্য, নীচতা এবং সংকীর্ণতা
জাগন্ত সিংহ দল ঝিমাতে লাগলো মেষবরের যাদু প্রভাবে,
এ অবনতিকে তাদের গরুবর নাম দিলেন 'নৈতিকতা ও সংস্কৃতি'।

এ কাহিনীর তাৎপর্য সংশয়াতীত। এ বিশ্বে পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ জীবন নির্ভর করে খুদীর যথাযথ বিকাশের দ্বারা, তার অস্বীকৃতি দ্বারা নয়। ইকবাল মনে করেন যে ,এ পৃথিবীর সব কিছু গাছপালা, জন্তু-জানোয়ার ও মানুষ সকলেরই আত্মচেতনা রয়েছে এবং তা বিশ্বজীবনে নিজের যথাযথ স্থান অধিকার করে আছে, আর নিজের কানুন অনুসারেই বিকাশ লাভ করে। ইবনে মসকাওয়াইহ্ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন ঃ

নিম্নতম স্তরের উদ্ভিদ জীবনে তাদের জন্ম বিকাশের কাছে বীজের প্রয়োজন হয় না। তাদের বংশরক্ষার জন্যেও বীজের দরকার নেই। খনিজ জীবন থেকে এ শ্রেণীর উদ্ভিদ জীবনের পার্থক্য এই যে, এরা সামান্যরকম নড়াচড়া করতে পারে। উন্নততর স্তরে এই নড়াচড়া গুণ বাড়তে থাকে এবং এরা ডাল-পালা ছড়িয়ে দেয়, আর অবশেষে বীজের মাধ্যমে বংশরক্ষা করে। এ গুণের আরও উৎকর্ষের ফলে আমরা দেখতে পাই কান্ড, পত্র এবং ফল সমন্বিত পরিপূর্ণ বৃক্ষ। বিবর্তনের আরও উচ্চতর স্তরে দেখা দেয় এমন সব বৃক্ষ যাদের বিকাশের জন্যে চাই উত্তম মাটি ও যথাযোগ্য আবহাওয়া বিকাশের শেষ স্তরে দেখা দেয় দ্রাক্ষালতা, খর্জুর বৃক্ষ ইত্যাদি শ্রেণীর উদ্ভিদ। এগুলো বলতে গেলে প্রায় প্রাণী জগতের প্রান্তদেশে এসে উপস্থিত হয়েছে। খর্জুর বৃক্ষের বেলায় একটা স্পষ্ট যৌন লক্ষণ দেখা দেয়। শিকড় এবং আঁশ ছাড়াও এ বৃক্ষে এমন একটি বস্তু জন্মায়, যা প্রাণী জগতের মস্তিষ্কের মতো কাজ করে; এ বস্তুটির পুষ্টির উপরই নির্ভর করে বৃক্ষের জীবন যাত্রা। এটিই হলো উদ্ভিদ জীবনের উন্নততম স্তর এবং প্রাণী জীবনের উপক্রমণিকা। প্রাণী জীবনের দিকে প্রাথমিক পদক্ষেপ সূচিত হয় ধরিত্রী বন্ধন থেকে মুক্তিতে, যা হলো সজ্ঞান স্থান পরিবর্তন ক্ষমতার বীজ স্বরূপ। এটি হলো প্রাণী জীবনের প্রাথমিক স্তর। এ স্তরে সর্বপ্রথমে দেখা দেয় স্পর্শশক্তি এবং সর্বশেষে দৃষ্টিশক্তি। ইন্দ্রিয়াদির বিকাশের সাথে সাথে প্রাণীরা স্বাধীনতা লাভ করে ঘুরে বেড়াবার, যেমন দেখা যায় কীট সরিসৃপ, পিপিলিকা ও মক্ষিকার মধ্যে। এভাবে পশুত্বের উন্নততর বিকাশরূপে দেখা দেয় ঘোটকজাতি এবং পক্ষিত্বের বেলায় বাজজাতি। শেষ পরিণতিতে মানবত্বের দরজায় এসে দেখা দেয় বানরজাতি- বিশেষ করে, লাঙুলহীন বানরজাতি যেমন, গরিলাগোষ্ঠি। এরা বিবর্তনের স্তরে মানুষের চেয়ে শুধুমাত্র একধাপ নিচুতে। এর পরের বিবর্তনের স্তরসমূহে মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনাদি আরব্ধ হয়, যার ফলে মানুষের মধ্যে ভালমন্দ বুঝবার জ্ঞান, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা জন্মলাভ করে এবং মানুষ বর্বরতা থেকে সভ্যতার পথে এগিয়ে যায়। (রিকন্স্ট্রাক্শন ঃ ১৩৪ পৃঃ)

এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, বিবর্তনক্রিয়া যে বিশ্বভিত্তিক, সে বিষয়ে ইকবাল খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর মুসলিম চিন্তা-নেতা ইব্নে মস্কাওয়াইহ্-র সাথে একমত। বাস্তব জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক দিয়েই মানুষ হলো জীবন-সংস্থার একটি একক কেন্দ্রস্থল। কিন্তু তবুও সে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বা ইন্সান-ই-কামিল-এর আদর্শ থেকে এখনও অনেক দূরে রয়েছে। এই ইন্সান-ই-কামিল-ই হলেন আল্লাহর নিকটতম স্তর যা সৃষ্ট জীবের জন্যে সম্ভব। এ ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইকবালের ধারণায় আল্লাহ্র এই অতি নৈকট্য সূফীদের সর্বেশ্বরবাদমূলক নয় অর্থাৎ, এ আল্লাহ্তে আত্মবিলোপ নয়। ডঃ নিকলসনকে লিখিত এক পত্রে তিনি এ বিষয়ে ব্যাখ্যাদান করেছেন এবং তাঁর দার্শনিক মতবাদ বুঝিয়ে বলেছেন। আসরার-ই-খুদী'র ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন ঃ

জীবন হলো একটি আত্মস্থকরণমূলক সম্মুখগতি। সব বাধাকে আত্মস্থ করে এ নিজের পথ পরিষ্কার করে নেয়। এর অন্তর্নিহিত ধর্ম হলো ঃ অনবরত ইচ্ছা ও আদর্শ সৃষ্টি করে চলা। আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের জন্যে এ নিজস্ব উপাদান দিয়েই কতকগুলো

হাতিয়ার উদ্ভাবন এবং উন্নয়ন করেছে যেমন ঃ ইন্দ্রিয়াবলী, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি। জীবনের যাত্রাপথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হলো বস্তু ও নিসর্গ; কিন্তু তবুও নিসর্গ (প্রকৃতি) পাপাত্মক নয়; কেননা, জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তিপুঞ্জকে প্রকাশ করে তুলবার বেলায় এর ভূমিকা হলো সহায়ক।

খুদী তার পথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন দূরীভূত করেই অর্জন করে স্বাধীনতা। খুদী কিছুটা বিমুক্ত, কিছুটা নির্ধারিত। তার পূর্ণতার স্বাধীনতা লভ্য হয় পরিপূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তিত্ব স্বরূপ আল্লাহ্‌র নিকটতর হয়ে। এক কথায়, জীবন হলো খুদীর স্বাধীনতা অর্জন প্রচেষ্টা।

গ্যেটের একই নামের একটি কবিতার প্রত্যুত্তরে ইকবাল তাঁর 'হুরী ও কবি' শীর্ষক কবিতায় *(পয়াম-ই-মশরিক ১৪৮-৪৯)* জীবনের বিরামহীন কামনা, বিরামহীন প্রচেষ্টা এবং বিরামহীন যাত্রার উল্লেখ করেছেন ঃ

আমি কি করতে পারি, যদি আমার প্রকৃতিই গৃহের প্রতি বিমুখ হয়!
আমার আত্মা যদি ভোরের বাতাসের মতো চঞ্চল হয়,
যখন তা ফুলের পাপড়ি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।
যখন কোনো প্রেমিক আমার সামনে দাঁড়ায়
আর তার রূপলাবণ্য দিয়ে আমাকে মোহিত করে,
তখনও আমার অন্তর সন্ধান করে ফেরে
অধিকতর লাবণ্যময়ী প্রিয়ার।
স্ফুলিঙ্গের মধ্যে আমি খুঁজি তারকাকে,
তারকাবলীর মধ্যে সূর্যকে–
আমার যাত্রাপথে নেই কোনো সীমা, নেই কোনো যতি,
ইতস্ততঃতার মানে হলো আমার মৃত্যু।
এক বসন্তের সঞ্চিত সুরাপাত্র ভরে যখন আমি অধরে ধরি,
অনাগত বহু বসন্তের কথা তখন জেগে ওঠে আমার মনে;
তাতে বদলে যায় আমার সঙ্গীতের সুর ও দ্যোতনা–
এবং অশান্ত নয়ন মেলে, অপ্রতিরোধ্য অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে
আমি খুঁজি বেড়াই
যার পরিপূর্ণতা নেই তার পরিপূর্ণতাকে।

ইকবাল নানাস্থানে নানা উপলক্ষে এসব চিন্তাধারা ব্যক্ত করেছেন। আমার উপলব্ধিতে আর কোনো কবি নেই যিনি এত গভীরভাবে এবং এত বারম্বার করে কর্মময় জীবনের গান গেয়ে গেছেন, আর কোনো দার্শনিক নেই যিনি এত সুস্পষ্ট করে নিজের দর্শন-পদ্ধতি ব্যক্ত করেছেন এবং এমন ভাষা ব্যবহার করতে পেরেছেন যা আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে এতখানি গভীরভাবে গুঞ্জন তোলে।

খুদী হলো ইকবালের গতিধর্মী দর্শনের কেন্দ্রস্থল। তিনি একে মনে করেন ভাল-ও-মন্দের মাপকাঠি স্বরূপ। *'আসরার-ই-খুদী'র* ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন ঃ

> 'ব্যক্তিকে যা শক্তিশালী করে তা ভাল, আর তাকে যা দুর্বল করে তা মন্দ। ললিতকলা, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্রকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে।'

প্রেমের মাধ্যমে খুদী শক্তি অর্জন করে। ইকবাল দর্শনে প্রেমের তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। প্রেম হলো জীবন এবং জীবনের শিখা। এ হলো এমন একটি শক্তি যা কামনার জন্ম দেয় এবং কাম্য বস্তুকে আয়ত্ত করবার প্রেরণা জোগায়। পরিপূর্ণ মানব যিনি হজরত মুহম্মদ (সাঃ) ছাড়া আর কেউ নন্– তাঁর প্রতি আসক্তির ফলে খুদীর অন্তর্নিহিত গুণাবলী প্রকাশ লাভ করে। যে ব্যক্তি প্রেমে পরিণতি অর্জন করতে পারেন, তাঁর পথ থেকে সব বাধা-বিঘ্ন উঠে যায়, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ তাঁর আয়ত্ত হয় এবং অস্তিত্বের রহস্য তাঁর কাছে প্রতিভাত হয়। প্রেম সম্বন্ধে তিনি বলেন ঃ

সেই উজ্জ্বল বিন্দু যার নাম হলো খুদী,
এ-ই হলো আমাদের ধুলিদেহাভ্যন্তরের প্রাণ স্ফুলিঙ্গ।
প্রেমের দ্বারা খুদী আরও শক্তিমান হয়,
জীবন্ততর হয়, উজ্জ্বলতর হয়, জ্বলন্ততর হয়।
প্রেম থেকেই আসে এর অস্তিত্বের উজ্জ্বলতা,
এবং এর অজ্ঞাত সম্ভাবনাবলীর বিকাশ।
প্রেম ভীত নয় তলোয়ার বা খঞ্জরের সামনে,
প্রেম সৃষ্ট নয় 'আব-খাক-বাত'-এ।
প্রেমই পৃথিবীতে আনে যুদ্ধ ও শান্তি,
প্রেমই হলো আব-ই-হায়াত,
প্রেমই হলো মৃত্যুর ঝকঝকে তলোয়ার।

কবি যখন প্রেমের মাধ্যমে উচ্চতর অবস্থিতি অর্জন করেন, তখন তাঁর সম্মুখে অভিব্যক্তি অস্তিত্বের রহস্যাবলী। ইকবাল অনেকবার বলেছেন যে, পরম সত্য তাঁর কাছে অভিব্যক্ত হয়েছে এবং তিনি একটা নবতর সূর্যের ন্যায় উত্থিত হয়েছেন অন্ধকার তিরোহিত করতে। *আসরার-ই-খুদী'র* প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে ঃ

আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি নতুন সূর্যরূপে,
আমি আমার চাল-চলন ও ধরন-ধারণ শিক্ষা করিনি আকাশ থেকে।
আমার প্রত্যুষ পূর্ব গগনে দেখা দিয়েছে এবং রাত্রিকে পরাভূত করেছে–
পৃথিবীর গোলাবের ওপর একটি তাযা শিশির বিন্দু দেখা দিয়েছে।
আমি সে-সব ভক্তজনের অপেক্ষা করছি যারা প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে–
আহা! তারাই সুখী যারা করে আমার অগ্নির উপাসনা।
আজকের শ্রোতার আমার কোনো প্রয়োজন নেই–

আমি হলেম আগামীকালের কবিকণ্ঠ।
আমার গান অন্য এক পৃথিবীর –তাদের পৃথিবীর নয়।
এ ঘন্টাধ্বনি ডাকছে অন্য জগতের পথযাত্রীদেরকে।
তাঁর মৃত্যুর পর আরও আরও অনেক কবি জন্মগ্রহণ করেছিল,
তাঁর চোখ বোঁজার পর তারা আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল,
আমার সঙ্গীতের সুর বীণাতন্ত্রীর সীমা পেরিয়ে যায়,
তবু আমি ভয় করি না আমার বাঁশী ভাঙবে বলে।
জলবিন্দুর জন্যে ভালই ছিল আমার স্রোতের সাথে পরিচিত না হওয়া–
যার ভয়াবহতা সমুদ্রকে মাতাল করে তোলে।
আমার হৃদয় কন্দরে বিদ্যুতেরা ঝিমায়,
আমি চলে যাই পর্বত এবং সমভূমি ঝেঁটিয়ে।
যদি তুমি সমতল হও তবে আমার সমুদ্রের সাথে যুদ্ধ করো;
যদি তুমি সিনাই হও তবে বিদ্যুৎজ্বালা গ্রহণ করো।
আব-ই-হায়াত থেকে পান করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।
জীবন রহস্যের সাথে আমার পরিচিতি ঘটেছে,
আমার জ্বালাময়ী সঙ্গীতের সুরে ধূলিকণায় প্রাণ সঞ্চার হয়েছে-
তারা পাখা খুলেছে এবং জোনাকীরূপ ধারণ করেছে।

ইকবালের কবিতা অতিশয় উদ্দীপনাময় ও অনলবর্ষী। শক্তিগর্ভ ও প্রত্যয়শীল জাতিসমূহের পুনরুজ্জীবনে তা সবিশেষ ফলদায়ক। তাঁর দর্শন গতিধর্মী এতোখানি যে, এতে অনুপ্রাণিত হয়ে পরাধীন জাতিসমূহও জেগে ওঠে এবং নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত হবার উদ্দীপনা লাভ করে। যদিও তিনি বিশেষ করে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করেই লিখে গেছেন, কিন্তু তবুও তাঁর কবিতা ও দর্শনের আহ্বান বিশ্বজনীন। পাক-ভারত মুসলিম সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে তাঁর বাণীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং বৃটিশ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ সংগ্রামে ইকবালের অবদান কতখানি মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা ক্বায়েদ-ই-আযমের একটি সংক্ষিপ্ত বাণী থেকে বোঝা যায়। তিনি বলেন ঃ ইকবাল ছিলেন আমার বন্ধু, নেতা ও দিশারী।

ইকবালের মতে, খুদীর শিক্ষায়নের রয়েছে তিনটি স্তর ঃ

(১) কানুনের প্রতি আনুগত্য,

(২) আত্ম এবং সংযম,

(৩) আল্লাহর প্রতিভূত্ব।

আনুগত্যের অর্থ হলো ঃ ইসলামী বিধানাবলীর কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ, যা থেকে সম্ভব হবে নিসর্গকে জয় করবার ক্ষমতা অর্জন। তাঁর কাব্যিক ভাষায় ঃ

বশ্যতা অপদার্থ মানুষকে যোগ্যতায় উন্নীত করে।

অবাধ্যতা তার অগ্নিকে ভস্মে পরিণত করে।
সূর্য এবং তারকারাজির ওপর যিনি আধিপত্য করবেন,
তিনি যেন গ্রহণ করেন কানুনের বন্দিত্ব।

আত্মসংযম সম্ভব হয় ভীতি ও লালসাকে জয় করবার পরে। নিজের ওপর যার আধিপত্য নেই সে পরের আধিপত্যে এসে পড়বে। আল্লাহর প্রতিভূত্ব হলো মানুষের বিবর্তনের শ্রেষ্ঠতম পর্যায়। যিনি আল্লাহর প্রতিভূর মর্যাদায় আসীন হলেন, তিনি হলেন বিশ্বসংসারে আল্লাহর প্রতিনিধি। একজন সংস্কারক এবং সৃজনী প্রতিভা হিসেবে তিনি বস্তু এবং বস্তুমূলক শক্তিসমূহের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জন করেন।

তিনিই হলেন পরিপূর্ণ খুদী, মানুষের শেষ উদ্দেশ্যস্থল, মনে দেহে জীবনের উন্নততম অভিব্যক্তি। আমাদের মানসিক জীবনের দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে মীমাংসিত। তাঁতে সমাবেশ হয়েছে বৃহত্তম শক্তি ও শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের। তাঁর জীবনে সমন্বয় লাভ করেছে চিন্তা ও কর্ম, কামনা ও যুক্তি। মানবতাবৃক্ষের তিনিই হচ্ছেন পরিণত ফল। বিবর্তনের সমস্ত ব্যথা-বেদনা ও দ্বন্দ্ব এ জন্যে যুক্তিযুক্ত যে, এর পরিশেষে তাঁর আগমন। তিনিই হলেন মানুষের প্রকৃত শাসক; তাঁর রাজ্য হলো পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ্য। তাঁর স্বভাব সম্পদ অন্যদেরকে বিতরণ করে তিনি তাদেরকে নিজের সান্নিধ্যে টেনে আনেন এবং ক্রমগতিতে নিকটে নিয়ে আসেন। যতই আমরা বিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে যাই, ততই আমরা তাঁর নিকটবর্তী হতে থাকি; আর তাঁর নিকটবর্তী হবার পথে আমরা জীবনের উন্নততর স্তরের দিকে এগুতে থাকি। মনে এবং দেহে মানবতার বিকাশ হলো তাঁর জন্মগ্রহণের পূর্বশর্ত। বর্তমানের জন্যে তিনি একটি আদর্শ মাত্র; কিন্তু মানুষের বিবর্তন এমন একটি আদর্শ জাতি সৃষ্টির পথে এগিয়ে চলছে যা তাঁর পিতা-মাতা হবার মতো বিশিষ্ট অনেকখানি অভূতপূর্ব-ব্যক্তিযুথের জন্ম দেবে। অতএব পৃথিবীতে আল্লাহর রাজত্বের অর্থ হলো একটি বিশিষ্ট ব্যক্তি সমবায়ের সাধারণতন্ত্র, যার নেতা হবেন পৃথিবীপৃষ্ঠে শ্রেষ্ঠতম সম্ভব একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি (সিক্রেট্স অব্ দ্য সেল্ফ্'-এর ভূমিকা)

ইকবালের দৃষ্টিতে আল্লাহর এই প্রতিভূ এবং ইবনুল আরাবী ও অন্যান্য সর্বেশ্বরবাদী সূফীদের ব্যাখ্যাত পরিপূর্ণ মানব সম্পূর্ণ পৃথক; কেননা, তিনি বলেন, এই মরমীবাদীরা কর্মবিমুখতা, সুরামত্ততা এবং আত্মবিলোপনের পক্ষপাতী। এঁরা মনে করেন যে, পরিপূর্ণ মানব আল্লাহতে নিমজ্জিত হয়ে যান। এ বিশ্বাস মনসূর হাল্লাজ বর্ণিত হুলুল (অবতারবাদ)-এর সমধর্মী। হাল্লাজ বলেছেন ঃ

আমিই তিনি, যাঁকে আমি ভালবাসি, এবং
যাঁকে আমি ভালবাসি তিনিই আমি।
একই দেহাবলম্বী দু'টি আত্মা আমরা।

তাঁর 'আনাল হক্ক' (আমিই সত্যই বা আল্লাহ) ঘোষণা এবং তাঁর বাণী "আমার পরিচ্ছদে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই নেই" ইত্যাদি হুলূল-এর এক একটি দিক। ইকবাল এই সর্বেশ্বরবাদভিত্তিক আত্মবিলোপন ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে আত্মপ্রতিষ্ঠাবাদের প্রয়োজনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

ইকবালের অন্য একটি বড় কথা হলো ঃ খুদীর পরিপূর্ণ বিকাশ কেবলমাত্র সমাজ জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই হতে পারে। *রমুযই বেখুদীতে* তিনি বলেছেন ঃ

জমাআতের মধ্যে সে যখন হারিয়ে যায়,
তখন তার উপমা সেই জলবিন্দুটির সাথে
যে নিজেকে বিকশিত করতে গিয়ে পরিণত হয় সমুদ্রে।
তখন সে অর্জন করে অপরিমেয় শক্তি ও সম্পদ।
চিরন্তন প্রথায় সে পরিণত হয়
অতীত ও ভবিষ্যতের দর্পণরূপে;
এবং যা আসবে আর যা গত হয়েছে
তাদের যোগাযোগ সূত্র রূপে।
অতএব এর মুহূর্তগুলো যেন অনন্তকাল-
অশেষ এবং পরিমাপের অতীত।
তার অন্তর উদ্বেল হয়ে ওঠে
সমাজ জীবন থেকে আহরিত বিকাশের আনন্দে।
এ সমাজবোধ প্রহরা দেয় তার সর্বকর্মকে,
নিয়ন্ত্রণ করে সর্ব অনুভূতিকে।
সে বোঝে যে, তার দেহ ও অন্তর
- ভিতর ও বাহির-
সে পেয়েছে সেই সামগ্রিক জীবনবোধ থেকে।

সমাজ মন যখন আলস্যের কোলে গা ঢেলে দেয় এবং নিজের বিশিষ্ট ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন সেই সমাজের অন্তর্নিহিত জীবন স্পৃহা থেকে এমন কতক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অসাধারণ মানুষ জন্মলাভ করেন, যাঁরা সেই অধঃপতিত সমাজকে আবার উন্নতির উচ্চ শিখরের পানে চালিত করতে সক্ষম হন। এই নেতার বর্ণনা দিতে গিয়ে ইকবাল বলেছেনঃ

তিনি সেই চারণ
যাঁর অন্তর্ভেদী সুর ধুলায় নবজীবন সঞ্চার করে।
তাঁর একটি শ্বাসে
দুশো দেহ সঞ্জীবিত হয়; এক গ্লাস (শুরায়)
তিনি একটি মজলিসকে জীবন চঞ্চল করে তোলেন।
তাঁর তীক্ষ্ণ চাহনি যেন ঘাতকের ছুরিকার ধার,
–কিন্তু তাঁর একটি বাক্য আবার ফিরিয়ে আনে জীবন স্পন্দন-
যাতে দ্বিত্বের হয় বিলোপ এবং একত্বের জন্ম।
তাঁর শ্বাসের বহ্নিজ্বালায়

মানুষ লাফিয়ে ওঠে স্ফুলিঙ্গের মতো।
তাঁর হাতের অগ্নিশিখার ঝলক
মানুষের অন্তরে মনে আনে আলোড়ন।
তাদের কর্দমদেহ
অকস্মাৎ জ্বলে ওঠে মোমবাতির মতো।

এই ইনসান-ই-কামিল বা পরিপূর্ণ মানবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে কবি বলেছেন ঃ

জাতিপুঞ্জের উচ্চবাচ্য স্তব্ধ করে দিয়ে
তোমার সঙ্গীতের স্বর্গসুধা ঢালো আমাদের কানে।
জেগে ওঠো। মানুষকে শোনাও ভ্রাতৃত্বের বাণী।
আবার পান করাও আমাদেরকে প্রেমের মদিরা।
পৃথিবীতে আবার ফিরিয়ে আনো শান্তির দিবস ও রজনী।
শান্তির আহ্বান জানাও তাদেরকে যারা চায় যুদ্ধ-
যে আহবান অপ্রতিরোধ্য।
মানুষ তো শষ্যক্ষেত্র আর তুমি তার ফসল।
জীবনের যাত্রাপথের লক্ষ্যস্থল সেও তো তুমিই।
আমাদের কাননের সব বৃক্ষলতা পত্রশূন্য আজ, হেমন্তের পক্ষাঘাতে।
হে বসন্ত! তাকে তুমি ছুঁয়ে যাও।

আমরা কি বলতে পারিনে যে, মুহম্মদ ইকবাল নিজেই ছিলেন তাঁর নিজের পরিকল্পিত এই পরিপূর্ণ মানব–ইনসান-ই-কামিল? তাঁর আগমনের ফলে তাঁর দেশবাসী জনগণ দ্বিধা-সন্দেহ ত্যাগ করে, হতাশার ভাব কাটিয়ে একটি সুসংবদ্ধ সম্প্রদায়ে পরিণত হলো এবং সোৎসাহে ও দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পরাধীনতা ও দাসত্ব থেকে মুক্তির সংগ্রামে।

ইকবালের আল্লাহর প্রতিভূ'র ধারণা আমাদেরকেই অবশ্যই নীটশের 'দাস স্পেক জরথুস্ত্র' (জরথুস্ত্র বললেন) গ্রন্থে বর্ণিত পরিপূর্ণ মানব-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও এ দু'য়ের মধ্যে এখানে– সেখানে সাদৃশ্য দেখা যায়, তবুও ইকবাল নীটশের এই নাস্তিক্যবাদী ধারণা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আসরার-ই-খুদীর ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন ঃ

> নীট্শে এই আদর্শ জাতির কিছুখানি আভাস লাভ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর নাস্তিক্যবাদ ও আভিজাত্যমূলক মনোভঙ্গি তাঁর সবটা দর্শনবোধকে ব্যর্থ করে দিয়েছে।

কোনো মানুষ যখন ইতিহাসের গতিকে প্রভাবিত করতে চান, বাস্তব জগতের শক্তিসমূহকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনতে চান এবং জগত-জীবনের ওপর নিজের অনুপম সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যেতে চান, তখন তাঁকে প্রথমে নিজ ব্যক্তিত্বে তেমন তরো পরিবর্তন আনতে হবে এবং নিচের খুদীকে সে অনুযায়ী শক্তিমান করে গড়ে তুলতে

হবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিতে পরিপূর্ণ মানব এবং সৃষ্টিধর্মী শিল্পীর শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ইকবাল আল্লাহ্কে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ

তুমি সৃষ্টি করলে রাত্রি,
আমি বাতি হাতে এসে তার অন্ধকার দূরীভূত করলাম।
তুমি সৃষ্টি করলে কর্দম,
আমি তা দিয়ে পান পাত্র তৈরী করলাম।
তুমি সৃষ্টি করলে মরুভূমি, পর্বত ও অসমতল পৃথিবী,
আমি তাতে গড়ে তুললাম পুষ্পোদ্যান।
তোমার পাথর দিয়ে আমি তৈরী করলাম দর্পণ,
তোমার বিষ দিয়ে অমৃত।
(পয়াম-ই-মশ্‌রিক, ১৩২ পৃঃ)

এই গতিধর্মী সৃষ্টিশীল চিন্তা, এই সুষ্ঠু মরমী অনুভূতি এবং মানবতাবাদের সহায়তা নিয়ে ইকবালই কৃতকার্য হলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের একটি সুসামঞ্জস্য সমন্বিত রূপদানে। তিনি পাশ্চাত্য চিন্তার অতি গভীরে সন্তরণ করেছেন; বের্গসঁ, নীট্শে ও গ্যেটের দর্শন-পদ্ধতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন; কিন্তু মুসলিম চিন্তাধারার ইতিহাসের সাথে তাঁর পরিচিতিও কম গভীর ও আন্তরিক নয়। এভাবে এমন একটি বিশিষ্ট মর্যাদা অর্জনের ফলেই তিনি নিজস্ব একটি দর্শন-পদ্ধতির জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছেন।

ইকবাল একজন অসামান্য কবি ছিলেন, একজন মহান ঋষিও ছিলেন। তিনি তাঁর জাতিকে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও মহৎ আশার বাণী শুনিয়েছেন, তাদেরকে নবতর জাগরণের গান শুনিয়েছেন। কবির ভাষায় তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন এক নবোদিত ও গৌরবোজ্জ্বল সূর্যরূপে চারিদিকে সত্য-বিশ্বাস ও সত্য-নীতির আলোক বিকিরণ করে। তাঁর আবির্ভাবে সত্যিই পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলিম জাতির ওপর থেকে গভীর রাত্রির প্রগাঢ় তিমির দূরে সরে গেল এবং জীবনে দেখা দিলো নতুন উষার আলোক।

প্রশান্ত অন্তরে ও বয়ানে সমস্ত দুঃখ-বেদনা সহ্য করে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে তিনি নিজ সম্প্রদায়ের হৃদয়ে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে এবং একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে অশ্রুতপূর্ব প্রেরণা দান করলেন। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ২১ জুন তারিখে তিনি ক্বায়েদ-ই-আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ্কে লেখেন ঃ "শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হলো দেশকে জাতিগত (racial), বর্ণগত ও ভাষাগত ভিত্তিক পুনর্বিন্যাসকরণ।"

কিন্তু, পরিতাপের বিষয়, তিনি নিজ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেখে যেতে পারেননি। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্রের জন্মের নয় বছর পূর্বে তিনি নশ্বরধাম ত্যাগ করেন।

আমি বলেছি যে, মুহম্মদ ইকবালের ভূমিকা ছিল সত্যিই একজন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির। তিনি অন্তর্চক্ষে দেখতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতে সত্যি সত্যিই কি ঘটতে যাচ্ছে– কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে তা অগোচর ছিল। একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র পৃথিবীর মানচিত্রে দেখা

দেবার অনেক পূর্বেই তাঁর মানসপটে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কয়েক ছত্র অপূর্ব সুন্দর কবিতায় তিনি তা প্রকাশ করেছেন–অবশ্য অনুবাদে সে কাব্য মাধুর্য আস্বাদন সম্ভব নয় ঃ

যে আমি চন্দ্রের মতো রাত্রিকে সুষমা মণ্ডিত করি,
সে আমিই ধুলিসম বিনম্র পূত-পবিত্র মিল্লৎ-এর কাছে–
যে মিল্লৎ পর্বতে-উপত্যকায় সুপ্রকাশ।
মানুষের হৃদয়-মনে যে জ্বালিয়ে দেয় অফুরন্ত সঙ্গীত-শিখা,
একটি পরমাণু বপন করে যে একটি সূর্য অভ্যুদিত করেছে,
যে জন্ম দিয়েছে রূমীর মতো শত শত কবিকণ্ঠের।

ইকবালের কর্মবাদী দর্শন ও কবিতা সম্বন্ধে কিছুখানি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু, এ· আলোচনা তাঁর কর্মের সামগ্রিক পরিচিতির উদ্দেশ্যে নয়। বিশেষ করে তাঁর দর্শন নিয়ে আলোচনাই আমার আজকের উদ্দেশ্য; কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, তা বিশেষজ্ঞসুলভ আলোচনা নয়। সে ধরনের চেষ্টা এখানে অপ্রাসঙ্গিক এবং তা সহজসাধ্যও নয়।

যা হোক, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে আমরা পাকিস্তানী জাতির এই দিশারী এবং মুসলিম কবি-দার্শনিকের মৌলিক পরিচয় পেয়েছি। আমি বলেছি যে, তিনি মানব জীবনের ক্রম-উর্ধ্বতনের বিশ্বাসী ছিলেন। যে-সব অবক্ষয়বাদী চিন্তাবিদ মনে করতেন যে, ইসলাম ধর্ম পৃথিবীতে এসেছিল একটি অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ঘটনারূপে এবং শীঘ্রই আবার নিজ স্থানে (অবলুপ্তির অন্ধকারে) ফিরে যেতে বাধ্য, ইকবাল তাঁদের মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের মতবাদ মানুষের অন্তর্নিহিত উন্নয়নমূলক গুণাবলীর বিকাশেরই বিরোধিতা করছে; অর্থাৎ মানুষের উন্নত থেকে উন্নততর এবং পরিশেষে উন্নততম বিকাশ স্তরের দিকে এগিয়ে যাবার পথে এসব মনোবৃত্তি বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি করে এবং কার্যত মানুষের মনকে অকর্মন্যতার জালে জড়িয়ে দেয়। এ যুগের চিন্তাবিদ ও সংস্কারকদের মধ্যে ইকবালের স্থান ছিল অতি বিশিষ্ট; তিনি তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার মূলভিত্তি রচনা করে গেছেন একটি নিজস্ব এবং নবতর দর্শন-পদ্ধতির মাধ্যমে। এ কালের অন্যান্য চিন্তা-নেতাদের মতো ইকবালও অবশ্যই যুগধর্মের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন এবং যুগের জ্ঞানের আলোকেই ইসলামের সমালোচকদের আপত্তি ও বিরোধিতার যথাযথ প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও তাঁর স্থান ছিল স্পষ্টতঃ বিশিষ্ট ও অদ্বিতীয়; কেননা, ইসলামের সত্যিকার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের ছিল গভীর জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি; তাছাড়া সুষ্ঠু ও আইনানুগ সূফী-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল যথার্থ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পারদর্শিতা। চিন্তাজগতের তিনি অর্জন করেছিলেন চরমোৎকর্ষ। সে জন্যেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল কালের ও যুগের বিভিন্নমুখী চিন্তাসূত্রগুলোকে একগুচ্ছে আনয়ন করে একটি সামগ্রিক ও সুসামঞ্জস্য দর্শন-পদ্ধতি গড়ে তোলা। এহেন কৃতিত্ব অর্জন সম্ভব হয় এক-একজন সুদুর্লভ যুগ-প্রবর্তক প্রতিভা দ্বারা। ইকবালের অবদান সত্যিই তাঁকে অমরত্বে উন্নীত করেছে।

মরক্কো

রাবাত-এ ইকবাল দিবস উপলক্ষে পাকিস্তান দূতাবাস কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলনে অধ্যাপক এস.আই. ফাহিদ্ বলেন ঃ

প্রতি বছর ঐতিহাসিক ২১ এপ্রিল তারিখে মুসলিম বিশ্বের মহান দার্শনিক এবং অমর কবি ও চিন্তা-নেতা মুহম্মদ ইকবালের স্মরণে আমরা একত্রিত হয়ে থাকি। ইসলামের এই কৃতি সন্তানই পাক-ভারতীয় উপমহাদেশবাসী দশকোটি মুসলিমের জন্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের কথা সর্বপ্রথম চিন্তা করেছিলেন।

সিরিয়ার প্রখ্যাত পন্ডিত ও মনীষী আমির সাকায়েভ আরসালান বলেছেন যে, বিগত দশ শতাব্দীর মধ্যে ইকবালের চেয়ে মহত্তর কোন চিন্তাবিদ মুসলিম জাহানে জন্মগ্রহণ করেন নি। এ কালীন জগতে ইকবালের স্বভাব-সুলভ যোগ্যতা ও প্রকৃত কর্মসাধনার কথা চিন্তা করলে সাকায়েব আরসালানের এ মত যে, পুরোপুরি ন্যায়সঙ্গত তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু ইকবাল শুধুমাত্র একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন না; তাঁর অতুলনীয় ও বহুমুখী প্রতিভা ফিক্হ্, রাজনীতি, শিক্ষা, আইন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ইকবাল জাতীয়তাবাদের বিরোধী ছিলেন; তিনি একে মনে করতেন আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার একটি সংকীর্ণ দিক বলে–যা একটি জবরমূলক আঞ্চলিক সীমারেখার বাইরেকার মানুষকে ঘৃণা করতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর কাছে আদর্শ জীবন ছিল বিরামহীন প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্যমূলক জীবন। তাঁর চিন্তাধারার এ দু'টি বিশিষ্ট দিক্‌কে তিনি তাঁর কবিতাবলীর মাধ্যমে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে গেছেন। তিনি বলেন,

> "বিশ্বজগতে জীবন একটি বিরামহীনভাবে বিকাশমান ব্যাপার; বিকাশ এবং পরিবর্তন থেমে যাবার সাথে সাথেই সে মৃত।"

ইউরোপ প্রবাস থেকে ফিরে আসবার পরে ইকবাল পাশ্চাত্যকে উদ্দেশ্য করে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন বস্তুবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিপজ্জনক পরিণতি সম্বন্ধে। সেখানে তাঁর চোখের সামনে যে-সব ঘটনা ঘটছিল, সেগুলো তিনি শুধু চোখ দিয়ে দেখেই ক্ষান্ত হননি, সেগুলোর তাৎপর্যও হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সমসাময়িক পাশ্চাত্য সম্বন্ধে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি কতখানি বাস্তবভিত্তিক ছিল, তা বোঝা যাবে তাঁর নিম্নোক্ত ছত্র ক'টি থেকে ঃ

> হে পাশ্চাত্যবাসীরা! আল্লাহ্‌র পৃথিবী একটি দোকান ঘর নয়,
> তোমরা যাকে খাঁটি মনে করছ তা মেকি বলেই প্রমাণিত হবে।

তোমাদের নিজেদের হাতেই তোমাদের সভ্যতা ধ্বংস হবে।

ভঙ্গুর শাখায় নির্মিত নীড় ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য।

'শিক্ওয়াহ্' এবং *'জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ্'* ইকবালের উত্তম কবিতাবলীর অন্যতম। এগুলো প্রকাশিত হবার পর তাঁর যশোসৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি উর্দু ও ফার্সী-দু'ভাষাতেই লিখেছেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর প্রথম উন্নতমানের মসনবী গ্রন্থ 'আসরার-ই-খুদী' প্রকাশিত হয়। তিন বছর পরে আত্মপ্রকাশ করে রমূযই-বেখুদী'। প্রথম গ্রন্থে ইকবাল 'খুদী'-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন; এ হলো তাঁর দর্শনের ভিত্তিমূল। এতে তিনি বলেছেন যে, জীবন্ত বা অন্যরূপ সবকিছুকেই একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বা 'আত্ম-ত্ব' দেওয়া হয়েছে—যা প্রত্যেকের জন্যে অস্তিত্বের একটি বিশেষ অভিব্যক্তিরূপ এবং যা এককে অন্য থেকে পৃথক করে। এই বিশিষ্ট আত্মত্ব যখন নিজের স্বাভাবিক পথে বিকাশ লাভ করে, তখন মানব অহং বা খুদী অশেষ শক্তি অর্জন করে এবং পারিপার্শ্বিকতার ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে। তার এ প্রকাশকে স্থান বা কালের পর্যায়াবলী আর ঘিরে রাখতে পারে না। তখন মানুষ পরম ব্যক্তিসত্তা আল্লাহ্র নিকটতম হয়। খুদীর এই বিকাশের পরিণতিতে জন্মগ্রহণ করেন পরিপূর্ণ মানব, যাঁকে ইকবাল বলেছেন 'মর্দে মু'মিন' (বিশ্বাসী পুরুষ)। তাঁর মতে, এই পরিপূর্ণ মানবতার বিভিন্ন পর্যায়ের বিকাশের জন্যে প্রয়োজন প্রেম, ধৈর্য, সহনশীলতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, পুণ্যশীল জীবন-যাপন এবং প্রকৃত সৃষ্টিধর্মী কর্ম। এই নীতি-পদ্ধতির সাহায্য ছাড়া সেই আদর্শ অবস্থিতিতে পৌঁছানো অসম্ভব।

'রমুয-ই-বেখুদী'-তে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনব্যপদেশে ইকবাল ছ'টি শর্ত দিয়েছেন। যথা ঃ

১। মানব সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তিভূমিরূপ তৌহীদ,
২। তৌহীদভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গঠনের জন্যে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব,
৩। সমাজকে পরিচালিত করবার জন্যে একটি মৌলিক নীতিমালা,
৪। একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্রস্থল,
৫। একটি বিশেষ আদর্শের প্রতি সমাজের সদস্যবৃন্দকে পরিচালনে উদ্যম সঞ্চারের জন্যে একটি যথাযোগ্য আদর্শ যা সাথে সাথে তাদের মধ্যে একত্ববোধ ও সুসামঞ্জস্য বিধান করবে,
৬। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহকে আয়ত্তে আনয়ন।

তাঁর মতে, যে সমাজ এসব নীতি আয়ত্ত করবে, তা চিরন্তন জীবনে ভূষিত হবে এবং তার কোনো অধোগতি বা মৃত্যু নেই।

এখন আমি ইকবাল প্রতিভার অন্য একদিকের উল্লেখ করবো। ১৯২৮ ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কতকগুলো বক্তৃতা দান করেন, যা পরে *'ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন'* নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এ পুস্তক একটি যুগান্তকারী অবদানরূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এর ফলে ইকবাল সমসাময়িক মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদের আসন লাভ করেন। এই বক্তৃতামালায় তিনি মুসলিম দর্শনকে ইসলামী চিন্তাধারার সনাতন ঐতিহ্যের ভিত্তি থেকে বিজ্ঞানে ও দর্শনে পাশ্চাত্যের আধুনিকতম গতি-প্রগতির আলোকে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের আলিম সমাজ যে একদিকে তর্কক্ষেত্রে ইজতিহাদনীতির স্বীকৃতি দেন, আবার কার্যক্ষেত্রে মুসলিম আইনের প্রয়োগে চার মযহাবের কোনো একটির সিদ্ধান্তকে অবশ্য পালনীয় মনে করেন, সে জন্যে তিনি খোলাখুলিভাবে তাঁদের সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"বর্তমানকালের মুসলিম উদারপন্থীরা যে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং পরিবর্তিত অবস্থা ও পরিপার্শ্বিকতার আলোকে ইসলামী আইনের মূলনীতিসমূহের পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে

চাচ্ছেন, আমার মতে, তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। কুরআনের শিক্ষা অনুসারে জীবন হলো একটি প্রগতিশীল সৃষ্টিধর্মী ধারাবিশেষ। অতএব এটি অবশ্য প্রয়োজনীয় যে, প্রতি যুগে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে পূর্ব পুরুষদের অভিজ্ঞতা ও কর্মের সহায়তা গ্রহণ করে, অথচ তাঁদের কাছে বাধা না পড়ে, নিজেদের সমস্যার সমাধান করবার।"

উর্দু ও ফার্সীতে রচিত তাঁর কবিতাবলীতে ইকবাল দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, একমাত্র ইসলামই বর্তমানকালের সঙ্কট থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। *'জাবিদ নামাহ্'*-তে আমরা দেখতে পাই আবু জাহ্‌ল্‌কে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ব্যাপারে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে। হযরত যে মানবীয় ভ্রাতৃত্ব এবং নৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সাম্যের বাণী প্রচার করেছিলেন, আবু জাহ্‌লের প্রধান আপত্তি সেখানেই। আবু জাহ্‌লের কথায় ঃ

এই মুহম্মদ আমার বক্ষকে বিদীর্ণ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলেছে ;
তার নিশ্বাস কা'বার জ্বলন্ত প্রদীপ নিবিয়ে দিয়েছে।
তার নীতি রাজশক্তি ও বংশ মর্যাদাকে ধুলি লুণ্ঠিত করেছে,
আরবদের ওপর কুরায়েশের আধিপত্যকে সে অস্বীকার করেছে।
তার দৃষ্টিতে উচ্চ-নীচে ভেদ নেই-
নিজের ক্রীতদাসের সাথে সে একত্রে খাদ্য গ্রহণ করেছে।
আরবদের সম্ভ্রান্তির নেই কোনো মূল্য তার কাছে;
অথচ কদর্য হাবশীর সাথে তার মেলামেশা।
রক্তবর্ণ আর কৃষ্ণবর্ণে চলেছে মিশ্রণ,
জাতি ও পরিবারের সম্মান আজ বিনষ্ট।
এসব 'সাম্য-মৈত্রী'র ভড়ং আসলে বিদেশ থেকে আমদানী;
আমি ভাল করেই জানি যে, সলমান একজন মযদকপন্থী।

ইকবালের প্রথম জীবনে তাঁর বাণী গ্রহণ করতে লোকেরা ইতস্তত করতো। তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ, অনেক বিরোধ দেখা দেয়, অনেকগুলো বাদানুবাদমূলক প্রবন্ধ ও বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়। কিন্তু ক্রমশঃ মানুষ তাঁর মতবাদের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করে, তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। ফলে, জীবনকালেই এই মহান কবি-দার্শনিক তাঁর দেশবাসী জনগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতিতে অভিষিক্ত হন। কবিতার উদাত্ত আহ্বানে উপমহাদেশের জনগণকে-বিশেষ করে, তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের লোকদেরকে জাগিয়ে তুলতে তিনি এতখানি কৃতকার্য হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টা এতখানি কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী হয়েছিল যে, আজকে তা সম্যক বুঝতে পারা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। তিনি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছিলেন, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাদের ঐতিহাসিক পূর্ব-মহত্ত ও মর্যাদার আসন পুনর্দখল করে নিতে। তিনি তাদের হাতে নিজেদের নৈতিক মূল্য পরিমাপের একটা হাতিয়ার তুলে দিলেন; সে হাতিয়ার হলো 'খুদী দর্শন'। জীবন এবং বিশ্ব জগত সম্বন্ধে তাদের চিন্তায় তিনি বিপ্লব আনলেন। তাঁর বাণীর শক্তিতেই উপমহাদেশীয় জনগণের আলস্য-তন্দ্রার অবসান হলো; এবং তাদের এই দুর্ধর্ষ স্বাধীনতা স্পৃহা থেকেই তাঁর মৃত্যুর পর মাত্র দশ বছর অতীত না হতেই তারা নিজেদের স্বাধীন সত্তা প্রতিষ্ঠিত করলো-তাদের ধ্যানের আবাসভূমি স্বাধীন পাকিস্তান জন্মলাভ করলো। এ সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল যে, তিনি নিজ জীবনকালেই দেশবাসীর নবতর জীবনোদ্যমের প্রাথমিক বিকাশ দেখে গিয়েছিলেন। সত্যি সত্যিই ইকবাল হলেন পাকিস্তানী জাতির আধ্যাত্মিক পিতা।

ইকবাল হলেন একজন বিশ্ব-নাগরিক। তাঁর মানব-প্রেম পৃথিবীর সর্বজাতি ও সর্বদেশ বিরাজিত ছিল। তিনি সব মানুষকে মানবীয় মর্যাদায় আসীন দেখতে চেয়েছেন। অপরপক্ষে, তিনি প্রাচ্যবাসী ও প্রতীচ্যবাসী সব মানুষের প্রিয় ছিলেন। এ কথা সত্য যে, ইকবাল পাশ্চাত্যকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। কিন্তু সে আলোচনা অত্যন্ত যথার্থ এবং সমসাময়িক পাশ্চাত্য জগতের প্রকৃত অবস্থার বাস্তবধর্মী পরিচিতি জ্ঞাপক। কিন্তু সাথে সাথে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানবকল্যাণের সাথে যে অবদান দিয়েছে, তিনি তার আন্তরিক প্রশংসাবাদও করেছেন। প্রশংসাবাদ বা সমালোচনা কোনটাই তাঁর খামখেয়ালপ্রসুত নয়। তাঁর মতে, সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের ভাল-মন্দের বিচার হবে কতগুলো সত্যভিত্তিক মূল্যমানের আলোকে। সে-সব মূল্যমানের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা তিনি বিস্তারিতভাবেই দিয়েছেন।

ইকবাল সমভাবেই জাতপ্রীতি (racialism)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, এ হলো মানব ভ্রাতৃত্বের বিরোধী এবং এতে নিহিত রয়েছে মানুষে মানুষে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মানুষের ধ্বংসের বীজ। মুসলিমদের প্রতি তাঁর দাবী হলো ঃ

আমাদের মূল কোনো একস্থানে প্রোথিত নয়;
আমাদের শুরার তেজ কোনো একপাত্রে আটক নয়;
আমাদের হৃদয় ভারতীয় বা সিরীয় বা রূমীয় নয়;
আমরা চিনি না ইসলাম ভিন্ন কোনো রূমীয় মাতৃভূমি।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রতি ছিল তাঁর আনুগত্য; এবং আরব বিশ্বের প্রতি তিনি অশেষ অনুরাগ পোষণ করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে, সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া মুসলিম সম্প্রদায়ের আদর্শ প্রাণকেন্দ্র হলো মক্কাভূমি। প্রকৃতপক্ষে কুরআনই তাঁর প্রেরণার একমাত্র উৎস।

নিঃসন্দেহে ইকবাল ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি এমন একটা নব উদ্যমের জন্ম দিয়েছিলেন, যা সমগ্র বিশ্বের মুসলিম জাতিসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। তাঁর প্রগতি-ও-বিশ্বাসের বাণী পৃথিবীর সর্বত্র সাড়া জাগিয়ে তুলেছে; কেননা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিতে যা কিছু গ্রহণযোগ্য ও রক্ষণযোগ্য তা-ই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বাণীতে।

আরব বিশ্বের জন্যে এটা সৌভাগ্যের বিষয় যে, তাঁর শ্রেষ্ঠতম পুস্তকাবলীর কোনো কোনোটা আরবীতে অনূদিত হয়েছে। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *'শিক্‌ওয়াহ'* ও *'জওয়াব-ই-শিক্‌ওয়াহ্'* আরবী ভাষায় পাওয়া যায়। ইরাকী মহিলা কবি আমীনা নূরুদ্দীন ও ডঃ আবদুল ওয়াহ্হাব আযযাম আরবীতে ইকবালের বেশ কয়েকটা গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। আমি আশা করি যে, তাঁর বাকী বইগুলোও যথাশীঘ্র সম্ভব এ ভাষায় অনূদিত হবে।

উপসংহারে আমি উল্লেখ করতে চাই যে, ইকবাল তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন মুসলিম বিশ্বকে জাগিয়ে তুলতে। এটা সৌভাগ্যের কথা যে, তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই সমগ্র মুসলিম জগতে বিদেশী শাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির অদম্য সংগ্রাম আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং একের পর এক এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলো সাম্রাজ্যবাদকে কাহিল করে তুলেছিল। পবিত্র কুরআন ঘোষণা করছেন ঃ

তোমরা দুর্বল চিত্ত হয়োনা এবং দুঃখ করো না;
কেননা, তোমাদের জয় অবধারিত
যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

ইরান

মেশেদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চান্সেলর ডঃ আলী রাযা ক্বাওরাম নাসীরী ইকবাল মৃত্যুদিবস উপলক্ষে (২১-৪-৬৬) আয়োজিত সম্মেলনে বলেন–

ইরান ও পাকিস্তানের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যেকার চিরকালীন সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় যোগসূত্রের কথা কারুরই অজানা নয়। নিঃসন্দেহে বহু শতাব্দী ধরেই এ দু'জাতি নিবিড় ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইতিহাসের পাতায়, সাহিত্যের বই-পুস্তকে, ধর্মীয় ঐতিহ্যে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, এমনকি রূপকথার মাধ্যমেও এ দৃঢ় বন্ধনের ভুরি ভুরি প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হবার পরও এ বন্ধনে কোনো শিথিলতা তো আসেনি, বরঞ্চ অধুনা দু'দেশের রাষ্ট্রপতিদ্বয় শাহিনশাহ্-ই-ইরান ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট-এর সুযোগ্য নেতৃত্বে সেই পুরাতন সম্পর্ক ব্যাপকতর ও সুষ্ঠুতর হয়ে চলেছে। পাকিস্তানের স্বনামধন্য কবি আল্লামা ইকবালের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে যে-সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, তাতে সেই পুরাতন মৈত্রিবন্ধনকে নতুন রূপদানের সুযোগ ঘটে। কারণ, ইকবাল আসলে উভয় জাতিরই কবি এবং আমাদের সবার মনন ও মানস তাঁর অমূল্য বাণীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

এই হেতু মেশেদ বিশ্ববিদ্যালয় অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে ইকবাল-স্মৃতিসভার আয়োজন করে আসছে। কেননা, আমাদের বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনে সাংস্কৃতিক বন্ধন অন্য যে-কোনো বন্ধনের তুলনায় দৃঢ়তর ও অধিকতর স্থিতিশীল। এ বছরও এ উৎসব উদ্‌যাপনে আমরা আমাদের পাকিস্তানী ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে এক সারিতে এসে দাঁড়িয়েছি। আজকে আমি অবশ্য কোনো দীর্ঘ বক্তৃতার প্রস্তুতি নিয়ে দাঁড়াইনি, কোনো বিশেষ সন্দর্ভও উপস্থাপন করছিনে। আমি আজ মহাকবির এমন একটি কবিতা আবৃত্তি করে বিদায় গ্রহণ করবো, যা-তে তিনি আমাদের অমর কবি শায়খ্ সাদীর কয়েকটা ছত্র অন্তর্নিবিষ্ট করেছেন, আর তাতে করে একটি অবিস্মরণীয় কাব্যিক কাহিনীর দার্শনিক রূপ প্রতিভাত করেছেন।

অতঃপর আমি সানন্দে অনুরোধ করবো আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্ব-বিশারদ অধ্যাপক গোলাম হুসায়ন ইউসুফীকে তাঁর বক্তৃতা পেশ করতে। যে কবিতাটার প্রতি আমি ইঙ্গিত করলাম তাতে কবি ইকবাল বারিবিন্দু ও সমুদ্র-সংক্রান্ত ছোট্ট একটি কথিকার মোড়

ঘুরিয়ে এক উত্তুঙ্গ কবি শিল্পের সৃষ্টি করেছেন। এতে স্পষ্টরূপ লাভ করেছে তাঁর বিশেষ প্রতীতি ও চিন্তাধারা। যা-হোক ঃ

মেঘনিসৃত একটি বারিবিন্দু সমুদ্রবক্ষে আপতিত হয়ে
সমুদ্রের অসীম বিস্তৃতি দর্শনে আমি কি? আমি কোথায়?
সত্যই, যেখানে সমুদ্র অস্তিত্বশীল সেখানে আমি অস্তিত্বহীন
উত্তরে সমুদ্র গর্জনের সুরে বললো ঃ
আপনার দৈন্যহেতু আত্মগোপনের প্রয়াস পেয়ো না।
সকাল-সন্ধ্যার আবর্তন-বিবর্তন দেখেছ তুমি
তুমি উদ্যান-পুষ্প দেখেছ, দেখেছ প্রাসাদাবলী নগর বন্দর,
তুমি ঘাসের পাতায় বসে অনন্ত আকাশকে প্রতিবিম্বিত করেছ
তুমি মেঘমালার স্কন্ধে আরোহণ করে রবিকরে উদ্দীপ্ত হয়েছ।
আমারই উত্তাল তরঙ্গ হতে তোমার জন্ম,
আমার ক্রোড়ে তুমি ফিরে আসবে–এতে লজ্জার কি আছে?
আমার ক্রোড় তোমার শান্তি-নিলয়,
আমার মুকুরে তুমি মুক্তাবৎ প্রতিবিম্বিত হবে-তাই হও!
লোহিত সাগর বক্ষে তুমি জীবিত থাকবে সহস্র কিরণচ্ছটা
প্রতিফলিত করে,
তুমি বেঁচে থাকবে চাঁদ-সেতারার চেয়েও উজ্জ্বলতার রূপ
নিয়ে–তাই থাকো?

উক্ত সম্মেলনে ডঃ গোলাম হুসাইন ইউসুফী বলেন–

পাকিস্তানের প্রথিতযশা কবি মুহম্মদ ইকবালের পরিচিতি তাঁর জীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী বা পেশাগত জ্ঞানচর্চার ওপর নির্ভরশীল নয়। তাঁর প্রতিভা বহুধাবিস্তৃত। ইদানিং কয়েক বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে-বন্দরে নিয়মিতভাবে তাঁর স্মৃতি-দিবস উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে এবং বহু পুস্তক-পুস্তিকা তাঁর সাহিত্য, দর্শন ও কর্মের পরিচিতি নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

আজকে আমার হাতে যে স্বল্প সময় রয়েছে, তাতে আমি কবির সাধনার একটি বিশেষ দিক নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ইকবাল একজন কবি, দার্শনিক, রাজনীতিক এবং অধিকার-সচেতন মানুষ ছিলেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ও লেখনী একাধিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন; এবং এ পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁর কবিতাবলীর বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয়। আমার আজকের বক্তব্য তাঁর জীবনবোধ সম্বন্ধে।

অন্যসব বাদ দিয়ে ইরানবাসীদের কাছে ইকবালের জনপ্রিয়তার এক বিশেষ কারণ হলো তাঁর ফারসী-প্রীতি। তিনি তাঁর মতাদর্শের বাহন হিসেবে আমাদের মাতৃভাষাকেই গ্রহণ করেছেন; এমন কি, সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশে তিনি ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য অন্যান্য কবিদের বেলায় যেমন, তাঁর রচনায়ও উঁচু-নীচু পরিলক্ষিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ

> আমি হিন্দুস্তানী মানুষ, ফার্সী ভাষার সাথে অপরিচিত।
> আমি নবোদিত চাঁদ, কিন্তু আমার পাত্র শূন্য।
> যদিও হিন্দী ভাষা স্বাদে-গন্ধে চিনির সমতুল্য,
> তবুও দরি (ফার্সী)'র বর্ণনারীতি সুস্বাদু ও সুমধুর।
> আমার ধ্যান-ধারণা তার কিরণে মন্ত্রমুগ্ধ।
> আমার কলম পরিণত হয়েছে তুর পর্বতের খেজুর শাখায়।
> ফার্সী হলো আমার উচ্চাঙ্গ চিন্তার স্বভাব বন্ধু।

ইকবাল মানুষের কল্যাণ কামনায় ও সে কামনাকে রূপদানের জন্যে সতত নিয়োজিত ছিলেন। অবশ্য বিশ্বময় মুসলিম জাতিসমূহের জন্যে তাঁর অন্তরে ও হৃদয়ে ছিল বিশিষ্ট স্থান। তবুও দেশ-জাতি নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির বিশ্ব মানবের মঙ্গল চিন্তা তাঁর রচনার সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে তাঁকে মানবতার কবি, সৃষ্টিতত্ত্ব ও তথ্যজ্ঞানী আখ্যা দেওয়া চলে।

এ স্থলে তাঁকে জীবনের কবি বলে দাঁড় করাবার একটা পটভূমি রচনা করা দরকার। সুপ্রাচীনকাল থেকে সাহিত্য-শিল্পের আদর্শ নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে একটা বিতর্ক চলে আসছে। সাধারণত সব মনীষী ব্যক্তিই সাহিত্য শিল্পের একটা বিশেষ লক্ষ্য এবং তার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে স্বীকার করে এসেছেন। কিন্তু নগণ্য কয়েকজন পন্ডিত এর ব্যতিক্রম সাহিত্য-শিল্পকে সর্ব বন্ধন থেকে মুক্ত দেখতে চান। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা এ বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে গেছেন, প্লাতো তাঁদের অন্যতম। গণতন্ত্র নামক

যে কবি নিজ প্রভাব নিয়োজিত করেন স্বজাতিকে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম থেকে বিরত রাখতে। ইকবালের দৃষ্টিতে তিনি হলেন মানসিক তস্কর বৈ নয়। তিনি এ বিষয়ে বলেছেন ঃ

দুর্ভাগ্য সে জাতির যারা মৃত্যুর মুখ থেকে সরে দাঁড়ায়,
আর যে জাতির কবি তাদেরকে জীবনের স্বাদ থেকে বিমুখ করে রাখে-
যে কবির দর্পণে কুশ্রীকে সুশ্রী দেখায়, যার কবিতার কুহক হৃদয়ে বিষাক্ত শর বিদ্ধ করে।
তার চুম্বন ফুলের স্নিগ্ধতা বিনষ্ট করে, বুলবুলকে ভুলিয়ে দেয় উড়বার স্বাদ।
জাগরণ অপেক্ষা নিদ্রাকে সে উত্তম মনে করে;
আমাদের অন্তরের উত্তাপ তার শ্বাসে ধুম্রাচ্ছন্ন হয়ে যায়।
তার সঙ্গীত মুছে দেয় তোমার প্রাণের আবেগ; বলতে কি,
শ্রুতিসুখে তুমি আসলে বিষপান করে থাক।
এমন অনেক বিষয় রয়েছে যারা কবিতার যাদু দ্বারা অন্তর্লোকে
ডাকাতি করে, আর শয়তানের মতো চোখকে ধোঁকা দেয়।

পক্ষান্তরে, যে কবি কোন মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে তা অর্জনের জন্যে সংগ্রাম করে যান, তিনি হলেন পয়গম্বরদের মহৎ গুণের উত্তরাধিকারী। ডঃ এইচ জেড গ্রিয়ার্সন ইকবাল ও মিলটন সম্বন্ধে মন্তব্যচ্ছলে উল্লেখ করেছেন;

একজন কবির স্বভাব আপাদমস্তক অনুসন্ধিৎসা,
তিনি হলেন জাতির আশা-আকাঙক্ষার ধারক ও বাহক।
জাতির কাছে কবির মর্যাদা দেহে আত্মার মতো;
কবিহীন জাতি মাটির স্তূপ বৈ আর কিছুই নয়।
যদি কবিতার উদ্দেশ্য মানুষ তৈরী করা হয়,
তবে কবি হলেন পয়গম্বরী ত্বরীক্বার উত্তরাধিকারী।

কবিতা কেন আবেগপূর্ণ হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে *জাবিদ নামার* এক স্থানে ইকবাল হিন্দী কবি ভর্তৃহরির মুখে বলিয়েছেন ঃ

ধরাপৃষ্ঠে কেউ জানে না কবির স্থান কোথায়, তার মন বাঁশীর কোন্ সুরে নাচে।
সত্যের সন্ধানেই রয়েছে আমাদের প্রাণের স্বাদ, আশা-উদ্দীপনার সরস গতি।
তুমি যে রয়েছ কথার দ্রাক্ষারসে মগ্ন; হায়! তুমি যদি সে স্তরে পৌছাতে!
এই মাটির পৃথিবীতে কবিতার দু'টি ছত্র বেহেশ্তের হুর
থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে যথেষ্ট।

স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইকবাল কবিতাকে মহৎ উদ্দেশ্যসূচক বলে মনে করতেন; এবং সেই উদ্দেশ্য হলো ঃ মানুষের মনকে আলস্যের নেশা থেকে মুক্ত করা এবং জীবনের মহৎ আদর্শাবলী অর্জনের পথে সংগ্রামমুখীন করে তোলা।

এ উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন ঃ

আমার গীতি সুর ও স্বরের তোয়াক্কা করে না,
আমি হলেম ভাবী কালের সুর।
আমার গীতি অন্য জগত থেকে উদ্ভূত,
এ ঘন্টাধ্বনির অনুসারী কাফেলাও ভিন্নতর।
ধন্য সে কোবিদকুল, যাঁরা মরেও মরেননি,
যাঁরা নিজেদের চোখ মুদিত করে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন!
আমার অন্তরদেশে লুকিয়ে রয়েছে বিদ্যুৎবহ্নি।
পর্বত আর মরুপ্রান্তর হলো আমার বিচরণ ক্ষেত্র।
যে রহস্য আমি উদ্‌ঘাটিত করতে যাচ্ছি, আর কেউ তা প্রকাশ করেননি,
আমার চিন্তাধারা সদৃশ মুক্তার মালা আর কেউ গাঁথেন নি।

পয়াম-ই-মশ্‌রিক কাব্যগ্রন্থের এক স্থানে জার্মান কবি গ্যেটের সাথে নিজের তুলনা করতে গিয়ে তিনি ইঙ্গিত করেছেন ঃ

মনকে যা ভাস্বর করে তোলে, আমি এনেছি তেমন সুর।
প্রেমকে আমি দান করেছি যৌবনৈশ্বর্য।
তাঁর জবাবে আমি প্রাচ্যবার্তা তাঁকে শুনিয়েছি,
প্রাচ্যের সন্ধ্যাকাশে একটি পূর্ণচন্দ্র উদিত করেছি।
তিনি জন্মলাভ করেছেন পুষ্পোদ্যানে, লালিত হয়েছেন সেই সুন্দর পরিবেশে।
আর আমি জন্ম নিয়েছি মৃত মৃত্তিকার কোলে।
অথচ ফুলের পাপড়িও আমার বচনে রক্তাভা লাভ করে।
আমার কবিতার প্রতি ছত্র এক একটি অন্তর শোনিতের ধারা রূপ।

সমকালীন প্রতিটি চিন্তাশীল ও অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির সাথে সাথে তিনিও সাম্রাজ্যবাদপিষ্ট প্রাচ্যবাসীর দূরবস্থার দরুন অত্যন্ত উদ্বেগাকুল ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ দীর্ঘ কবিতা *পস্‌চে বায়েদ কর্দ্* আয় আক্‌ওয়াম ই শর্ক্। (হে প্রাচ্যবাসী! অতঃপর তোমাদের কী কর্তব্য?) এর এক স্থানে আবিসিনিয়ার ওপর ইতালীর আক্রমণকে কেন্দ্র করে তিনি যা লিখেছেন, তা এর একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। অপর পক্ষে যে- সব ব্যক্তি পূর্বসূরীদের অনুকরণে জনসাধারণের বা শাসকগোষ্ঠির মনভোলানো কবিতা চর্চায় লিপ্ত ছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে তিনি তীব্র শ্লেষ বর্ষণ করেছেন। প্রার্থনাকুল অন্তরে তিনি এ সম্পর্কে বলেছেন ঃ

যে রহস্য আমি প্রকাশ করতে চাই, তা উপলব্ধি করবার সময় তাদের আসেনি।
হে উম্মতের কান্ডারী! আমি তোমার কাছে ফরিয়াদ জানাই।
বন্ধুরা আমাকে একজন গায়কমাত্র মনে করে।
তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছ চিরন্তন জীবনের সন্ধান করতে,
মৃত মানুষের কর্ণরন্ধ্রে জীবনের বাণী পৌঁছিয়ে দিতে।
কিন্তু এ অন্ধ সত্যভ্রষ্টের দল আমাকে ফরমায়েশ করে

অমুকের জন্ম তারিখ, অমুকের মৃত্যু তারিখ নিয়ে কবিতা রচনা করতে!
এদের প্রত্যুত্তরে ইকবাল বলেছেন ঃ

পার্থিব নিশ্বাস থেকে আমি আবেগ ও রং আহরণ করি না।
তোমার ভাস্বর কিরণই, হে প্রভু! আমার জীবনের পুষ্টি।
আমার দৃষ্টি চাঁদ সিতারারও অনেক উর্ধ্বে।
ব্যক্তিবিশেষের মর্জিমাফিক আমি কথা বলি না।

স্বদেশীয়দের অনুভূতিহীনতার প্রতিবাদে তিনি বলেছেন ঃ

হায়! আমার দেশবাসী আমার ভাবাবেগের স্পর্শ নিলো না।
আমি ঢেলে দিলেম যে মৃতসঞ্জিবনী সুরা-
তা উত্তপ্ত মরুর শুকনো মাটিতে গড়িয়ে গেলো,
কোনো কাজে আসলো না সব গোল্লায় গেলো।
হিন্দুস্তানের মাটির কাছে আমার মর্মস্পর্শী সঙ্গীত বৃথা গেলো-
কেননা, দাউদী সুর ঝঙ্কারও মৃতকে জীবন দানে সমর্থ হয় না।

তাঁর মতে, কবিতাই হোক বা গদ্যই হোক তার সার্থকতা সৃজনশীল মনোভাবের বাহন হিসেবে। তবে, মানব মনের ভাবোচ্ছ্বাসের জন্যে কবিতাই শ্রেষ্ঠতর বাহন, আর এর জনপ্রিয়তাও অধিকতর। তিনি বলেন ঃ

এ বাহানায় আমি এ মঞ্চে কোনো হৃদয়বান বিহঙ্গের সন্ধান করি মাত্র।
এ উদ্দেশ্যেই গযল গান গেয়ে যাই এবং মৈত্রীর বার্তা পরিবেশন করি।
কোথায় আমি? কোথায় আমার সঙ্গীতের ধ্বনি?
এ সুরেলা কথার ধারা একটি উপলক্ষ্য বৈ নয়।
বল্‌গাহীন উটগুলোকে সারিবদ্ধ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।
এ যুগ সুস্পষ্টোক্তির যুগ বটে, কিন্তু আমি একটু ইঙ্গিতেরই কথা বলি।
বলতো, এ অযোগ্য সাথীদের নিয়ে আমি কোথায় যাব।

আসরার-ই-খুদীর এক স্থানে তিনি বলেছেন ঃ

এ মস্‌নবী রচনার উদ্দেশ্য কাব্য চর্চা নয়-
মূর্তিপূজা বা মূর্তি গড়াও নয়।

এসব থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, ইকবাল সেই মনীষী গোত্রের একজন, যাঁদের রয়েছে নিজস্ব দর্শন, রয়েছে মহৎ লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে অন্যতর উদাহরণ হলেন নাসির খসরু, যিনি স্বধর্ম ও নিজ মতাদর্শ প্রচারের জন্যে কবিতাকে হাতিয়াররূপে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি যা বলতেন তাতে তাঁর অটল বিশ্বাস ছিল; তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁর কবিতা হলো তাঁর মনোভাবের বিশ্বস্ত অভিব্যক্তি। অবশ্য এর যুক্তিযুক্ততা গুণ পাঠককেও প্রবলভাবে আকর্ষণ করে থাকে।

এখন আমরা অনুধাবন করতে পারি ঃ ইকবাল তাঁর কাব্যে কি শিক্ষণীয় বিষয় সন্নিবেশিত করেছেন এবং স্বদেশবাসীকে কোন্ পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করেছেন।

ইকবাল জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, একদিকে তিনি যেমন প্রাচ্যের তাহ্যীব-তমদ্দুন ও ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন, তেমনিই প্রতীচ্যের সংস্কৃতি-সভ্যতার সাথেও তাঁর পরিচয় ছিল অসাধারণ। এমন এক যুগ-সন্ধিক্ষণে তাঁর জন্ম, যখন প্রাচ্যের কোনো কোনো জাতি আযাদী সংগ্রামে রত, অথচ তাঁর স্বজাতি পরাধীনতার শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী। ইরানের আংশিক বিপ্লব, তুরস্কের পরিবর্তিত পরিস্থিতি, আরব জাতিসমূহের আযাদী সংগ্রাম এবং রুশ সাম্রাজ্যের ওপর জাপানের বিজয় লাভ ইত্যাদি ঘটনাপ্রবাহ তাঁর অন্তরে প্রচন্ড দোলা দিয়েছিল। অন্যদিকে, তিনি অনুভব করলেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা যতই বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করছে, ততই আধ্যাত্মিক চিন্তা থেকে সে দূরে সরে যাচ্ছে। যুদ্ধবিগ্রহ, বর্ণ-বিদ্বেষ, রাজনৈতিক কোন্দল দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে দেখে তিনি নিরাশ হয়ে পড়ছিলেন। এই সঙ্কট মুহূর্তে তিনি স্বদেশবাসীর দুর্দশা মোচনে সচেষ্ট হয়ে তাদেরকে নির্ভুল পথে পরিচালিত করবার প্রয়াস পেলেন।

'বন্দেগী নামা' কাব্যে তাঁর অন্তরে পরাধীনতার তীব্র বেদনা ও তৎকালীন প্রাচ্যবাসীদের করুণ অবস্থা রূপায়িত হয়েছে। যে কাব্য শিল্প বা সঙ্গীত বিদ্যা জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম, তা যে কতোখানি ব্যর্থ, তিনি তা প্রকাশ করেছেন নিম্নের কয়েকটি ছত্রে ঃ

পরাধীনতায় মানব মন দেহের অভ্যন্তরেই মৃত্যুবরণ করে,
মানুষের আত্মা দেহের ওপর বোঝা হয়ে থাকে।
পরাধীনতা যৌবনকে স্থবিরতায় পর্যবসিত করে,
পরাধীনতায় বনের সিংহ দন্ত নখর হারিয়ে ফেলে।
পরাধীনতা জাতিকে শতধাবিচ্ছিন্ন করে দেয়,
পরস্পরে দ্বন্দ্বে লিপ্ত করে।
পরাধীনতা মুমিন পুরুষকেও উপবীত ধারণে বাধ্য করে,
তার মূল্যবান হিরক নিষ্প্রভ হয়ে যায়।
পরাধীনতা রুচিকে করে বিকৃত; তাই বিষ দংশনকে মনে হয় মধুবর্ষী।
পরাধীন ব্যক্তি হয়ে থাকে জীবন্মৃত; তার মৃতবৎ দেহ তার
নিজের স্কন্ধেই বোঝা স্বরূপ।

কুরআনের বাণী ঃ "অবশ্যই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না সে নিজেই নিজ অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে"- অনুযায়ী স্বদেশবাসীর চিন্তার রাজ্যে বিপ্লব সৃষ্টি করে ইকবাল তাদেরকে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেন এবং তদনুসারে অন্যান্য নেতৃবৃন্দও সে পথে এগিয়ে আসেন। নিজেদের অক্ষমতার জন্যে অন্যদের প্রতি বিরূপ ভাবের সাধারণ প্রবণতাকে তিনি নিন্দা করেছেন ঃ

নিজেদের দিকে লক্ষ্য কর, অন্য জাতির বিরুদ্ধে অভিযোগে কি ফল?
তোমার দৃষ্টিতে পরিবর্তন আসলেই সারা বিশ্ব অন্যরূপে দেখা দেবে।

এই মহৎ লক্ষ্য অর্জনই ছিল ইকবালের শেষ মন্‌যিল। তাঁর বিখ্যাত গদ্য গ্রন্থ *'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন'* ও অন্যান্য কাব্য গ্রন্থের ভাবধারার মধ্যে আমরা গভীর সাদৃশ্য দেখতে পাই। বলতে কি, তাঁর প্রতিটি রচনায় তাঁর চিন্তাধারার এ মৌলিক প্রভাবটা প্রচ্ছন্ন। প্রাচ্যের জনগণের বিশেষ করে, মুসলমানদের মঙ্গল চিন্তা, সঙ্কটকালে তাদের ঐক্য, সক্রিয় সংগ্রাম, পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্নকরণ এবং সভ্যজগতে নিজেদের স্থান অর্জন ও সাথে সাথে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যজগতকে নতুন আধ্যাত্মিক জীবনে দীক্ষা দান ইত্যাদিকে তিনি নিজের মহান ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। নিজ জাতিকে সাহস-শৌর্য-বীর্যের পথে এগিয়ে নিতে গিয়ে তিনি বলেছেন ঃ সংগ্রাম ও অনুসন্ধিৎসাই হলো জীবন। বস্তুত, একাধিক কবিতায় তিনি এ মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

সংগ্রামই জীবন ঃ আইনের অধিকার বলে জীবন লভ্য হয় না।
তা ব্যক্তিগত ও পারিপার্শ্বিক বিষয়াদির জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়।
ভাগ্যবান সে জাতি যার প্রাণে আকুলি বিকুলি দেখা দিয়েছে,
এবং যে নিজ মৃত্তিকা থেকে জীবন আহরণে সমর্থ হয়েছে।
আরশ্‌বাসীরা ঈদের প্রভাত উদ্‌যাপন করে তখনই,
যখন কোনো জাতির সুপ্তচোখ উন্মীলিত হয়।
তোমার অগ্নিপ্রবাহেই তো যিন্দেগীতে দেখা দেয় আবেগ;
এক নব বিশ্ব সৃষ্টির দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত।
নৈরাশ্য ঘটায় অপঘাত ও চিরমৃত্যু।
গা বাঁচিয়ে চলার নাম মৃত্যু- যেমন দুনিয়া থেকে আত্মগোপন করা।
দুনিয়াতে বীরোচিত জীবন যাপন করতে না পারলে
বীরের ন্যায় প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই তো জীবনের আর এক রূপ!

তিনি আরও বলেছেন ঃ

সিদ্ধপুরুষ খিযির সম্রাট সিকান্দরকে এক নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান দানচ্ছলে বলেন ঃ
জল ও স্থলের সকল আবেগ-অনুভূতির তুমি সাথী হও।
এ যুদ্ধ দ্বন্দ্ব তুমি সাগরপারে বসে অবলোকন করছ;
তা ঠিক নয় বরঞ্চ তুমি রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়,
প্রাণ দিয়ে দাও এবং বেঁচে ওঠো।
তুমি সমুদ্র সৈকতে মঞ্চনির্মাণ করো না- যাতে জীবনের ধ্বনি ক্ষীণ হয়ে যায় ঃ
সমুদ্রবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়, উত্তাল তরঙ্গের সাথে মিশে যাও।
অনন্ত জীবন নিহিত রয়েছে বিরামহীন সংগ্রামে।

ইকবাল এসব উৎসাহব্যঞ্জক বাণী বিভিন্ন আকারে তাঁর জাতির কর্ণকুহরে পৌঁছিয়েছেন। নিজ জাতিকে তিনি শাহীন-এর মতো ঊর্ধ্বাকাশে বিচরণের উপদেশ দিয়েছেন ঃ কারণ এ মৃত্তিকাস্তূপে খড়কুটা সন্ধান করা নিরর্থক। মিল্লত্‌কে তিনি তীক্ষ্ণ তরবারী সদৃশ মনে

করতেন; তাই তিনি তাকে উপদেশ দিয়েছেন কোষমুক্ত হয়ে নিজ শৌর্য প্রদর্শন করতে। তাঁর এক কবিতায় শাহ বায শাবককে উপদেশ দিচ্ছে ঃ

বীর বিক্রমশালী হয়ে বেঁচে থাকো।
ভূ-পৃষ্ঠস্থ ক্ষুদ্র শস্যকণা সন্ধান করা তোমার জন্যে অপরাধ-
কেননা, আমাদের খোদার দেওয়া রাজ্যসীমা এ নভোমন্ডলব্যাপী।

আর এক স্থানে এক হরিণ অন্য হরিণকে উপদেশ দিচ্ছে;

যদি সত্যিকার জীবন তোমার কাম্য হয়ে থাকে,
তবে সঙ্কটের মধ্যেই জীবন যাপন কর।

তাঁর মতে, সংগ্রাম ও সাধনাই হলো জীবনের অপর নাম; অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

প্রাণের আবেগ-উচ্ছ্বাসের অথবা আশার আকাশ দিগন্তে উড্ডয়নের নামই জীবন।
সুতরাং নিরাপদ নীড় সন্ধান জীবনের স্বভাব বিরুদ্ধ।

তিনি বলেছেন ঃ

শরগ্রহণযোগ্য বুক থাকলে এ দুনিয়াতে বাজপাখীর মতো মর আর বাঁচ।
জীবনের রীতিনীতিই বা কি?
মুহূর্তের সিংহ জীবন মত যুগের ছাগজীবনের চেয়ে অধিক মূল্যবান।
তুমি জীবন্ত, তাই আকাঙক্ষায় উদ্বুদ্ধ হও।
যে জগত তোমার অনুকূল হয় না, তাকে চুরমার করে দাও।
সৃষ্টিশীল হও, দিগ্বিজয়ী হও,
তোমার পসন্দ মতো জগত সৃষ্টি কর।
সত্য পুরুষ। তীক্ষ্ণ তরবারীর মতো হও।

কখনও উপাখ্যান ও কাহিনীর মাধ্যমে, কখনও বা আধ্যাত্মিক পর্যটন ইত্যাদি অবলম্বন করে তিনি তাঁর শিক্ষা ও মতবাদ প্রকাশ করতে ব্রতী হয়েছেন। *'জাবিদ নামা'য়* তা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ স্থলে *মৌয ও দরিয়া* সম্পর্কীয় দৃষ্টান্তটার বর্ণনাভঙ্গি ও বিশ্লেষণ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই কত অভিনব পন্থা অবলম্বন করে ইকবাল সমসাময়িক মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

মৌয-এর মতো খুদীতে মত্ত হয়ে ঝড় তুফানের সাথে মাথা ঠোকো,
কে তোমাকে পরামর্শ দিয়েছে চাদর গুটিয়ে থাকতে?

তিনি আরও বলেন ঃ

অবিরাম সংগ্রামের নামই জীবন,
মৌয-এর উদ্যম তার অস্তিত্বের মূল রহস্য।
এক কুম্ভীর তার শাবককে উপদেশ দিচ্ছে ঃ
আমাদের ধর্মে সাগরতীরে বসে থাকা হারাম।
মৌয-এর সাথে মিশে যাও। সাবধান কূলে যেয়ো না।

সারাটি সাগরই তো আমাদের নিবাস।
তোমার কি জিজ্ঞাস্য ঃ আমি কোথা থেকে এসেছি?
আমি কে?
আমি নিজের মধ্যে ডুব দিয়েই জীবন লাভ করেছি।
এই সমুদ্রে আমি মৌয-এর মতোই উত্তাল।
যদি আমি নিজের মধ্যে হারিয়ে না যাই, তবে আমি কিছু না।
শঙ্কাহীন চিত্তের সামনে সিংহও একটি তস্‌বীর মাত্র।
শঙ্কিত চিত্ত হরিণকেও সিংহ বলে ভুল করে।
যদি তুমি অকুতোভয় হও, তবে সাগরকেও তোমার মরুভূমি বলে মনে হবে;
আর যদি ভীত-সন্ত্রস্ত হও, তা হলে সমুদ্রের প্রতিটি তরঙ্গকে কুম্ভীর বলে মনে হবে।
সাগরতীরবাসী বলে ঃ দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হলো,
কিন্তু জানলাম না আমি কে।
একটি উত্তাল তরঙ্গ দ্রুতবেগে যেতে বলে গেলো ঃ
যতক্ষণ আমি গতিশীল, ততক্ষণই আমি জীবন্ত;
আর গতি স্তব্ধ হলেই আমার মৃত্যু।

নহরের নিস্তেজ স্রোত তাঁকে ভাবিত করে তোলে। *‘পয়াম-ই-মশরিক’*-এ সম্ভবত গ্যেটের *মুহম্মদের গান*-এর অনুকরণে ইকবাল এক স্থানে বলেছেন ঃ

তুমি অকূল সাগর হয়ে বেঁচে থাকো, কি দুর্বার গতিতে চলে সে।

ইকবাল দর্শনের মূল লক্ষ্যই হলো মানবজাতির নিদ্রাভঙ্গ করা, তাকে কর্মচঞ্চল করে তালা, আযাদী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা, শৌর্য-বীর্যে অনুপ্রাণিত করা, পরাধীন জাতিকে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া। যে সঙ্গীত, যে সুর তিনি ধ্বনিত করেছেন, তার মর্ম হলো ঃ

হে তেজস্বী বীর সৈনিক। আগুয়ান হও।
আমাদের মন্‌যিল সুদূর নয়।
কবি নযীরীর
তার ঔরস থেকে এক পুরুষ সিংহ জন্ম নেবে,
অথবা
যে ব্যক্তি সত্যের পথে নিহত হয়নি, সে আমাদের নয় - ইত্যাদি বাক্য তিনি অত্যন্ত পসন্দ করতেন।

পয়াম ই মশ্‌রিক-এ তিনি বলেছেন ঃ

আমি প্রেমের বিশ্বে এখনও মুকুল মাত্র,
যা মলয় সমীরেও দোলে;
কিন্তু কর্মের ক্ষেত্রে আমি এক অটল শিলার মতো।

ইকবাল তাঁর সমগ্র কাব্যে পুরাতন ধ্যান-ধারণার ছাঁচ ভেঙ্গে এক অভিনব কাব্যরীতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছেন এবং এ কথা তিনি বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে পাঠকমহলকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। অন্যদিকে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যদর্শনের মৌল তত্ত্বাবলীকে গভীর অভিনিবেশ সহকারে বিচার-বিশ্লেষণ করে তিনি তাঁর খুদী তত্ত্বের উদ্ভাবন করেছেন। এ মতবাদ অনেকটা উনবিংশ শতকের ইউরোপীয় দার্শনিকদের Ego বা Moi দর্শনের মতো। এ স্থলে এ মতবাদ আমাদের আলোচ্য নয়। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, ইকবাল বর্তমান মানবতাকে এ কথা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য হলো নিজ ব্যক্তি সত্ত্বার ওপর নির্ভর করতে শেখা। যতক্ষণ মানুষ আত্মপরিচয় লাভে সমর্থ হবে না এবং নিজ অস্তিত্বের মূল্যবোধ তার অন্তরে জাগবে না, ততক্ষণ সে সত্যিকারভাবে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে না। প্রকৃত জীবনের স্বাদ থেকে সে ততদিন বঞ্চিত থাকবে। তাঁর মতে, খুদীবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হলো আত্মপরিচয় , আত্মশুদ্ধি, প্রকৃত জীবনের মূল্যবোধ এবং উচ্চমানের আশা-আকাঙক্ষার উন্মেষ। পক্ষান্তরে যে শিক্ষা-দীক্ষা ও শিল্প-সাহিত্য ব্যক্তির মূল্যবোধকে ক্ষীণ করে দেয়, তাঁর দৃষ্টিতে তা তুচ্ছ ও নিন্দ্য। তিনি বলেন ঃ

খুদী হলো অস্তিত্বের রূপকার।
পরিদৃষ্ট সব কিছুই খুদীর অদৃশ্য হস্তের লীলাখেলা।
জীবন নিহিত অধ্যবসায় ও সাধনার মধ্যে,
তার মূল শিকড় আকাক্ষার ভিতর।
বক্ষস্থ অন্তর আনন্দে নৃত্য করে আশা-আকাঙক্ষার স্পন্দনে।
আশার আলোকচ্ছটায় হৃদয়মন আরশীর ঔজ্জ্বল্য লাভ করে।

আসরার ই খুদীতে তাঁর এ দর্শনের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা রয়েছে। তাঁর দৃষ্টিতে, যে ব্যক্তিত্বের সামনে কোনো মহৎ লক্ষ্য নেই, নেই কোন আশা-আকাঙক্ষা, সে জীবিত নয়, বলা যায় জীবন্মৃত। অনুরূপ ব্যক্তিবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত জাতির কোনো স্বাধীন ইচ্ছা বা সার্বভৌম সত্ত্বা থাকতে পারে না। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, প্রত্যেক রকমের আকাঙক্ষাই কাম্য ও শ্রেয়। খুদীকে খোদ খাহী ও খোদ পরাস্ত **(স্বার্থপরতা ও আত্মপূজা)**-এর সাথে এক করে দেখা অন্যায়। মানুষ আত্মবোধজনিত শক্তিবলে সঙ্কটকাল ও নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং অবনতির অতল গহ্বর থেকে উন্নতির উচ্চ শিখরে উন্নীত হতে পারে। অন্য কথায়, ইকবাল মানুষকে তাঁর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু বলে প্রতিপন্ন করেছেন ঃ

হে বাজপাখী তুমি পুষ্পকাননে নীড় প্রস্তুত করেছ,
এতেই তো আমি শঙ্কিত।
কেননা, বাগানের স্নিগ্ধ সমীরণ প্রবাহ তোমার উড্ডয়নশক্তি হ্রাস করে দেবে।
তুমি ধুলিকণা হয়ে আছ এ হেন আরাম-আয়েশ তোমার নয়।
প্রভাত সমীরণের সাথে মিশে যাও, পথপ্রান্তে বসে থেকো না।
নীহারিকার কক্ষপথ অতিক্রম করে যাও,

এমন কি, আকাশের নীল ছাউনিটাও পার হয়ে যাও।

মনযিলে বসে থাকলে মনের মৃত্যু হয় হোক না সে মনযিল চন্দ্রলোক।

মিল্লাত-এর প্রতিটি সদস্য যখন এহেন চিন্তায় মগ্ন হয়- স্বয়ং মিল্লাত ই খুদীর সৃষ্টি করে, তখন সকলে মিল্লাত-এর সাথে একাত্ম হয়ে যায় এবং তার আর কোন সমস্যা থাকে না। এই সেই রহস্য যা তিনি রমূয-ই-বেখুদী বাক্যগ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

মন হলো শত্রুতা ও মিত্রতার কেন্দ্রস্থল।

পারস্পরিক সম্পর্কই প্রেরণাকে তীব্রতর করে।

জনগণের অন্তরের ঐক্যই মিল্লাত-এর প্রাণ।

পরস্পরের সদৃশ আলোক সমাহারেই আলোকিত হয় মিল্লাত বক্ষ।

জাতির চিন্তাধারা একই হওয়া চাই, আর চাই অন্তরের আশা-উদ্দীপনার ঐক্য।

এ পর্যায়ে এসে ইশ্‌ক্ (প্রেম)-এর অর্থ হয় আত্মবিলোপনের মাধ্যমে পারস্পরিক বন্ধনের সেতুতে পরিণত হওয়া। এতেই ব্যক্তিগত খুদী হয় দৃঢ়মূল ও দীর্ঘস্থায়ী। কবি বলেন ঃ

সেই উজ্জ্বল বিন্দুটির নাম হলো খুদী,

যা আমাদের মৃন্ময় দেহের অভ্যন্তরে বিরাজ করে অগ্নি স্ফুলিঙ্গরূপে।

প্রেমই তাকে দেয় স্থায়িত্ব, জীবনী শক্তি, প্রদাহ ও দীপ্তি।

প্রেম থেকে বহ্নিশিখা আহরণ করাই তার স্বভাব।

প্রেম থেকেই সে অর্জন করে বিশ্বকে আলোকিত করবার শক্তি।

প্রেম আদৌ ভয় করে না তলোয়ার বা খঞ্জরকে।

কারণ প্রেম আব খাক বাত জাত বস্তু নয়।

প্রেমই শিক্ষা-দীক্ষা ও কৃষ্টি সভ্যতাকে নির্মল করে

–এবং প্রস্তর খন্ডকে মুকুররূপ দান করে।

এ সব থেকে প্রতিভাত হয় যে, ইকবালের মতে, আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে ভাগ্যাহত করে সৃষ্টি করেননি; বরং প্রত্যেক জাতিরই কর্তব্য নিজ ভাগ্যলিপি নিজ হাতে রচনা করা এবং নিজ উদ্যোগে দুর্ভাগ্যের অতল গহ্বর থেকে পরিত্রাণ লাভ করা। এতদনুসারে তিনি তাঁর জাতির জন্যেও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা পোষণ করতেন ঃ

আমি পুরাতন মাটিতে জীবনের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি,

এর প্রতিটি অণু পরমাণুর চক্ষুকে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দেখছি।

দেশবাসী জনগণের সমন্বয়ে তিনি এক নতুন জাতি ও নতুন যিন্দেগী সৃষ্টির চিন্তায় বিভোর থাকতেন। তাই তিনি বলেছেন ঃ

খোদা সেই জাতিকে নেতৃত্ব দান করেন যে জাতি নিজ ভাগ্যলিপি নিজের হাতে লিখে।

সেই মিল্লাত-এর সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই

যার কৃষককুল পরের জন্যে শস্যোৎপাদন করে।

তাঁর এই জীবনবাদ দীর্ঘকাল ধরে আযাদী বঞ্চিত এবং-সাম্রাজ্যবাদের মরণ ছোবল কাতর হিন্দুস্থানবাসীর (ইকবালের ভাষায় ঃ যাদের মন আছে বটে; কিন্তু সামনে কোনো আশার আলোক নেই, নেই মহৎ লক্ষ্য) অন্তরে অন্তরে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করলো। প্রথম দিকে ইকবাল কোনো বিশেষ জাতিকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেন নি; বরঞ্চ সাধারণভাবে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ছিল তাঁর লক্ষ্য; এমন কি, তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত মানব জাগ্রত হোক। বিশেষতঃ বর্ণ-বৈষম্য ও আঞ্চলিক ভেদাভেদমুক্ত মুসলিম জাতিপুঞ্জকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল তাঁর উপস্থিত উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে জামালুদ্দিন আসাদাবাদী ছিলেন তাঁর পথপ্রদর্শক। তিনি বলেছেন ঃ

আমরা কেউ হেজাযী, কেউ চীনা, কেউ বা ইরানী;
আসলে কিন্তু আমরা একই উজ্জ্বল প্রভাতের শিশিরবিন্দু।
আমরা বৎহা উপত্যকা (হেজাজ ভূমি)-এর সেই মহান সাকীর প্রেমিক,
দুনিয়ার সরাইখানায় আমরা পরস্পরের শরাব ও পানপাত্রের মতো।

তিনি কামনা করতেন যে, প্রাচ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু অভাব রয়েছে, তা আহরণ করে নেওয়া হোক এবং সেভাবে নিজ স্বকীয়তা বজায় রেখেও প্রাচ্য ভূমি পাশ্চাত্যের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াক। সাথে সাথে তিনি অন্ধ পাশ্চাত্য-প্রীতির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তাঁর কথায় ঃ

ফিরিঙ্গী জাতি চোখ ঝলসানো শিল্পকলা উদ্ভাবন করে
একটি বিন্দুকে বিশাল সমুদ্রে রূপান্তরিত করতে পারে।
কিন্তু হায়! অধ্যাত্মজগতের চতুস্পার্শ্বে সে মরণবৃত্ত এঁকে নিয়েছে।
বস্তুতঃ তার সব জ্ঞান-বিজ্ঞান মৃত্যুর পরওয়ানা নিয়ে অগ্রসরমান।
প্রাচ্য জাতিপুঞ্জ সত্যের সন্ধান রাখে বটে;
কিন্তু বহির্জগতের প্রতি তার ভ্রূক্ষেপ নেই।
পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দ বহির্জগতের মধ্যেই গুম হয়ে আছে,
কিন্তু সত্য থেকে তারা পলায়নপর।
ছল-বল-কৌশলই পাশ্চাত্য জাতিবৃন্দের ইহজীবনের মূলধন।
কিন্তু প্রাচ্যবাসীর জাতীয় জীবনের মূলধন হলো বিশ্বপ্রেম।
হায়! যদি প্রেম ও নৈপুণ্যের সমন্বয় সাধিত হতো!
তবে এ বিশ্বের চেহারার সত্যি সত্যি অন্য রূপ নিতো।

তিনি একান্তভাবে কামনা করতেন যে, প্রাচ্যবাসী আত্মমূল্যবোধ সম্পর্কে অবহিত হোক, যাতে বিজাতির হাতে লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাদের মনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করে তারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণকেও অবশ্য তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং সাথে সাথে নিজেদের মহত্তর মূল্যবোধ সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন ঃ

ফিরিঙ্গী বৈজ্ঞানিকদের শিক্ষা-দীক্ষা আমার স্বার্থপরতার মাত্রা বৃদ্ধি করেছে;

কিন্তু আমার অন্তরকে আলোকিত করেছে
অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সূফী-সাধকদের সাহচর্য্য।
বন্ধ কর সেই সংগীতের গুঞ্জন-যা আব-খাক থেকে উদ্ভূত;
হে আত্মহারা! মুক্ত হও পরের সুরের মোহ থেকে।
আবার–
হে কর্মোদ্যত যুবসংঘ! জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্যে চাই কি?
মস্তিষ্ক–ফিরিঙ্গী পরিচ্ছদ নয়।

যা হোক, প্রাথমিক কর্ম-জীবনে ইকবালের আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল একটি হিন্দুস্তানী জাতি গঠনের। এতে অন্যান্য মুসলিম জাতীয় নেতৃবৃন্দেরও সহায়তা ছিল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হচ্ছে না দেখে তিনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় *মুসলিম লীগ*-এর বার্ষিক সম্মেলনে হিন্দুস্তানের মুসলমানদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই মহৎ প্রস্তাবের রূপায়ণ স্বরূপই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখের স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলো। অতএব পাকিস্তানীরা যদি উপমহাদেশের মুসলমানদের দিগ-দিশারী বলে ইকবালকে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে স্মরণ করেন এবং প্রতি বছর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের আয়োজনে আমাদেরকে সমবেত হবার সুযোগ দেন, তবে তা আদৌ অযৌক্তিক হবে না, বরং যথাযোগ্য কাজই হবে। বস্তুত ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের নব জাগরণের মূলে তাঁর দান উপমাহীন।

ইকবাল তাঁর খুদী-দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেছেন ইসলামের সরল নীতির উপর। তাই দেখা যায় যে, যে ক্ষেত্রে তিনি হিন্দুস্তানী মুসলমানদেরকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে আযাদী সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করেছেন, সে ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষাও তাতে ফুটে উঠেছে। তাঁর দর্শনের বিস্ময়কর দিক এই যে, তাঁর চিন্তায় ও কাজে মানুষের আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক দু'দিকেরই অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় দার্শনিক। তাঁর কর্মবাদ ছিল দৃপ্ত ও দুর্দম ঃ

কুঠারাঘাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দাও ভূঁইফোঁড় ভিত্তিহীন যত কিছু;
সময় সংকীর্ণ, আর কাল দ্রুত পরিবর্তনশীল।
পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ্‌দের এমনভাবে আঘাত হানো–
যাতে তারা না বুঝতে পারে আগুন কি কুঠার থেকে নিঃসৃত হচ্ছে,
না–পাথর থেকে।
সারা প্রতীচ্যই পথপ্রান্তের ধূলি সদৃশ,
অথচ সুরবিহীন ক্রন্দন আর আবেগ-বর্জিত আহা-ধ্বনি আমার!
ঐ মাটির প্রতিটি কণা এক একটি মুদিত নয়নবিশেষ।
জাগ্রত হও হিন্দুস্তানের! সমরকন্দ ইরাক ও হামাদানের মানুষ
জাগো অঘোর নিদ্রা থেকে, জাগো! জাগো!

একদিকে তিনি আল্লাহর বিধানের অন্তর্নিহিত রহস্যের সন্ধান পেলেন সঙ্কটের মধ্যে জীবন-যাপনের মাহাত্ম্যে, অন্যদিকে পুঁজিবাদী সমদুর জীবনের বৈষম্যও তাঁর অন্তরকে কঠোরভাবে পীড়িত করে তুললো। তিনি গাইলেন ঃ

ইস্পাত নির্মাণের কারখানায় কোলাহল সৃষ্টি হয় আমাদ্বারা,
আর গির্যাস্থ পলাশডালে বসা বুলবুলের গান শোনার অধিকারী হও তুমি!
এ ভূমন্ডল ও তার গর্ভস্থ সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আমার,
কিন্তু ভূমন্ডল থেকে আরশ-ই-মুআল্লা পর্যন্ত সব কিছুই আজ তোমার ভোগ দখলে।

'জাবিদ নামা'য়-নভোভ্রমণ ব্যপদেশে শনিগ্রহে বাংলার মীর জাফর ও দাক্ষিণাত্যের মীর সাদেকের সাথে সাক্ষাৎকারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এঁদের কার্যক্রমেই ভারতবাসীকে প্রায় দুইশ' বছর ইংরেজ জাতির দাসত্বে জীবনযাপন করতে হয়েছে। ইকবাল এঁদেরকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখেছেন এবং মানবতার কলঙ্ক, ধর্মের কলঙ্ক, দেশের কলঙ্ক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ ভ্রমণকালে তিনি উভয়কে দেখেছেন রক্তগঙ্গায় হাবুডুবু খেতে খেতে জীবনযাপন করতে ঃ

সে তরীতে দু'জন লোক উপবিষ্ট।
দু'জনেরই শরীর উলঙ্গ, মুখ ফ্যাকাশে এবং কেশরাজি বিস্রস্ত।

তিনি পর্দানশীল মুসলিম নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রশংসা করে বলেছেন ঃ

তোমাদের আবরণ আমাদের ইয্যতেরই আবরণ,
তোমাদের আলো আমাদের প্রদীপের পুঁজি,
তোমাদের মায়া-মমতা উৎকর্ষ সাধন করে
আমাদের ব্যবহার, আমাদের চিন্তা, আমাদের বাক্শক্তি ও কর্মশক্তির।
তোমরা জাতির খর্জুর ক্ষেতের জলধারা,
মিল্লাত-এর মূলধনের প্রহরী,
যুগের অত্যাচার থেকে নিজ সন্তানদের রক্ষা কর!
নারী ও পুরুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িত,
আশার জগতের বাস্তব রূপদান দু'জনারই সমদায়িত্ব।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে, খুদীর উৎকর্ষ সাধিত হলে মানুষ যে কোনো সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, যে কোনো ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে, এমন কি আল্লাহ্র নিকটও নিজ মূল্য দাবী করতে পারে। ইসলামের আলোতে এ পথ অবলম্বন করা সত্যিকারের মুসলিমের পক্ষে এবং মুসলিম জাতির পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক বলে তিনি মনে করতেন। একজন দূরদর্শী দিশারীর ন্যায় তিনি-স্বজাতিকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে; এ সামান্য জীবনকাল গোলামীতে অতিবাহিত করা কদাচিৎ উচিত নয়। অতএব স্বাধীন ও স্বাবলম্বী জীবনযাপনের পথে যে কোনো বিপদের ঝুঁকি নেওয়াই একান্ত কর্তব্য। তিনি বলেন ঃ

যিন্দাদেলের ন্যায় জীবন-যাপন নিতান্তই কষ্টসাধ্য,
আমি কা'বার রাস্তায়ও চলিনি, যেহেতু তা প্রতিবন্ধকতা ও শ্রমসাধ্য নয়।

শিলার বলেছেন যে, প্রকৃতি সৃষ্টি জগতের বিকাশ ঘটায়; কিন্তু শিল্পবিদ্যা মানুষের বিকাশ ঘটায়। ইকবাল এ আদর্শ সামনে রেখেই জাতিকে পথপ্রদর্শন করেছেন। তাঁর কথায়, তাঁর প্রধান ব্রত হলো 'আদম-গরি' বা মানুষ তৈরি করা। তিনি দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন, পৃথিবীর বুকে আযাদ হয়ে বেঁচে থাকা ও আযাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণের যথাসাধ্য প্রয়াস পেতে। যে আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করতেন, তাঁর জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে তা সফল করেছে। তৎকালীন ভারতের দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইকবাল কাব্যকে 'সমগ্র বিশ্বের সম্পদ' বলে অভিহিত করেছেন এবং ইকবালের মৃত্যুকে 'এক বিরাট ক্ষতি' বলে উল্লেখ করেছেন। এ উক্তি মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। ক্বায়েদ-ই-আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ইকবালকে শুধু যে বন্ধু মনে করতেন, তা নয় পথপ্রদর্শক বলেও অভিহিত করেছেন। মনীষীবৃন্দ এ বিষয়ে একমত যে, তিনি সমকালীন জীবন্মৃত হিন্দুস্থানী জাতি-বিশেষ করে মুসলিম জাতির মধ্যে জীবন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। অতএব আজকের পাকিস্তানবাসীর পক্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা, তাঁর প্রশস্তি করা এবং তাঁর প্রচেষ্টা ও অবদানকে অন্যান্য যৌথ সম্পদের তুলনায় অধিকতর মূল্যবান মনে করা অতীব যুক্তিসঙ্গত।

আজ ইকবালের কোনো বিশেষ দর্শন আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

যা-হোক, একটা কথা অবশ্য স্মরণীয় যে, তাঁর দর্শন ও কবি কীর্তির সামগ্রিক প্রভাব-বিশেষ করে তাঁর দর্শন তাঁর জাতির জীবনে অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করেছিল। কোনো জাতির জীবনে এহেন গভীর প্রভাব বিস্তার করার গৌরব অতি নগণ্য সংখ্যক কবি-লেখকই অর্জন করতে পেরেছেন। এ-ও সত্য যে, তাঁর যশ-খ্যাতি এশিয়া মহাদেশ অতিক্রম করে পৃথিবীর অন্যত্রও বিস্তার লাভ করেছে। তাঁর কবিতাবলী ইংরেজী, ইতালীয়, ফরাসী, জার্মান, আরবী, তুর্কী, ইন্দোনেশীয় ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত 'এ যুগের কবি'-নামক একটি ফরাসী গ্রন্থে ওয়াল্ট হুইটম্যান, পল ভ্যালেরি, জাঁ কক্‌তো, ফ্রাসোয়াঁ মরয়্যাক, জূল রোমেঁ-প্রমুখ প্রখ্যাত কবিদের সারিতে তাঁকে স্থান দেওয়া হয়েছে। অন্য একটি পুস্তিকায় তাঁর বিভিন্ন কবিতার অনুবাদও পরিবেশন করা হয়েছে। উন্নততর যিন্দেগীর ধ্যানে মগ্ন এবং জাতিকে যে যিন্দেগীর দরস-দানে আত্মনিয়োগকারী এ মনীষীকে আমরা চিন্তাবিদ কবি বলে আখ্যায়িত করতে পারি; এবং তা-ই তাঁর সত্য পরিচিতি। নিজের সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

> আমার অবর্তমানে তারা আমার কবিতা পাঠ করবে,
> তার মর্ম-অনুধাবন করবে এবং বলবে যেঁ,
> একটি গোটা পৃথিবীতে বিপ্লব সৃষ্টি করে দিয়েছে
> একটিমাত্র আত্মবোধ সম্পন্ন ব্যক্তি!

যাহিদান-এ ইরানীয় বালোচিস্তান ও সীস্তান রেডিয়োর পরিচালক আক্বা আলী আসঘর মযহারী ইকবাল দিবস উদ্‌যাপন (২১-৫-৬৬) উপলক্ষে বলেন–

'আমি তক্‌দীরের সারিন্দা, শত সুর আমাতে সুপ্ত রয়েছে;
চিন্তার ছড় যেখানে আঘাত হানে, সেখানেই-আমার তন্ত্রী বেজে ওঠে।'

মানুষ মহৎ কীর্তি সৃষ্টি করে; ইতিহাস সেই কৃতী মানুষের সৃষ্টি। কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে এমন মানুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা মানব সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন। মানুষ যে ধ্যান-জ্ঞান লাভ করে তা প্রায়শঃ এঁদের দান। প্রাচ্যভূমিতে মানুষের সভ্যতার বিভিন্ন ধারায় যে নগণ্য সংখ্যক সৃজনশীল মনীষীর সাক্ষাৎ আমরা পাই, মুহম্মদ ইকবাল তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন। এই আল্লাহ্-অনুভূতিসৃষ্টি মহামানবের জীবন ও সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারা আমার জন্যে পরম সৌভাগ্যের বিষয়, যদিও তা কতকটা ধৃষ্টতার পরিচায়ক। মওলানা জালালুদ্দীন রূমী বলেছেন ঃ

সমুদ্রের সব পানি পান করবার ক্ষমতা না থাকুক,
তৃষ্ণার পরিমাণ পান তো করতেই হবে!

অতএব, সাধ্যানুসারে আমিও কোশেশ্ করবার অনুমতিপ্রার্থী এবং সুধীজনের কাছে আমার অজ্ঞতার জন্যে ক্ষমার প্রত্যাশী। ইরান ও পাক-ভারত উপমহাদেশের মধ্যে বহুকাল ধরে যে সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক যোগসূত্র রয়েছে, সে সম্বন্ধে আমি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করবো। এর সাথে ইকবালকীর্তির আলোচনাও প্রাসঙ্গিক।

সমবেত সুধীমন্ডলী অবশ্যই অবগত আছেন যে, গয্‌নভী শাসকদের আমলে গয্‌নীই ছিল প্রাচ্যের সাহিত্য ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল। সে সময়ে সুলতান মাহমুদ গজনভী ফার্সি ভাষাকে হিন্দুস্থানে আমদানী করেছিলেন। তখন থেকে হিন্দী ও ফার্সী সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক অধিক দৃঢ় হতে থাকে। 'অধিক দৃঢ়' এ জন্যে বলছি যে, দু'টি ভাষার মৌলিক সম্পর্ক স্মরণাতীতকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ আভেস্তায়ী ভাষা ও সংস্কৃতি ভাষা অতীব সাদৃশ্যপূর্ণ। শুধু তা-ই নয়, বেদ ও আবেস্তায়ী ধর্মগ্রন্থদ্বয়ও পরস্পরে পরস্পরের নিকট সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং এ কথা বলা চলে যে, সুলতান মাহমুদের পরবর্তীকাল থেকে পাক-ভারত উপমহাদেশে ফার্সী ভাষার প্রচলন দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে, মসউদ সা'দ সল্‌মানের ন্যায় খ্যাতনামা ফার্সী কবি লাহোরে জন্মগ্রহণ করেন এবং যুগের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। হিজরী ৭ম শতকে ফখ্‌রুদ্দীন ইরাকী জীবনে এক উল্লেখযোগ্য কাল ভারতবর্ষে অতিবাহিত করেন। হিজরী অষ্টম শতকে ফার্সীর প্রচলন আরও বৃদ্ধি পায়। এ-কালে আমীর খস্‌রু দেহ্‌লভী হিন্দুস্থানে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন। অবশেষে হিজরী দশম শতকে মঙ্গোল হাঙ্গামাকালে বেশ কিছুসংখ্যক স্বনামধন্য কবি ইরান ত্যাগ করে হিন্দুস্থানে হিজরত করেন এবং এখানে বসবাস আরম্ভ করেন। সায়েব তাবরেযী, পয়েজ রুক্‌নী, উরফী সিরাযী প্রমুখ শক্তিধর কবিমন্ডলীই আমাদের সাহিত্যে হিন্দী কৃষ্টি ও ভাবধারা সন্নিবেশিত করেন। কেন এঁদের মনে ভারতবর্ষ সফরের অভিপ্রায় জাগলো, কেন উপস্থিত সংকটের ত্রাণের জন্যে এই রূপকথার দেশটি এঁদের মনঃপুত

হলো-এ একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। এর জবাব এই যে, ফার্সী মননশীল কাব্যের সমজদারের সংখ্যা এদেশেই ছিল বেশী; উপরন্তু ফার্সী ছিল এমন এক ভাষা যার সাথে এখানকার সব শিক্ষিত মানুষই পরিচিত ছিলেন। এ দেশের ঐতিহ্য ও জীবন-যাপনের সাথে ফার্সী ভাষা ও কাব্য তখন একান্ত নিবিড়ভাবে মিশে গিয়েছে, যদিও তা দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষা ছিল না।

ইকবাল কৈশোর থেকেই কাব্য চর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর মনন ও রুচিতে যে ভাবধারা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রকাশে তিনি ফার্সী ভাষাকেই যুক্তিযুক্ত মনে করে নেন। এ ব্যাপারে তিনি যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অনন্যসাধারণ। তিনি বলেন ঃ

আমি হিন্দুস্তানবাসী, তাই ফার্সীর সাথে অপরিচিত।
আমি নবোদিত সূর্য, কিন্তু আমার পাত্র শূন্য।
উর্দুভাষা যদিও স্বাদে চিনির সাথে তুলনীয়,
তবুও দরী (ফার্সী) ভাষার বর্ণনাভঙ্গি মধুরতর।

প্রশ্ন জাগতে পারে যে, একজন প্রথিতযশা দার্শনিক ও প্রভাবশালী বিজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে তিনি কেন কাব্যের ভাষায় নিজ অনুভূত তত্ত্বাবলী প্রকাশ করতে গেলেন? জবাবে বলা যায় ঃ সাধারণত মননশীল ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করলে তা শ্রোতৃবর্গের অন্তরে অধিকতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে আর তার কাব্যরূপ হয় অধিকতর মনোজ্ঞ। এ কাজ কিন্তু প্রত্যেকের জন্যে সহজ নয় এবং এর জন্যে চাই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন অন্তর সম্পদ এবং আধ্যাত্মিক প্রতীতি। মহৎ কবির কবিতা শুধু কাব্য সুষমার নিদর্শন নয়; এ হলো সাথে সাথে তার ধ্যান-ধারণা প্রকাশের হাতিয়ার– বলতে কি এই হলো কবিতার প্রাণবস্তু। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইকবালের কথাই ধরা যাক। ফার্সী ভাষার প্রতি তাঁর ছিল অগাধ অনুরাগ; ফার্সী কবিতাকে নিজ চিন্তাধারার বাহনরূপে নির্বাচিত করা সত্ত্বেও তিনি তাঁর মস্তিষ্ক-সম্পদই বিশেষভাবে এ ভাষাকে দান করে ধন্য করেছেন। তাঁর কথায় ঃ

যে অযোগ্য ব্যক্তিদের কাছে কোনোরূপ কল্যাণ লাভের সম্ভাবনা নেই,
তারাই আমার বিরুদ্ধে কাব্যিকতা ও বাগ্মিতার অপবাদ রটায়।

ইকবাল ও তার ভাবধারা সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা হয়েছে। এখন তাঁর কাব্য-গ্রন্থগুলোর মর্মার্থের ওপর সামান্য আলোকপাত প্রয়োজন। অধ্যাপক দশ্তী বলেছেন ঃ

> 'ইকবালের কাব্য পরিক্রমা এমন যে, এক গ্রহ থেকে যে কক্ষপথ ধরে আমরা অবতরণের চেষ্টা করি সে পথ আমাদেরকে নিয়ে পৌছায় আরো উচ্চতর গ্রহের আরও অধিক বিস্তারমান কক্ষপথে; প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ যেন সজাগ প্রাণবন্ত এবং তারা আমাদের সাথে কথা বলে। ইকবাল কাব্যের সাথে যাঁরা সামান্য পরিচিত, তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, তাঁর কবিতা শুধু কবিতাই নয় বরং ঝড়-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গময় সাগরের কোলাহল, অধীর আত্মার প্রতিধ্বনি এবং ভাবাবেগের প্রগাঢ় মূর্ছনাবিশেষ। এতে রয়েছে সমুদ্রের গভীরতা ও অনন্ত আকাশের বর্ণ সমারোহ, তদুপরি অধ্যাত্ম চিন্তার নিগূঢ় আলাপন।"

সাধারণ পাঠকের তাঁর কবিতার মর্মোদ্ধারে অপারগতা তাঁকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে তুলতো। তিনি বলেন ঃ

আমার আপনজনেরা বিদায় নিলো অজ্ঞাত পরিচিতের মতো,
আমার শারাবখানা থেকে তারা ফিরে গেল শূন্য পাত্র নিয়ে।
আমি তাদেরকে দিতে পারতাম শাহী শান-শওকত
ক্বিস্‌রাহ্‌র রাজপ্রাসাদ আমি তাদের পদানত করে দিতে পারতাম।
তারা আমার কাছে প্রত্যাশা করলো প্রেমকাহিনী শোনবার,
আর আমার কবিতার লালিত্যে অবগাহন করবার।
এসব দৃষ্টিহারা ব্যক্তি আমার প্রাণের আকুলতা অনুভব করলো না
আমার বাহ্যিক অবয়ব দেখলো, কিন্তু অন্তর্লোকে প্রবেশ করতে পারলো না।
ফুলের বর্ণ বৈচিত্র্য, স্বর্ণের ঝলমলো প্রভাব আমার আরাধ্য নয়–
আমার প্রতিটি ছত্র হলো আমার শোণিত কণিকায় গাঁথা মালা।

তাঁর পরিচিতি কারুর কাছে সুসংবাদবাহী এবং কারুর কাছে ধীমান দার্শনিকরূপে; কেউ কেউ মনে করেন, তিনি পুনরুজ্জীবিত ইসলামের একজন গোড়া পত্তনকারী বটেন, দার্শনিকত্ব ও কবিত্ব তাঁর বাহ্যরূপ মাত্র। সে যা-ই হোক, আমার মতে, সর্বোপরি তাঁর সত্য পরিচিতি হলো এই যে, তিনি ছিলেন একজন আল্লাহ্-অনুভূতিসম্পন্ন অনন্য ব্যক্তি। এর সহজ দৃষ্ট প্রমাণ হলো ঃ তিনি ছিলেন নিজ স্বীকৃতি মতে মওলানা জালালুদ্দীন মুহম্মদ বল্‌খীর শিষ্য। এ থেকে মনে করা যায় যে, তিনি ইল্‌ম-ই-মা'রেফত আত্মপ্রতিষ্ঠারই প্রতিচ্ছবি। তিনি জগতবাসীর কাছে 'ইশ্‌ক্ব' (প্রেম)-এর নবতর ব্যাখ্যা দিয়েছেন; প্রেমিকজন তাঁকে পেয়েছেন কাফেলার সাথীরূপে, নিঃসঙ্গ অন্তরের সমব্যথীরূপে। এক্ষেত্রে তিনি হাফিয শিরাযীর সহযাত্রী। হাফিজ বলেছেন ঃ

একটিমাত্র কথা–প্রেম বিষাদময়
কিন্তু আশ্চর্য! যার মুখেই শুনি–
কখনো একে পুনরাবৃত্তি মনে হয় না!

একইভাবে, ইকবালের কথাগুলো নতুনই বটে, পুরোনো নয়; কিন্তু তাঁর প্রতিটি কথার উৎসমূল 'মা'রেফত' ছাড়া অন্য কিছু নয়।

'মা'রেফত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'পরিচয় লাভ করা'। একটি হাদীস শরীফ-

যে ব্যক্তি আত্মপরিচিতি লাভ করেছে, সে অবশ্যই নিজ প্রভু (প্রতিপালক)-এর পরিচিতিও লাভ করেছে–থেকেও এর তাৎপর্য সে অর্থে বোঝা যায়। মওলানা রূমীর কথায় ঃ

পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ তা'লার ব্যাখ্যা স্বরূপ প্রেরণ করেছেন, কেননা তাঁর আত্মোপলব্ধি ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে একটি কথা অপরিহার্য বলে মনে হচ্ছে। মা'রেফত আমাদের দ্বারা নির্ধারিত কোনো ধর্ম বা মায্‌হাব-বিশেষ নয়। ইকবালকে আমরা আল্লাহ-অনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছি; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, আর প্রত্যেক মায্‌হাবের সঙ্গে তার রয়েছে কোনো-না-কোনো সূত্রে সম্পর্ক। কোনো কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন যে, 'আ'রিফ' ও 'সূফী'–'মা'রেফত' আর 'তাসাউফ' এক এবং অভিন্ন। আমার মতে, তা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কারণ, 'আ'রিফ' ও 'সূফী' বিশেষ ক্ষেত্রে সম-অর্থক হলেও প্রকৃতপক্ষে তাসাউফ হলো মা'রেফত-এর একতম শাখাবিশেষ। তাই কোনো ব্যক্তি আ'রিফ

হয়েও সূফী নাও হতে পারেন। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তি বাহ্যত তাসাউফ পথযাত্রী হয়ে থাকলেও মা'রেফত-এর গন্ধ না-ও পেতে পারেন। প্রকৃত আ'রিফ সেই ব্যক্তি যিনি ধর্মপরায়ণ হয়ে থাকেন এবং কৃচ্ছ্র সাধনা—'কশফ' ও 'শহূদ'-এর সাহায্যে 'ইল্‌ম-উল্‌-ইয়াক্বীন'-এর স্তর অতিক্রম করে 'আয়ন-উল্‌-ইয়াক্বীন' ও 'হক্কুল ইয়াক্বীন' প্রভৃতি স্তরে পদার্পণ করেন এবং অবশেষে সর্ববস্তু বন্ধন থেকে বিমুক্ত হয়ে 'পরম বন্ধু'র সাথে মিলিত হন। ফয়েয কাশানী বলেছেন ঃ আমি বন্ধুদের কাছ থেকে আস্তিন সঙ্কুচিত করতে এ কারণে বাধ্য হয়েছি যে, আর-এক-বন্ধুর সঙ্গাভিলাষ আমার গলবস্ত্র আকর্ষণ করছে।

এর রহস্য এই যে, আ'রেফ যে কাজই করুন না কেন, তাঁর লক্ষ্য হবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'লা। তাঁর অন্তরে নেই দোযখ্-এর ভয়, নেই বেহেশ্‌ত-এর লোভ-লালসা। ডঃ নূর বখ্‌শ্ কিরমানী বলেন ঃ

'তুমি গির্যায় যেয়ো না, কেননা সেখানে বেহেশ্‌ত বিক্রি হয়; বরং শরাবীদের গলিতে এস, এখানে আল্লাহ্‌র রূপচ্ছটা দেখতে পাবে।'

সমধর্মী ইকবালের কাব্যের মর্মার্থ অনুধাবন করলে প্রতীয়মান হবে যে, তিনি 'আয়ন-উল-ইয়াক্বীন' ও 'হক্কুল ইয়াক্বীন'-এর গন্ডিতে উপনীত হয়েছিলেন। আমি তাঁকে আ'রেফ মনে করি বটে; কিন্তু তিনি ছিলেন সংসারবিবরগী এবং মাদকপায়ী সূফীদের ঘোর বিরোধী। যাঁরা বলেন যে, চোখ-কান-মুখ বন্ধ করেই ধ্যানযোগে ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করা যায়, তাঁদের উত্তরে ইকবাল বলেন ঃ

কান-চোখ-মুখ খোলো হে জ্ঞানী!
যদি সত্য পথের সন্ধান না পাও, তবে আমাকে পরিহাস করতে পারো।

ইকবাল দুনিয়াটাকে বস্তুহীন মনে করেন না, বরং দুনিয়াটা তাঁর বিশ্বাসে আত্মসম্প্রসারণের পথ এবং আত্মমর্যাদা বিকশিত করবার উপায়।

গিরি-মরু-সাগর-বনজঙ্গল-জলস্থল হলো অন্তর্দৃষ্টিশীল মানুষের শিক্ষাকেন্দ্র।
হে নেশাগ্রস্ত! দুনিয়াটাকে তুমি পরিত্যাজ্য মনে করছ।
জাগো, চোখ খোলো, আসলে সত্য তা নয়।
দুনিয়া মুসলিমের আত্মপ্রসারণস্থল, তার সম্ভাবনার পরীক্ষা কেন্দ্র।
তুমি তাকে কাবু কর—যাতে সে তোমাকে কাবু করতে না পারে,
আর তোমাকে কলসস্থ মদ্যের মতো অবরুদ্ধ রাখতে সক্ষম না হয়;
যাতে এই বিশ্বজগতের শক্তিগুলোকে তুমি আয়ত্ত করতে পার,
আর তা তোমারই শৈল্পিক নৈপুণ্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করে!
এ দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি একমাত্র মানুষ,
অতএব সৃষ্টির মূল উপাদানগুলো তোমারই আজ্ঞাবহ হবে।

এ ক্ষেত্রে কারো মনে সন্দেহ জাগতে পারে যে, ইকবাল ইসলামের শ্রদ্ধেয় সূফী-সাধকদের সম্বন্ধে অবজ্ঞা পোষণ করতেন; কিন্তু তা ঠিক নয়। অবশ্য অত্যন্ত পরিতাপের সাথে স্বীকার করতে হয় যে, অনেক সূফী-সাধকের রচিত এমন সব কবিতাবলী রয়েছে যার নানারূপ কদর্থও হতে পারে। ফার্সী কবিতার দীর্ঘ ঐতিহ্য ও ইতিহাসে যুগে যুগে যে বিভিন্ন বর্ণসজ্জা ও আঙ্গিকের অভ্যুদয় হয়েছে, তা স্বভাবতঃই অতি বিচিত্র। এসব কবিতার মর্মার্থের পরিসর এত বিস্তৃত যে, যথাক্ষেত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অন্যের পক্ষে

তার যথার্থ মর্মোদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়। বিশেষত স্থলবিশেষে যখন কোনো কবিতা উদ্ধৃত হয়, তখন–তা সুন্দর ও মনোজ্ঞভাবসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও–অনেকক্ষেত্রে সে কবিতার রচয়িতার উদ্দেশ্যের ব্যতিক্রমসূচক অর্থেও তা ব্যবহার করা চলে। ইকবালের অন্যান্য বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দকে আমার মতামত গ্রহণের প্ররোচনা অবশ্য আমি দিতে চাই না; কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, সূফী ভাবধারার ব্যাপারে তাঁর মতামতের এহেন অনভিপ্রেত ব্যাখ্যাদানও অসম্ভাব্য নয়। আমার ব্যক্তিগত মতে, তিনি নিজে একজন সূফী-সাধক ছিলেন। ইল্‌ম ও মা'রেফত–এর সমন্বয়ে তিনি যে এক বিস্ময়কর মা'জুন তৈরী করে রেখে গেছেন, তা আলিম, আরিফ, আল্লাহ্‌-প্রেমিক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত প্রত্যেকেই নিজ নিজ জ্ঞান ও যোগ্যতা অনুযায়ী গ্রহণ করতে পারেন–এতে সকলেরই পরম উপকার ও অনাবিল আনন্দ লাভ হবে।

ইকবাল আত্ম-বিলুপ্ত বা আত্মস্তুতিকে বিংশ শতাব্দীর জীবন বিধান বলে মেনে নিতে পারেন নি। এরূপ স্থূল চিন্তাধারার তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছেন। এ ধরনের মতামতকে তিনি প্রাচ্যের জনগণের বিশেষ করে, মুসলিম সম্প্রদায়ের অবনতির মূল কারণ বলে অভিহিত করেছেন। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য অন্তঃসারশূন্য সভ্যতারও তিনি বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন সমন্বয় সাধন করে একটি উন্নততর সভ্যতার সৃষ্টি করতে-যা বিশ্বজন এবং তাঁর নিজ জাতি-উভয়েরই উপকার সাধন করবে।

তাঁর ধ্যান-ধারণার জগতে যে বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা যেরূপ বিস্ময়করভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল, তা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না; তবুও তা তিনি যথাসাধ্য কার্যকর করে গেছেন এবং সে অনুসারে কঠিন সাধনার জীবন-যাপন করে গেছেন। এমন কি, যুগ যুগ সঞ্চিত আবর্জনা থেকে মুক্ত করে তিনি বিশ্ববাসীর সামনে সে পথকে স্পষ্টতর আলোকে আলোকিত করে তুলে ধরেছেন। হাকীম সানায়ী বলেছিলেন ঃ

সুদীর্ঘকাল অতীত হয়ে গেছে, মনসুরের দৃপ্ত কণ্ঠস্বর আর শোনা যায় না।
তাই আমি ফাঁসির কাষ্ঠে নব জীবন উদ্বোধনের প্রয়াস পাচ্ছি।

একথা ইকবালের ক্ষেত্রেও হুবহু প্রযোজ্য।

সেই মহাপ্রাণ মনীষীর পূত আত্মার সমক্ষে আজ আমরা নতশির হয়ে দাঁড়াই। তাঁর উদ্দেশ্যে আরয করি ঃ

হে শান্তিনিদ্রায় বিভোর স্বাধীনচেতা সারথী! তুমি শুধু পাক-ভূমির একেলার সম্পদ নও। এক বিরাট দুনিয়া তোমাকে আপন সম্পদ বলে মনে করে। ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা সম্মানজনক সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে তুমি দীর্ঘদিন ধরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছিলে; বাস্তবে আজ সে সম্পর্ক দিন দিন দৃঢ়ভিত্তিক হয়ে চলেছে; আল্লাহর শুকর, ইরান ও পাকিস্তানের দূরদর্শী নেতৃবৃন্দ-বিশেষ করে, আজকের ইরান ও পাকিস্তানের মহান রাষ্ট্রপতিদ্বয় এ দু'দেশের বন্ধুত্বকে দৃঢ়তর করবার জন্যে এবং সাথে সাথে ইসলামের ইয্‌যত ও হেফাযত উন্নয়নের জন্যে, ইসলামী ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে বিরামহীন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। তোমার চিরন্তন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে চলেছে, তুমি ধন্য!

"তুমি তাঁর রাজত্বের ঊষার আলোর অভ্যুদয় পর্যন্ত বেঁচে থেকো,
এই তো মাত্র শেষরাতের ঘন্টাধ্বনি শ্রুত হলো!"

বালোচিস্তান (ইরান) ও সীস্তান-এর গভর্নর জেনারেল মহামান্য লেঃ জেনারেল নসরুল্লাহী এ উপলক্ষে বলেন-

আল্লামা ইকবাল ১৮৭৭ সনে ভূতপূর্ব পাঞ্জাবের সিয়ালকোট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৮ সনে বিশ্ব স্রষ্টার নিকটে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিরাট দার্শনিক ও জাতির শিক্ষক। তাঁর ছাত্রজীবনের এক প্রসিদ্ধ ঘটনা বলছি ঃ

> কোনো একদিন তিনি বিলম্বে ক্লাসে উপস্থিত হন। ভবিষ্যতে যাতে এটা তাঁর অভ্যাসে পরিণত না হয়, সে জন্যে শিক্ষক কিছুটা রাগত স্বরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তাঁর বিলম্ব হলো। ইকবাল বিনাদ্বিধায় জবাব দিলেন "ইকবাল"(সৌভাগ্য) সর্বদা দেরীতেই পৌছায়।

অবশ্য তিনি যে ভাবীকালে জাতির সৌভাগ্যাকাশে সূর্য রূপে আবির্ভূত হবেন, তা যে তখন তাঁর মনে রেখাপাত করেছিল –সে কথা বলা যায় না; কিন্তু প্রতিভার বীজ যে তাঁর ভিতর এই শৈশব থেকেই অঙ্কুরিত হচ্ছিল, এ আত্মদর্শন তার একটা প্রমাণ।

পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে এবং পাশ্চাত্য দেশসমূহ থেকে উচ্চতম শিক্ষাগত যোগ্যতা আহরণ সত্ত্বেও তাঁর অন্তর ছিল খাঁটি প্রাচ্য ঐতিহ্যমন্ডিত। তিনি ইরানী সূফী সাধক কবি মওলানা জালালুদ্দীন রূমীর একজন বিনীত শিষ্য হিসেবে নিজের পরিচয় একাধিকবার দিয়েছেন এবং সত্যিকারভাবে তিনি তা-ই ছিলেন। রূমীর গভীর দর্শন সাগরে তিনি সন্তরণরত ছিলেন। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর পরলোকগমনের পরে প্রকাশিত মসনবী আরমগান-ই-হিজায গ্রন্থে মওলানা সম্বন্ধে তিনি বলেছেনঃ

> তিনি আমা হেন নরাধমের কর্মগ্রন্থি খুলে দিয়েছেন,
> পথের ধুলিকণাকে পরশ পাথরে পরিণত করেছেন,
> আমার জন্যে তাঁর অন্তরদেশের দ্বার খুলে দিয়েছেন,
> আমারই মৃত্তিকার সাহায্যে এক নবজগত সৃষ্টি করেছেন।
> তাঁর কৃপাদৃষ্টি থেকে আমি উপকৃত হয়েছি;
> এবং সে হেতু রবি শশি আমার সহযোগিতা করেছে।
> দরবেশীর নিগূঢ় তত্ত্ব রূমীর কাছে শিক্ষা কর,
> তাঁর দরবেশীর প্রতি বাদশাহী পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত।
> সেই দরবেশী থেকে সাবধান, যা তোমাকে নতশির হতে শেখায়।

ইকবাল তাঁর মসনবী *আসরার-ই-খুদী* গ্রন্থে নিজ দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু 'খুদী'র পটভূমি রচনা প্রসঙ্গে মওলানা রূমীর সাথে তাঁর স্বপ্নাভিসারের কথা উল্লেখ করেছেন। এ সাক্ষাৎকালে মওলানা তাঁকে জাগ্রত হতে এবং (জাগরণমূলক) গান গাইতে নির্দেশ দিয়েছিলেন বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। ইকবাল রূমীর দ্বারা কতদূর প্রভাবিত হয়েছিলেন, তা সহজেই উপলব্ধি হবে মওলানার কতিপয় বিখ্যাত ছত্র তিনি কিভাবে নিজ কবিতার অঙ্গীভূত করে নিয়েছেন তা লক্ষ্য করলে। শুধু তা-ই নয়, মওলানা যে ছন্দে কবিতা রচনা করেছেন, ইকবাল সে ছন্দকেই পসন্দ করে নিয়েছেন–এসব ক্ষেত্রে তাঁর নিজের রচনায়। তিনি উর্দু

ও ফার্সী উভয় ভাষাতেই কবিতা রচনা করেছেন; তবুও উচ্চাঙ্গের মনোভাব প্রকাশের বেলায় তিনি ফার্সী ভাষাকেই যোগ্যতর মনে করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, উর্দু ভাষার কেশর এখনও স্কন্ধ নিরপেক্ষ হতে পারে নি। অপরপক্ষে ইরানী সাহিত্যও তাঁর ভাবধারা থেকে উপাদানাদি আহরণ করে নিজের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। আমার যতদূর জানা আছে, ইরানের কতিপয় স্বনামধন্য কবি-সাহিত্যিক যথা ঃ মালেকুশ্ শুআরা বাহার, আদীবুস সল্তানাত্ শামীমী, সৈয়দ যিয়াউদ্দিন তবাতবায়ী, আলী আসঘর হিক্মত, নাযীরযাদা ক্বির্মানী প্রমুখ খ্যাতনামা লেখকগণ এ প্রথিতযশা দার্শনিক কবি সম্বন্ধে লিখেছেন ও বলেছেন এবং নিজের কর্মজীবনে তাঁর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত ইকবালের ফার্সী কাব্যসমূহের এক বিরাট অংশ ইরানে মুদ্রিত হয়েছে এবং বহুলভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর কাব্যের এক নির্ধারিত অংশের মুদ্রণে জনাব আহমদ সরোশও উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছেন। ইকবালের কোনো কোনো কবিতা ইরানবাসীর কাছে এত অধিক জনপ্রিয় যে, তা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। উদাহরণত;

আমি তোমাদের পুষ্পকেয়ারীতে পলাশ ফুলের মশাল স্বরূপ;
হে আযমী যুবকবৃন্দ!
আমার ও তোমাদের প্রাণস্পন্দনের একই উত্থান-পতন

এ ধরনের কবিতাগুচ্ছ ইরানীদের অতিশয় প্রিয়।

ইকবাল প্রতিতির মূল উৎস হলো *কুরআন মজীদ।* ইংরেজী ভাষায় প্রণীত তাঁর *'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন'* গ্রন্থটি তাঁর গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একটি অমূল্য নিদর্শন। তিনি নিজেই বার বার ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কুরআনের আলোকে আলোকিত সেই আলোকেই তিনি তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রিকে উজ্জ্বল আভাতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হন। কুরআনের পর যে একটি মাত্র অনবদ্য আশ্রয় তিনি গ্রহণ করেছেন, তা হলো রূমীর মসনবী। তিনি নিজ মতাদর্শের প্রচার-যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন ইরানী ভাষাকে, আর শ্রদ্ধেয় গুরু হিসেবে মেনে নিয়েছেন ইরানী সাধক-শ্রেষ্ঠ মওলানা রূমীকে। সর্বোপরি তিনি যে গন্ডির মধ্যে নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছেন, তার অধিকাংশই হলো ইরানী; আমি আজ এ অনুভূতিতে যারপরনাই আনন্দ পাচ্ছি যে, ইকবালের সমতুল্য এমন আর কেউ নেই যিনি ইরান ও পাকিস্তান (তখন অবশ্য কল্পনার রাজ্যে)-কে চিন্তা ও বিশ্বাসের দিক থেকে এতখানি ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন। এ ক্ষেত্রে আরও স্মরণীয় যে, মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯০৭ সালে ডক্টরেট থিসিসের তিনি যে বিষয় নির্বাচন করেছিলেন, তা ইরান-সংশ্লিষ্ট ঃ *'ইরানে বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ'।* অতএব নিঃসন্দেহে দাবী করা চলে যে, ইকবাল হলেন ইরান ও পাকিস্তানের যৌথ সম্পদ এবং দুই প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য আধ্যাত্মিক যোগসূত্র। বলতে কি, তিনিই সেই পুরুষ যিনি পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পূর্ব থেকেই আমাদের আজকের দু'দেশের মধ্যে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক নিকট সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে ভিত্তি প্রস্তুত করে গেছেন। আমরা আজ স্বচক্ষে অবলোকন করছি তাঁর সে সাধনার ফলশ্রুতি-তথা দু'দেশের বাস্তব সহযোগিতার চিত্র।

আল্লামা সর্বদাই মুসলিম বিশ্বের আলাদা ব্লক গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন। এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হবে ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ ও সম্মানজনক ঐক্য ও সহযোগিতা সাধন। আমাদের পক্ষে আজ কতই না আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে, সেই জ্যোতিষ্মান অন্তরের স্বপ্ন আ'লা হযরত শাহ-ই-ইরান ও প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ আইয়ুব খান-এর সুযোগ্য পরিচালনাধীনে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। বিশ্ব-ইতিহাসের এই সঙ্কটকালে দুই বন্ধু রাষ্ট্র আজ হাতে হাত মিলিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে।

আল্লামা ইকবালের সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের পতাকা উচ্চাসীন রাখা। পাক্-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানেরা যখন ১৮৫৭ সালের আযাদী সংগ্রামে বিফল মনোরথ হলো (এ আযাদী সংগ্রামকে ইংরেজ জাতি দুরভিসন্ধিমূলকভাবে বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছে) তখন তাদের সামনে নিদারুণ হতাশার ছায়া ভেসে উঠলো। আল্লামার যৌবনকাল এ আবহাওয়ায় গড়ে ওঠে। এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেন। তদুপরি প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর দুর্বলতা এবং মুসলিম মিল্লাত-এর ক্রমাবনতি তাঁকে অস্বাভাবিকভাবে উদ্বেগাকুল করে তোলে। কিন্তু তিনি হিম্মত না হারিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে এগিয়ে এলেন এবং ক্বওমকে কর্মপ্রেরণা ও আশা-উদ্দীপনাপূর্ণ আহ্বান জানালেন। তিনি পবিত্র কুরআনে বিবৃত "তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না"–বাণীর উপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন, আজীবন নিজে তা অনুসরণ করতেন এবং অন্যদেরকে তা গ্রহণ করতে উৎসাহিত করতেন। নিরাশার রাহুগ্রাস থেকে ক্বওমকে মুক্ত করবার জন্যে তিনি জীবনের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্যন্ত অকাতরে ব্যয় করে গেছেন।

তাঁর জীবনকাল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় অতিবাহিত হয়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ আমি একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। সুদীর্ঘ দিন থেকে আল্লামার একটি চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ ছিল। জীবনের শেষ দু'তিন বছর অবশিষ্ট চোখটিও দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে। তাঁর এ করুণ অবস্থায় জনৈক বন্ধু তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। উত্তরে তিনি বলেন,

> "বাহ্যিক দৃষ্টি লোপ পাওয়ার বিনিময়ে আমার ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে; আমি নতুন জগতের আশার আলোক দেখতে পাচ্ছি।"

আল্লামার মতে, মানুষের ব্যক্তিজীবন সমাজ-জীবন দ্বারা পরিবেষ্টিত। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানকল্পে লন্ডনে এক গোল-টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সে সম্মেলন সমস্যা সমাধানে কার্যত ব্যর্থ হয়ে যায়। অতঃপর এলাহাবাদে তাঁর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগ-এর যে বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তিনি ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম আবাসভূমির দাবী উত্থাপন করেন। পরে ১৯৪০ সনের ২৩ শে মার্চ তারিখে মুসলিম লীগের বৈঠকে তাঁর সে প্রস্তাব পাকিস্তান প্রস্তাব রূপে পাস হয়ে যায় এবং ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট তারিখে সেই প্রস্তাবের ভিত্তিতে মরহুম কায়েদ-ই-আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বাধীনে ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের জাতীয় আবাসভূমিস্বরূপ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হেতু আমরা প্রতি বছর ২৩শে মার্চ তারিখে সানন্দে পাকিস্তান দিবস উদ্‌যাপন করে থাকি। এ পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্য আজকের দিনও আমাদের জন্যে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আল্লামা ইকবাল একাধারে দার্শনিক, কবি, দূরদর্শী নেতা, জাতির শিক্ষাগুরু এবং সংস্কারক ছিলেন। অন্যপক্ষে তিনি ছিলেন যুগের শ্রেষ্ঠতম চিন্তানায়ক। তিনি আল্লাহ্ ও রসূলের ওপর দৃঢ়ভিত্তিক ঈমান রাখতেন; তাঁর পথ প্রদর্শক ছিল কুরআন মজীদ, তাঁর বিশিষ্ট বাণী ছিল খুদীর উজ্জীবন। এই একটি মাত্র পথই তিনি চিহ্নিত করে গেছন, যা অবলম্বন করে বিশ্ব মুসলিম জাতি বিশ্বের দরবারে আপন মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব (অবশ্যই আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করতে যাচ্ছি) পালনে সমর্থ হবে। মস্‌নবী *আসরার-ই-খুদীতে* ইকবাল বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি অবমাননার অতল গহ্বরে পতিত,
সে দুর্বলতা অক্ষমতার পরিতৃপ্তি লাভ করে।
অপারগতাই হলো জীবনের তস্কর স্বরূপ,
অক্ষম ব্যক্তির অন্তর মন ভয়-ভীতি ও মিথ্যায় পরিপূর্ণ থাকে।
যিন্দেগীর মূল রহস্য সম্বন্ধে সজাগ হও,
হে অন্ধকারগ্রস্তজন। গয়রুল্লাহকে ত্যাগ কর।
চোখ কান মুখ খোল হে আত্মাভিমানী।
যদি সত্য পথের সন্ধান না পাও,
তবে আমাকে পরিহাস করতে পারো।

স্পষ্টত আল্লামার এসব বাণী সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সঙ্কটজনক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমরা কালক্ষেপণ করছি, যে বৈষয়িক উন্নতির প্রতিযোগিতা প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে মৃত্যুর করাল গ্রাসের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লামা মুহম্মদ ইকবালের বাণী আমাদের জন্যে এক পরম শক্তিশালী অবলম্বন স্বরূপ সমুদিত। তাঁর প্রদর্শিত পথ হলো পৃথিবীর বুকে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করবার সঠিক পথ। তিনি হলেন নিঃসন্দেহে শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম সংস্কারক।

আজকে আমরা পরম বিনয় সহকারে প্রার্থনা করবো যেন আল্লাহ্ তা'লা আল্লামা ইকবালের ও আমাদের ঐকান্তিক আরযু পাক ইরান মৈত্রীবন্ধন সুদৃঢ় করতে আমাদের সহায় হোন। আজ আমাদের কামনা ঃ

মুসলিম জাতিসমূহের ভ্রাতৃত্ববন্ধন দৃঢ়তর হোক।
ইসলামী দেশসমূহের ঐক্য সাধিত হোক, এবং সে ঐক্য
দিনদিন অধিকতর শক্তি অর্জন করুক।
সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও কল্যাণের ছায়া নেমে আসুক।

আফগানিস্তান

কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব গুলাম হুসায়ন মুজাদ্দদী ইকবালের ২৭-তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে বলেন-

মরহুম আল্লামা ইকবাল ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ২১ শে এপ্রিল, মোতাবেক ১লা সৌর ১৩১৭ জুলুসী সালে এ মরজগত ত্যাগ করে চিরন্তন জগতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যে ব্যক্তি সুনাম অর্জন করে ইহজগৎ ত্যাগ করেন, তিনি অমর; কেননা, দৈহিক মৃত্যুর পরও গুণগানের মাধ্যমে তাঁর নাম কীর্তিত হতে থাকে।

কবিতা সাহিত্যানুরাগী এবং জ্ঞানান্বেষীগণ এ স্মরণীয় দিনে বিশেষ মর্যাদা সহকারে সেই প্রথিতযশা মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন। তাঁর মতো গুণী ব্যক্তির জীবনী আলোচনা শুধু তাঁর নিজ দেশবাসীর জন্যে নয়, বিশ্বময় সাহিত্য রসিক ও তত্ত্বাভিসারী সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির জন্যেই আনন্দ ও পুণ্যের কারণ। তিনি ছিলেন এমন একজন চিন্তাবিদ্ ও দার্শনিক, যাঁর অন্তরের গভীর চিন্তাধারা, উচ্চাঙ্গের মানসিক অনুভূতি ও হৃদয়াবেগাবলী মনোজ্ঞ কাব্যরূপে প্রকাশ লাভ করেছিল। তিনি যে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তা অত্যন্ত গভীর মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন ও তা থেকে সুবিমল জ্ঞান আহরণ বিশ্ববাসীর জন্যে একান্ত কর্তব্য। আল্লামা ছিলেন একজন মুসলিম দার্শনিক, ধর্মপরায়ণ তত্ত্ববিদ ও সাহিত্যিক, আল্লাহতে সমর্পিতচিত্ত চিন্তানায়ক, মানব প্রেমিক ও স্বাধীনচেতা কবি। তিনি মানবকুল শিরোমণি বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের (সাঃ) প্রতি অগাধ প্রেম পোষণ করতেন।

ইসলামের সত্যতাকে তিনি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করতেন এবং সেহেতু নিজ দর্শনের ভিত্তি তিনি ইসলামের অটল ভিত্তির ওপরই স্থাপন করেছেন। বিশ্বমানবকে তিনি আহ্বান করেছেন আত্মশুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উন্নততর মনুষ্যত্ব অর্জন করতে, যাতে বিশ্বময় শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লামা শুধু যে মুসলিম সূফী সাধকদের গভীর জ্ঞানের নিগূঢ় তত্ত্বাদি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন তা নয়, তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের চিন্তাধারা ও দর্শন সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান রাখতেন। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ *পয়াম-ই-মশরিক-এ* প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবিশ্বাস নিয়ে

আলোচনা করেছেন এবং সাথে সাথে নিজের তত্ত্বজ্ঞানমূলক মতাদর্শাবলীও তুলে ধরেছেন।

ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে,

'আমি যখন মনে করি যে, আমি আছি তখনই আমি অস্তিত্বশীল।'

আল্লামা ইকবাল এই দার্শনিক সিদ্ধান্তকে নিজের মতো করে এক আকর্ষণীয় কবিতায় এভাবে প্রকাশ করেছেন ঃ

আমার অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল দোদোল্যমান;
কিন্তু প্রেমই আমার মনে এ প্রতীতি জন্মিয়েছে যে, আমি আছি।

আসলে প্রেমই একমাত্র বস্তু যা মানব মানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে, কর্তব্য পালনে তাকে সক্রিয় করে তোলে, জীবনের লক্ষ্যস্থলে পৌছবার জন্যে চেষ্টা ও সাধনার প্রেরণা জোগায় এবং মানুষের অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনের পথ সুগম করে দেয়। এক কথায়, প্রেমই ইকবাল দর্শনের প্রচ্ছন্ন রূপকার।

ইকবালের আকর্ষণীয় কবিতা থেকে বোঝা যায়- তিনি দর্শন শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রেমকে আয়ত্ত করেছেন।

তাঁর গোটা চিন্তাধারায় ও কাব্যে প্রেমের ও হৃদয়াবেগের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষণীয়। *পয়াম ই মশ্‌রিক* গ্রন্থে 'ইশ্‌ক' শীর্ষক কবিতায় তিনি বলেছেন ঃ

যে বুদ্ধি-বিবেকের সামান্য আন্দোলনে সমগ্র বিশ্ব ভস্ম হয়ে যায়,
তা ইশ্‌ক্ থেকেই নিয়েছে তার বিশ্বদহনের সবক।
ইশ্‌ক্ ই তা যা তোমার প্রাণে বিভিন্ন আবেগের উন্মেষ ঘটায়-
তা রূমীর হৃদয়বেগই হোক, বা ফারাবীর বিজ্ঞানই হোক্।
এর দুর্বোধ্য অর্থ অক্ষর বন্ধনে ধরা দেয় না,
কিন্তু নিমেষে অন্তরের গভীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আত্মপ্রকাশ করে।

জবিদনামায় তিনি বলেছেন ঃ

প্রেমই হলো জীবনের আইন-শৃঙ্খলা,
সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো ধর্ম এবং ধর্মই হলো প্রেম।
প্রেমের বহিরাকার তো আগ্নেয়াস্ত্রের মতো,
কিন্তু নিমেষে অন্তর-ভাগ পরিপূর্ণ বিশ্বনিয়ন্তার উজ্জ্বল আলোকে।
প্রেমের আন্তরিক দৌতনা থেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ।
তারই বিচিত্র উন্মাদনায় শিল্প-বিজ্ঞানের উন্মেষ।
প্রেমের স্পর্শ ছাড়া ধর্ম কখনও দৃঢ়মূল হয় না;
অতএব তুমি প্রেমিকের কাছেই ধর্ম শিক্ষা কর।

'পয়াম-ই-মাশরিক'-এর অন্যত্র রয়েছে ঃ

প্রেমের দৃষ্টিতে দেখ, তবে তার (সত্যের) সন্ধান পাবে;

কেননা, জ্ঞানের দৃষ্টিতে দুনিয়াটাকে বৈচিত্র্যময় দেখায়।
প্রেমের কাছে কর্মের দীক্ষা গ্রহণ কর, তারপর যা-ইচ্ছা-তা-ই কর;
কারণ প্রেমেই নিহিত বিবেক-বুদ্ধির মূল উপাদান এবং সভ্যতার প্রাণ।

'আস্‌রার-ই-খুদী' গ্রন্থে নিজ দর্শনের মূল ভিত্তি ব্যাখ্যা করতে যেয়ে আল্লামা 'খুদী'-কে সে দর্শন-পদ্ধতির কেন্দ্রবিন্দুরূপে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি বলেন যে, খুদী এমন এক মানব-ভিত্তিক যোগসূত্র যা অন্যপক্ষে ব্যক্তিজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সৃষ্টি-জগতের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্যে খুদী যে শুধু দায়ী, তা নয়; বরঞ্চ জীবনের গতিধারা নির্ধারণ এবং সৃষ্টির সুরূপায়ণ এবং সুবিন্যাসনও তার সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাঁর মতে, খুদী সেইসব অন্তর্নিহিত শক্তি সমষ্টির নাম, যা সৃষ্টির প্রত্যেক কিছুতে (প্রাণী হোক্ বা অ-প্রাণী হোক্) বিদ্যমান রয়েছে। সৃষ্টির রূপ-রেখার স্থায়িত্ব খুদীর প্রভাব বিস্তারের ওপর নির্ভরশীল। তিনি বলেন ঃ

অস্তিত্বের রূপকল্প খুদীরই অবদান,
তুমি যা-ই অবলোকন কর তা খুদীরই বহিঃপ্রকাশ।

তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানুষকে অবশ্যই আত্মপ্রকাশে উদ্বুদ্ধ হতে হবে এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তিগুলোকে সজাগ করে তুলতে হবে। তিনি বলেন ঃ

আত্মপ্রকাশ করা খুদীর স্বভাবজাত অভ্যাস,
বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি কণায় খুদীর শক্তি সুপ্ত রয়েছে।

আরমগানে হিজায-এ এ প্রসঙ্গে উক্ত হয়েছে ঃ

খোদার অস্তিত্বের সাথে খুদীর অস্তিত্ব সম্পর্কিত,
খোদার আত্মপ্রকাশের সাথে খুদীর আত্মপ্রকাশ যোগযুক্ত।
আমি জানিনে যদি না থাকতো সাগর,
তবে কোথায় থাকতো দীপ্তোজ্জ্বল মুক্তারাজি।

আসরার-ই খুদীতে তিনি প্রেম খুদী সম্পর্কে বলেছেন ঃ

যে দীপ্তিমান কেন্দ্রবিন্দুটির নাম খুদী,
তা হলো আমাদের মৃন্ময় দেহাভ্যন্তরস্থ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।
তা প্রেমের সংস্পর্শে অধিকতর স্থায়ী, জীবন্ত ও জ্বলন্ত হয়।
তার প্রকৃতি প্রেম থেকে অগ্নি আহরণ করে,
সে প্রেম থেকে সঞ্চয় করে ভূলোককে আলোকিত করবার শক্তি।

খুদীর স্থায়িত্ব ও পরিপুষ্টির জন্যে সতত চেষ্টিত থাকা এবং নৈরাশ্য ভাবকে প্রতিরোধ করা তিনি প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করতেন। তিনি বলেন ঃ

আকাঙ্ক্ষাই খুদীবক্ষে আন্দোলনের প্রেরণা জোগায়,
খুদীর সমুদ্র থেকেই আবেগের ঢেউ ওঠে।
আকাঙ্ক্ষাই হলো লক্ষ্যকে শিকার করবার ফাঁদ।

আর এই আকাক্ষাই কর্মের বিক্ষিপ্ত পৃষ্ঠাগুলোকে একত্রে সংযোজিত করে।
তুমি নিজ মনে আকাক্ষাকে সজীব রাখো,
যাতে তোমার একমুঠো মাটি ধূলিতে পর্যবসিত না হয়।
এই বিচিত্র জগতে প্রাণই হলো আকাক্ষার অন্যরূপ,
প্রতিটি বস্তুর অন্তঃপ্রকৃতি, আকাক্ষার ধারক।

আল্লামা ইকবাল এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং খুদীর পূর্ণতা অর্জনের চরম লক্ষ্যে পৌঁছা ও মর্যাদার শেষস্তর পর্যন্ত ক্রমোন্নতি সাধনের জন্যে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করার কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম পর্যায় হলো ইতাআত্ বা আনুগত্য। এই গুণান্বিত মানুষ পরসেবা, কৃচ্ছ্র সাধনা, ধৈর্য, গাম্ভীর্য প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী অর্জন করেন এবং এ সব গুণ তাঁকে শরীয়তের বিধানাবলী পালনে উদ্বুদ্ধ করে।

দ্বিতীয় পর্যায় হলো রিপুসংযম এবং আত্মপ্রবৃত্তির ওপর পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন।

তিনি বলেন ঃ

তোমার রিপুনিচয় হলো লোভী উটের মতো আত্মপূজারী,
আত্মসওয়ারী ও অবাধ্য;
অতএব তুমি বীর পুরুষের মতো তার লাগাম কষে ধরো।
তখনই তুমি হীরক হতে পারবে, যদিও বা তুমি অঙ্গার হয়ে থাকো।

তৃতীয় পর্যায় হলো আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের পথে ক্রমোন্নতি। তিনি বলেন ঃ

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব অর্জন নিতান্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার,
জড় উপাদানের ওপর ক্ষমতা বিস্তার করতে পারা- সে একই কথা।

তিনি মানুষকে সংগ্রাম ও অধ্যবসায়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন এবং সংগ্রাম ও অধ্যবসায়কেই প্রকৃত জীবন বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

তোমার জীবন সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুই নয়,
তোমার প্রকৃত শান্তি একমাত্র কর্ম প্রচেষ্টাতেই।

তাঁর মতে, মানুষের অস্তিত্ব প্রচেষ্টাও সংগ্রামের ওপর নির্ভরশীল; পক্ষান্তরে অস্তিত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নিষ্ক্রিয়তা ও আলস্যের ফলে। তাঁর কথায় ঃ

এ সমুদ্রে আমি অশান্ত তরঙ্গের মতো;
যদি আমি নিজেকে না হারিয়ে দেই, তবে আমি অস্তিত্ব হারা।

'যিন্দেগী ও আমল' শিরোনামায় তিনি এ বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

জনৈক উপকূলবাসী বললো ঃ আমি দীর্ঘকাল ধরে বেঁচে আমি,
কিন্তু আমি কি তা এ যাবৎ অস্পষ্টই রয়ে গেল।
একটি আত্মহারা ঢেউ দুরন্ত বেগে ছুটে এসে বললো ঃ

যতক্ষণ আমি গতিশীল, ততক্ষণ আমার অস্তিত্ব;
যেখানে আমি গতি হারাই, সেখানেই আমার মৃত্যু।

আল্লামা ইকবাল জাবিদ নামাহ'র এক স্থানে কুরআন মজীদ-এর একটা আয়াত (যাকে হিকমত দেওয়া হয়েছে, সে অশেষ কল্যাণের অধিকারী) অবলম্বন করে 'প্রজ্ঞা অনন্ত কল্যাণের উৎস' শিরোনামায় বলেছেন ঃ

আল্লাহ তা'লা হিকমতকে মহাকল্যাণ বলে অভিহিত করেছেন,
অতএব যেখানে এ কল্যাণের সন্ধান পাও, সেখান থেকে তা গ্রহণ কর।
হিকমত বর্ণ ও স্বরকে ভাষা প্রদান করে
যাতে রবিকর থেকে দৃষ্টি শক্তি অর্জন করতে পারে।
তার ব্যবস্থাপত্র সব ব্যবস্থার ব্যাখ্যাদায়ী,
তার তদ্‌বীরের হাতে সবাইর অদৃষ্ট জড়িত।

অতঃপর তিনি উপদেশ দেন যে, হিক্‌মত-এর সাথে মানব প্রেম ও মানব হিতৈষণার সমন্বয় সাধন করতে হবে;' ঃ

অন্তরে মানবপ্রেম না থাকলে জ্ঞান মূল্যহীন;
এ ধরনের জ্ঞানের প্রদাহ জলে স্থলে তমসার সৃষ্টি করে-
আর এ জগত তো আদি হতেই অন্ধকারাচ্ছন্ন ও সসীম।
প্রেম-বর্জিত জ্ঞান বিজ্ঞান প্রাণহীন শবের মতো,
এবং এহেন বুদ্ধি ও নৈপুণ্য লক্ষ্যচ্যুত তীরের মতো।

আর্‌মগানে হিজায গ্রন্থে তিনি তরবিয়ত সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

আদব জ্ঞানী ও অজ্ঞানী দুয়েরই অলঙ্কার স্বরূপ।
সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান যিনি আদব-এর অলঙ্কারে
নিজেকে ভূষিত করেছেন।
সেই মুসলিম সন্তানকে আমি বন্ধু মনে করি না-
যার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ আদব হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে।

শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

তোমার সন্তানকে ধর্ম ও জ্ঞান শিক্ষা দাও,
এতে তার অঙ্গুরীয় পৃষ্ঠ চাঁদ সেতারার ন্যায় দীপ্তিমান হবে,
তার হাতে যদি জ্ঞান তুলে দিতে পারো, তবে মনে করো-
তার আস্তিনের মধ্যে মুসার জ্যোতিষ্মান হাত প্রবিষ্ট হয়েছে।

গ্রীক যুক্তিবিদ্যার অসারতা এবং কর্মজীবনে তার ব্যর্থতা সম্পর্কে তিনি তাঁর নিজ সূফী দৃষ্টিভঙ্গি মুতাবেক এরূপ ইঙ্গিত করেছেন ঃ

এ যুক্তিবিদ্যা থেকে অপরিপক্কতার ঘ্রাণ ভেসে আসছে;
কারণ- এর দলীলাত অসম্পূর্ণ।

সাধক রূমী অথবা মোল্লা জামীর দু'ছত্র কবিতা
আমার অনেক সমস্যা সমাধান করে দেয়।

যতদূর দেখা যায়, আল্লামা যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই আফগান মনীষীদের সাথে তাঁর নিকট আত্মিক যোগ হেতু তাঁদের মূল্যবান চিন্তাধারার উল্লেখ করেছেন। মির্যা হাকীম সনায়ীর কবর যিয়ারত উপলক্ষে তিনি বলেন ঃ

যে গযনী! জ্ঞান-বিজ্ঞানের সুরক্ষিত কেল্লা।
যুগ-যুগের শার্দুলদের চারণভূমি!
তোমার ভূগর্ভে শায়িত রয়েছেন হাকীম-ই-গযনভী,
যাঁর ডাকে সবল হতো মানবচিত্ত,
যাঁর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমি বৈদগ্ধের গভীর স্পর্শ পেলাম।
ফলে কান্নার মতো একটি অপরূপ সম্পদ আমার অন্তরে সঞ্চিত হলো।

জাবিদ নামাহ্'য় সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী ও সৈয়দ হালীম পাশার সাথে রূহানী সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

আমি তথায় পৌঁছে দেখলাম, দুই মহাপুরুষ দন্ডায়মান।
তন্মধ্যে তাতারী মহাপুরুষ হলেন মুক্তাদী এবং আফগানী মহাপুরুষ ইমাম।
তিনি বলেন, সৈয়দকুল শিরোমণি মওলানা জালালুদ্দীন,
যাঁর কথায় পাথর মাটি পর্যন্ত সজীব হয়ে উঠতো।

তাঁর প্রথম গ্রন্থ মসনবী *আসরার-ই-খুদী* প্রকাশিত হলে দেখা গেল যেন এক অদৃশ্য সূত্রে তিনি মহাসূফী জালালুদ্দীন মুহম্মদ বল্খীর মসনবী-ই-মানবী'র তত্ত্বরাজি আহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল্লামা মওলানা জালালুদ্দীন বল্খীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থে তা তিনি উল্লেখও করেছেন অজস্রভাবে। এক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

এসো! আমি পীর রূমীর শরাবখানা থেকে এমন শরাব এনেছি,
যা সদ্য আহরিত দ্রাক্ষারস থেকেও সদ্যতর।

তিনি শুধু জালালুদ্দীন মুহম্মদ বল্খীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ক্ষান্ত হননি, ফার্সী ভাষার একাধিক কবির কাব্য নিয়ে তিনি প্রচুর পড়াশোনা ও গবেষণা করেছেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিভিন্ন স্থানে তা উদ্ধৃত করেছেন। নানা প্রসঙ্গে কারো কারো নামও তিনি উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়া কোনো স্থানে তাঁদের কবিতার ছত্রাবলীও নিজ কবিতায় অত্যন্ত সুচারুরূপে সন্নিবেশিত করেছেন।

এ দার্শনিক কবির ফার্সী কাব্যগ্রন্থাবলী বর্তমানে ছয়খন্ডে সংকলিত হয়েছে।

প্রথম ঃ *মসনবী আসরার ও রমুয।* এর প্রথম অংশে *আসরার-ই-খুদী* ও দ্বিতীয় অংশে *রমুয-ই-বেখুদী* সংকলিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ *যবুর ই আযম।* এর প্রথমাংশে রয়েছে গযল সংগ্রহ, দ্বিতীয় অংশে গুল্শন ই রাযই যাহিদ কাব্যগ্রন্থ।

তৃতীয় ঃ *পয়াম-ই-মশ্রিক।* এর প্রথমে ভূমিকার পর 'লালায়ে তূর' শিরোনামায় দু'টি বয়েত দ্বারা সূচনা করা হয়েছে, আর এর দ্বিতীয় অংশের নাম 'আফ্কার'; এতে রয়েছে গযল, কেতা, ছন্দোবদ্ধ কবিতাবলী ইত্যাদি। তৃতীয় অংশে রয়েছে 'মায়ে বাক্বী' শিরোনামা শোভিত গযল এবং চুতর্থ অংশে 'নক্বশই-ফিরেঙ্গ' কাব্যগ্রন্থ।

চতুর্থ ঃ *জাবিদ নামা।* এর সূচনায় রয়েছে মোল্লা জালালুদ্দীন বল্‌খীর একটি গযলের প্রথম বয়েতঃ

খোলো ঠোঁট, আমি যে এসেছি আশার মিছ্‌রী নিয়ে;
গুণ্ঠমুক্ত করো তোমার আনন, যেহেতু আমার বাগান হলো–
আরযূ-আকাঙ্ক্ষার ফুলে আনত!

পঞ্চম ঃ এতে রয়েছে দু'টি মস্‌নবী গ্রন্থ-'মুসাফির' ও 'পাস চে বায়েদ কর্দ আয় আক্বওয়াম-ই-শরক্ব'। প্রথমটি তাঁর কাবুল সফরের বৃত্তান্ত, আর দ্বিতীয়টি দার্শনিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক তথ্যাদি ও মতাদর্শসম্বলিত কবিতাবলীর সমাহার।

ষষ্ঠ ঃ আরমগানে হিজায। এটি তাঁর পরলোকগমনের পর মুদ্রিত কবিতা সঞ্চয়ন।

মরহুম আল্লামা ইকবাল আফগানিস্তানের মহামান্য শাহ্‌ ও জনগণের জন্যে অমিত প্রীতি পোষণ করতেন। তিনি আফগানিস্তানকে 'এশিয়া মহাদেশের প্রাণকেন্দ্র' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেছেন যে, এশিয়া হলো একটি মৃন্ময় মূর্তি, আর আফগান জাতি তার প্রাণ।

শহীদ নাদির শাহ্‌-এর দরবারে উপস্থিতি উপলক্ষে আল্লামা তাঁর প্রতি এভাবে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছিলেন ঃ

সেই গগনস্পর্শী প্রাসাদে আমি শাহকে দেখলাম
এক মহানুভব দরবেশের বেশে
তাঁর চত্রি-মাধুর্য ত্বরিতে মান-মন জয় করে নেয়
সেখানে নেই কোনো শাহী জাঁক-জমকের স্থান,
আমি সেই মহান শাহিনশাহের সম্মুখে দাঁড়ালাম
যেন হযরত উমর-এর দরবারে একজন নিঃসম্বল ব্যক্তি।
তিনি একজন মিতভাষী, সরল পোশাকধারী, সংগ্রামী
নম্র ভদ্র ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি।

'মুসাফির' গ্রন্থে বাদশাহকে সম্বোধন করে তিনি বলেছেন ঃ

হে বাদশাহ! শাহী লেবাস তোমাকে খুব মানিয়েছে,
তোমার ছায়া আমাদের মৃত্তিকায় স্পর্শ মণির মতো।
তোমার অস্তিত্বই বাদশাহীর তুলাদন্ড।
তোমার শৌর্য রাজ্য ও রাজত্বের রক্ষাব্যূহ।
হে বিজয়ের ঐতিহ্যবাহী! তোমার রাজ্যাভিষেকে
আহমদ শাহ্‌ আবদালীর শান-শৌকত পুনরুজ্জীবিত।

আল্লামা ইকবালের প্রতিভা বহু বিচিত্র ও বহু বর্ণবিশিষ্ট। তাঁর কাব্যকীর্তি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে এবং হয়ে থাকে। আজকের সংক্ষিপ্ত ভাষণে যৎকিঞ্চিৎ বলবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু না বলা অনেক কথা রয়ে গেছে। সাহিত্য, কাব্য ও জ্ঞান-পিপাসুবৃন্দ নিজেরাই তাঁর বইগুলো পড়লে নিঃসন্দেহে সবিশেষ উপকৃত হবেন এবং তাসাউফ, মা'রেফত ও দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বাবলী প্রচুর পরিমাণে আহরণ করতে পারবেন।

ইন্দোনেশিয়া

জাকার্তায় ইন্দোনেশীয় মস্‌জুমী পার্টির সভাপতি মুহম্মদ নাসির বলেন–

আজ আমরা সমবেত হয়েছি ইসলামের একজন শ্রেষ্ঠতম সন্তানের প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে। মরহুম মুহম্মদ ইকবাল ছিলেন কবি, রাজনীতিক এবং দার্শনিক। নিঃসন্দেহে বিশেষভাবে ইন্দো-পাক উপমহাদেশের এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ আনতে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রদূত। তাঁর চিন্তাধারার কাব্যময় প্রকাশ ইন্দো-পাকিস্তানের মুসলিম সম্প্রদায়কে জাগিয়ে তুলেছিল। বিশেষভাবে রাজনৈতিক কারণে এবং ইসলাম ধর্ম ও ইসলামী মূলনীতিসমূহের অপব্যাখ্যার দরুন ঝিমিয়ে পড়া মুসলিম জনগণের বিবেককে তিনি প্রবলভাবে আন্দোলিত করে তুলেছিলেন তাঁর তেজোদীপ্ত বাণীর স্পর্শে।

দুঃখের বিষয়, ইকবাল সম্বন্ধে আমার যৎসামান্য জ্ঞান লাভ হয়েছে তাঁর লেখার অনুবাদ পড়ে। তাঁর সব কাব্যগ্রন্থ রয়েছে উর্দু ও ফার্সী ভাষায়। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য কখনও সম্পূর্ণরূপে ধরা পড়ে না। আমার জন্যে অত্যন্ত সুখের বিষয় হতো যদি আমি তাঁর কবিকীর্তি তাঁর লিখিত ভাষায় পড়ে নিতে পারতাম। তা ছাড়া মুসলমান হিসেবেও এ ভাষাগুলো আমাদের জানা উচিত; কেননা, এতে মুসলিম জগতের বিভিন্ন প্রান্তের ভাবধারার সাথে পরিচিত হবার আমাদের সকলের সুযোগ মিলতো। আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় মুসলিম জগতের শ্রেষ্ঠতম সাহিত্যকীর্তি ও দার্শনিক জ্ঞান লিপিবদ্ধ রয়েছে–যা সব দেশের মুসলমানদের অবহিত হওয়া কর্তব্য।

একথা প্রমাণ করতে যাওয়া অনাবশ্যক যে, ইকবালের হৃদয়গ্রাহী কবিতাস্তোত্রই পাক-ভারতীয় মুসলমানদের অন্তরে ইসলামের নিবন্ত আলোকবর্তিকাকে আবার শত শিখায় জাগরুক করে তুলেছিল। তাঁর ভাষা ছিল স্পষ্ট এবং নির্দেশ ছিল প্রখর। স্ব-সম্প্রদায়কে তিনি যে আত্ম-নির্ভরতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের বাণী শোনালেন, তার শক্তি এত প্রবল ছিল যে, তার প্রত্যক্ষ ফল আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি পাকিস্তান রাষ্ট্রের পত্তনে। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে তাদের বিগত দিনের গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, তাদের বর্তমান দুর্দশার জন্যে কেঁদেছেন এবং তাদেরকে ভবিষ্যতের আশার আলোকে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাদেরকে তিনি আলস্যে সময় কাটাবার অবসর দেননি; বরঞ্চ তাঁর খুদী দর্শনের আঘাতে উচ্ছ্বসিত করে তুলেছেন! বীরদর্পে তিনি বলেছেনঃ

তোমার খুদীকে এমনভাবে উন্নত করো, যাতে
তোমার অদৃষ্ট নির্ধারণের পূর্বেই
স্বয়ং অদৃষ্টবিধাতা তোমাকে জিজ্ঞাস করতে বাধ্য হোন ঃ
'বলে দাও–কি আমি লিখবো!'

ইকবালের খুদী-তত্ত্বের উপক্রমণিকা তাঁর কাব্যগ্রন্থ *'শিকওয়াহ'* এবং *'জওয়াব-ই-শিকওয়াহ্'*-তে সুন্দরভাবে বিবৃত হয়েছে। আলতাফ হুসেন কর্তৃক ইংরেজীতে অনূদিত এবং পারভেজ-লিখিত ভূমিকাসম্বলিত এই যুগান্তকারী কাব্যগ্রন্থ দুইটি *The Complaint and the Answer* নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কাব্যগ্রন্থটি হলো আল্লাহর জবাব। অনুবাদ পুস্তকের ভূমিকাটি এত সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ যে, আমি এর কিছুদূর উদ্ধৃত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। পারভেজ লিখেছেন ঃ

'প্রকৃতক্ষে ইকবাল এসব অনুযোগে স্বয়ং অংশীদার নন আর তিনি আল্লাহর প্রতি দোষারোপও করেন নি। তিনি কেবল নিজ সমকালীন মুসলিমদের ভাবধারা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আসলে এ ভাবধারার উৎস হলো, তাঁর মতে, মানব প্রকৃতির বিকৃতি–যা থেকে মানুষ আত্মবিশ্লেষণ-বিমুখ হয়ে পড়ে এবং নিজের দুর্দশার সান্ত্বনা পেতে চায় অন্যের প্রতি দোষারোপ করে। কবির বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তাঁর অবলম্বিত পন্থা অত্যন্ত ফলদায়ী হয়েছিল। মুসলিম সম্প্রদায়ের অবচেতন মন আত্মপরীক্ষার গ্লানিকে এড়িয়ে যেয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত দুর্দশার জন্যে নিয়তিকে দোষারোপ করে চলেছিল। 'শিকওয়াহ্ হলো' এ পুঞ্জীভূত তিক্ততার সংকলন। এভাবে মুসলিমদের অধোগতির প্রতিটি ধারার ওপর কৃতকার্যতার সাথে সৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভাগ্যবিধাতাকে যা বলবার থাকতে পারে, সবকিছু বলে ফেলে তারপর তিনি 'জওরাব-ই-শিক্ওয়াহ রচনা' করেন। এতে তাঁর স্বজাতির আত্মপ্রতারণার মোহজনিত বুদ্‌বুদ সমাবেশকে তিনি তীব্র কষাঘাতে ছিন্নভিন্ন করেছেন। 'জওয়াব'-ই-শিক্ওয়াহ্তে ইকবাল মুসলমানদের প্রতিটি ক্ষতস্থানের দিকেই নির্ভুল অঙ্গুলি সংকেত করেছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেন যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি কোনো অবিচার করেননি। অবিচার তারা নিজেদের ওপর নিজেরাই করেছে। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তাদের অদৃষ্টবাদ আত্মপ্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়–নিজেদের ভ্রান্তি ও অক্ষমতাকে ঢাকা দেবার জন্যেই তারা এর আশ্রয় নিয়েছে। তিনি আরও বললেন যে, তাদের শ্রেষ্ঠতম উত্তরাধিকার সম্পদ কুরআনের প্রতি যদি তারা সত্যিকার মন নিয়ে ফিরে তাকায়, তা হলে তারা যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে, তা-ই লেখা হবে তাদের অদৃষ্টের ফলকে।

'শিক্ওয়াহ' এবং 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়াহ'-এ দুই যুগান্তকারী কাব্যগ্রন্থে ইকবালের প্রথম জীবনের চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করেছে-এ কথা উপরে বলেছি। আমার মতে, তাছাড়াও, এতে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের অতীত এবং বর্তমান ছায়াপাত করেছে এবং মুসলিম জগতের জন্যে তাদের পূর্ব নির্ধারিত আদর্শ ও পথের দিকে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তা হলো পবিত্র কুরআন ও ইসলামী জীবননীতি।

এখন আমি ইকবালের একটা দিক উন্মোচনের চেষ্টা করবো ঃ

তিনি একাধারে ছিলেন একজন কবি, শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ, সমালোচক, রাজনীতিক এবং দার্শনিক। তাঁর প্রতিভার প্রতিটি দিকে আলোক সম্পাদিত করবার আশা করা দুরাশা মাত্র। এ রকম একটি বহু বিচিত্র প্রতিভা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, অতি দুর্লভও বটে। ইকবাল নিজেকে যতভাবে যত ক্ষেত্রে প্রকাশ করেছেন তার শুধু একটা অগভীর পরিচিতি দানও এখানে সম্ভব নয়। এখানে আমি শুধু তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিষয় কিছুটা উল্লেখ করবো। ইসলামী নীতিভিত্তিক রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর ধারণা কি ছিল?

তাঁর কল্পিত ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য কার্যের ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। খাঁটি দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমি তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতা সংগ্রহ গ্রন্থ 'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন' থেকে এ সম্পর্কে কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

'ইসলামের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব বলে দু'টি আলাদা শ্রেণী মনে হোক্ না কেন– তার মূল্যায়ন হবে, যে মনোবৃত্তি থেকে তা সম্পাদন করা হলো সে মনোবৃত্তির প্রেক্ষিতে। এ অদৃশ্য মানসিকতাই কাজটির শেষ তাৎপর্য নির্ধারণ করবে। মানব-জীবনের যে অন্তহীন সম্পর্ক-পরম্পরা রয়েছে, তার সাথে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যে কোনো কাজ করা হলো, তা-ই হবে ঐহিক বা ধর্মবহির্ভূত। আর সেই কাজই হবে অধ্যাত্ম-আশ্রয়ী– যদি তা এই সম্পর্ক পরম্পরা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে করা হয় বা তার সাথে সুসামঞ্জস্য হয়। ইসলামের একই সত্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে উপাসনালয় এবং অন্য দৃষ্টি থেকে রাষ্ট্ররূপে প্রতিভাত। এ কথা সত্য নয় যে, গির্যা বা মসজিদ হলো সত্যের এক পিঠ্ আর রাষ্ট্র তার উল্টো পিঠ। ইসলাম হলো একটিমাত্র অবিভাজ্য সত্য যা শুধু দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যের ফলেই বিভিন্নরূপে দেখা দেয়।'

রাজনীতি ও ধর্মকে আলাদা করতে হবে -এ নীতির পোষকতায় অনেক শক্ত এবং কতকটা আন্তরিকতাপূর্ণ যুক্তি উত্থাপিত হয়েছে। এ নীতির মূলে রয়েছে ধর্ম ও রাষ্ট্রের ভিন্নত্বের ধারণা। পাশ্চাত্য জগতে কিভাবে এ রাষ্ট্র-ধর্ম-সম্পর্কের ধারণা গড়ে উঠেছিল, সে ইতিহাস আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরবার প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই জানি যে, এই রাজনৈতিক মতবাদ, অথবা বলুন–দার্শনিক চিন্তা গড়ে উঠেছিল সীজারের আধিপত্যের ক্ষেত্র এবং পোপ-এর আধিপত্যের ক্ষেত্র আলাদা করবার উদ্দেশ্যে। এ মতবাদ যখন সোৎসাহে এবং বৃহদাকারে ছড়িয়ে পড়লো, তখন শেষ পর্যন্ত দেখা গেলো যে, মানুষের সাংসারিক জীবনের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা পুরোপুরি লোপ পেয়ে বসেছে। এতে মানব মনের অন্তর্নিহিত যুক্তিবাদ অধ্যাত্মচিন্তার অভিভাবকত্ব থেকে নিজেকে ক্রমশঃ মুক্ত করে নিয়ে প্রকট আকারে দেখা দিলো। এর ফল ফললো ঐহিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের অপ্রতিহত প্রভুত্ব রূপে; এবং তা থেকে জাতি ও বর্ণবিদ্বেষ দেখা দিলো, কয়েকটি দলবিশেষের হাতে সম্পদ হরেল পুঞ্জীভূত, সুবিধাভোগী কতকগুলো শ্রেণী গড়ে উঠলো, শ্রেণীসংগ্রাম দেখা দিলো এবং এক দল মানুষ অন্য দলকে চিরস্থায়ীভাবে শোষণ করবার হাতিয়ার শান দিতে লাগলো। এ সব কিছুর সামগ্রিক পরিণাম হলো ঃ মানুষে মানুষে ঘৃণা ও প্রতিহিংসার কদর্যতম দানবীয় প্রকাশ এবং একের পর এক বিশ্বযুদ্ধের আবির্ভাব।

ইকবাল তাঁর কাব্যে বারবার করে এদিকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মানবাত্মাপোষিত স্বর্ণযুগ দিন দিন তিরোহিত হতে চলেছে আর তার স্থান দখল করছে বাস্তবধর্মী লৌহযুগ। শাশ্বত নীতিমূলক ধারণাসমূহ অমার্জিত উপযোগবাদের আঘাতে ভেঙ্গে পড়ছে–যা পথ করে দিচ্ছে নির্ঘাত বণিকতন্ত্রের। এই ধর্ম ও রাজনীতির পৃথকীকরণ এবং তার প্রতিফল সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ

সুবুদ্ধি ও ধর্ম এখন তোমার খামখেয়ালির শিকার,
প্রেমকে তুমি পরিণত করেছ ব্যবসায়ের চালে।
তোমার স্নেহপ্রীতি হলো আসলে একটা রোগ।
তোমার ঘৃণা ডেকে আনে অপমৃত্যু।
তোমার বাস্তবধর্মিতা
মানুষকে অপহরণ করে এনেছে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য থেকে।
বিজ্ঞান কতই না সমস্যার সমাধান করলো।
কিন্তু তোমাকে সে দিয়েছে শুধু চেঙ্গিসের চাহনি।
তোমার মৃত্যুই পৃথিবীকে দেবে নবজন্ম–
–একটু সবুর করো এবং দেখো তোমার পরিণতি!

ইকবাল সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রবাদ এবং মার্ক্সীয় সমাজবাদ–দু'টোই মানুষের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন। কার্ল মার্কসের সমাজবাদকে তিনি উল্লেখ করেছেন ঔদরিক সাম্যবাদ বলে, আত্মার বা মানবত্বের সাম্যবোধের সাথে এ সম্পর্কহীন। একইভাবে তিনি ধনতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, বর্ণ-বৈষম্যবাদ ইত্যাদিরও তুলনা করেছেন দেহের স্থূলত্বের সাথে। তিনি বলেছেন ঃ

দুয়েই পোষণ করছে একটি অস্থির ও অধৈর্য আত্মা।
দুয়েই আল্লাহ্-দরবারে পরিচিতহীন এবং মানুষের কাছে প্রবঞ্চক।
একজনের আহার হলো বিদ্রোহবহ্নি,
অন্যের আহার রাজকোষ;
আর এ দুই যাঁতার মধ্যে
মানুষ মরছে পিষ্ট হয়ে।
একে নিরর্থক করে দিচ্ছে বিজ্ঞানধর্ম ও আর্টের আদর্শ,
অন্য দেশ থেকে শুষে নিচ্ছে জীবন,
হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছে গ্রাস।
আমি দুইকেই দেখেছি বস্তুর রসাতলে নিমজ্জিত,
তাদের দেহে আলোকের প্রদর্শনী
কিন্তু হৃদয়ে অন্ধকার।

ধর্ম ও রাজনীতি পরস্পর নিরপেক্ষ বলে যে মতবাদ আজকের পৃথিবীতে সর্বত্র প্রচলিত, তা হলো ধর্মের পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে না পারারই ফল। আজকের জীবনের ওপর বস্তুতন্ত্রের প্রবল প্রতিপত্তির জন্যেই এ ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অতএব ধর্ম কি এবং তার কার্যকারিতাই বা কি কি–সে প্রসঙ্গে আজ আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ব্যক্তিজীবনে মানুষের যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠতম আত্মিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে ধর্মই হবে পথপ্রদর্শক। আল্লাহ্ ও মানুষের এবং মানুষ ও মানুষের সম্পর্ক যথার্থ পর্যায়ে আনয়ন ও রক্ষণে ধর্মই হবে সহায়ক ও নিয়ন্ত্রক। এতদুদ্দেশ্যে মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ধর্মের থাকবে অবাধগতি। এখানে আমরা রাজনীতিকেও দেখতে পাবো মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্র হিসেবে। রাজনীতি কি জীবনের মাত্র একটি দিক নিয়ন্ত্রণ করে– না সবদিক? নিশ্চয়ই রাজনীতি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি দিক মাত্র; কিন্তু ধর্ম মানবীয় সম্পর্কের সব দিক অধিকার করে আছে। সুতরাং দেখাই যাচ্ছে যে, মানবীয় সম্পর্কের সব দিকে বিস্তারশীল ধর্মকে তার কোনো একদিক থেকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। অতএব, আমার মতে, এতখানি অভিজ্ঞতার পরেও যারা রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন দেখতে চায়, তারা ধর্মকে অতি সংকীর্ণ দৃষ্টি দিয়েই দেখে। তাদের চোখে ধর্ম হয়তো শুধুমাত্র ব্যক্তি মানুষের আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক সূত্ররূপে প্রতিভাত অথবা কতকগুলো নৈমিত্তিক আচার-অনুষ্ঠানের সমাবেশ। কিন্তু আমাদের ইসলাম সম্বন্ধে ধারণা তা নয়। ইসলাম মূলত হলো 'তৌহীদ' বা একেশ্বরবাদ। ইকবাল তাঁর বক্তৃতাবলীতে উল্লেখ করেছেন ঃ

> 'কার্যকরী ধারণা হিসেবে তৌহীদ-এর গূঢ় অর্থ হলো সাম্য, একতা ও স্বাধীনতা। আমি আবার 'কার্যকরী ধারণা' কথাটির ওপর জোর দিচ্ছি।' সে সূত্রে তিনি আরও বলেন, 'ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'রাষ্ট্র' হলো এমন একটি প্রচেষ্টা যা এই আদর্শ-নীতিকে স্থান-কালের প্রেক্ষিতে অভিব্যক্ত করে তোলে –এবং নির্দিষ্ট মানবীয় সংস্থাবলীতে রূপায়ণে অনুপ্রাণিত করে।' আমি এখানে উল্লেখ করতে পারি যে, তিনি জোর দিয়েছেন ইসলামী নীতির স্থান-কালে অভিব্যক্তির ওপর।

এ কথা অনেকে বলে থাকেন যে, রাষ্ট্রকে ইসলামী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে তা ধর্মীয় রূপ নেবে। এ প্রসঙ্গে ধর্মীয় রাষ্ট্র বা থিওক্রেসী কাকে বলে– তা আমাদের ভাল করে বুঝে নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। থিওক্রেসীকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তৌহীদভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রকেই নিঃসন্দেহে থিওক্রেসী বলতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে গেলে ব্যাপারটির তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হবেন 'পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিভূদের একজন, যিনি নিজে এই বিশিষ্ট আসনের নিরাপদে আশ্রয়ে থেকে যথেচ্ছাচারমূলক রাজ্য শাসন করে যেতে পারেন। এ অবস্থায় একজন মুসলিম হিসেবে আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে বলবো যে এ শাসন-সংস্থা কিছুতেই ধর্মীয় রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারে না। আসলে ইসলাম মৌলিকভাবে থিওক্রেসী-বিরোধী, কেননা ইসলাম জাযকবৃত্তি স্বীকার করে না। পবিত্র কুরআন অনুসারে মানুষ হলো পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিভূ (খলীফাহ্)। ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে কতকগুলো সহজ-সরল নীতি– যেমন গণতন্ত্র, স্বাধীনতা (চিন্তার স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা ইত্যাদি), সাম্য, সহনশীলতা, সামাজিক ন্যায় বিচার ইত্যাদি; এবং এ সব মৌলিক-

মানবীয় অধিকারের সাথে আমাদের উপর আরোপ করেছে মানুষের সমষ্টিগত উপকারার্থে কতকগুলো মৌলিক-মানবীয় বর্তব্য। পৃথিবীর মনুষ্যজাতির বৃহত্তর অংশ আজ জিজ্ঞাসা করছে ঃ কি করে আর একটি মহাদুর্যোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায়?

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ বিষয় নিয়ে আন্তরিকতার সাথে যে-সব মনীষী চিন্তা করে থাকেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই মত হলো ঃ প্রকৃতির বস্তুমূলক উপকরণাদির ওপর অধিক থেকে অধিকতর কর্তৃত্ব অর্জনের প্রেরণায় মানুষ আজ আধ্যাত্মিক ভারসাম্য বর্জন করে নির্জলা জড়বাদী জীবনদর্শন অবলম্বন করেছে; সেহেতুই আজকের এ মহাসংকট। এর প্রতিকারও রয়েছে জীবনের আধ্যাত্মিক দিক ও বাস্তব দিকের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধানে। আজ মানুষের জন্যে যা চাই, ইকবালের অনুসরণে আমি বলতে চাই যে, তা হলো ঃ

১। বিশ্বজগতকে আধ্যাত্মিক আলোকে অবলোকন,

২। ব্যক্তি মানুষের অধ্যাত্মিক উজ্জীবন, এবং

৩। মানব সমাজের অধ্যাত্মভিত্তিক উন্নয়নের জন্যে বিশ্বজনীন নীতিমালা গ্রহণ।

আমরা সবাই জানি যে, আল্লাহর প্রেরিত পুরুষদের মারফত ঐশীবাণী এসেছে এক একটা সভ্যতার এমন সংকট মুহূর্তে যখন সরল অগ্রসরমান পথ থেকে বিচ্যুতি ও পশ্চাদবর্তনের ফলে তা ধ্বংস ও বিলুপ্তির চরম প্রান্তে এসে পৌছেছে, যখন মানুষ অজ্ঞতা, অশুভবুদ্ধি ও আলস্যের শিকার হয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠতর স্পৃহাকে অগ্রাহ্য করে বাস্তববাদের স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছে এবং বর্বরতাবশত নিজেদের মধ্যে এবং পরস্পরে হানাহানিকে জীবনের চরম লক্ষ্য জ্ঞান করেছে; যখন বিচারবোধ ও শৃঙ্খলা পদদলিত হয়েছে এবং কোনো মহত্তর মানবতাবোধের প্রতি আনুগত্য উপেক্ষিত হয়েছে।

এখন দেখা যাক, বর্তমানে আমাদের চারপাশে কি ঘটছে। আমাদের জীবনকালে আমরা দু'টি বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি। এখন আমরা বেদনাপ্লুত দৃষ্টি মেলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বিশ্বশান্তির পাহারাদারেরা ব্যস্ততা ও মত্ততার সাথে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটাবার পাঁয়তারা করছেন। দু'টি মহাসমরের যাতনা আমাদেরকে ভোগ করতে হয়েছে। আমরা দেখেছি, এ সময়ে মানুষের প্রতি মানুষ কেমন ব্যবহার করেছে। এখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি আল্লাহ্র প্রতি মানুষের মনোভাব কোন্ পর্যায়ে নেমে এসেছে–যার প্রকৃত কারণ হলো সাংসারিক জীবন থেকে আধ্যাত্মিক জীবনকে পৃথকীকরণ। এ থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো এমন একটা সংস্কৃতির উদ্ভাবন যা নিজ অন্তর্নিহিত আবেগ বলে মানুষকে আবার তার চারিত্রিক একত্বে অধিষ্ঠিত করতে পারবে –যাতে তার সার্বিক আনুগত্য থাকবে একটিমাত্র কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রকের কাছে।

অতএব আমি আজ এ মঞ্চ থেকে এক আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে বিশ্বাসী সব মানুষের কাছে আবেদন জানাই– তাঁরা যেন সজাগ হয়ে ওঠেন, আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস নেন, জীবনের ওপর ধর্মের কার্যকারিতাকে তার স্থান ছেড়ে দেন, আর বাস্তববাদ থেকে উদ্ভূত মানুষের জন্যে অপকারী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করতে একত্রিত হোন। এভাবে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রভাবে এনেই আমরা আমাদের আজকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি থেকে লব্ধ শক্তিসমূহকে মানুষের জন্যে কল্যাণকর কাজে

নিয়োজিত করতে পারি। বিজ্ঞান একাধারে সৎ ও অসৎ। এর অসৎ দিকটাই আজ আমাদের সামনে অধিকতর প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে বা প্রকট করে দেখানো হচ্ছে। এখন বিবেকবান ও আল্লাহ্-বিশ্বাসী মানুষদের ওপর দায়িত্ব বর্তেছে, আধ্যাত্মিকতার আওতায় এনে বিজ্ঞানের কল্যাণমূলক দিকটাকে মনুষ্য সমাজে তুলে ধরবার। এতে যদি আমরা কৃতকার্য না হই, তা হলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে আমরা অনপনেয় দোষে দোষী সাব্যস্ত হবো।

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে আমি পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হযরত মুহম্মদের (সাঃ) আবেদনটি উপস্থাপিত করছি ঃ

> 'হে কিতাবপ্রাপ্ত জাতিগণ! চলো, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একটি ন্যায্য মীমাংসায় আসি যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারুর আরাধনা করবো না।'

আজ এসব ধর্মাবলম্বীদের কাছে মানবতা ফরিয়াদ করছে– জড়ের পূজা ত্যাগ করে আল্লাহ্র আনুগত্যে ফিরে আসতে। আজকে একান্ত প্রয়োজন দেখা দিয়েছে জীবনে আধ্যাত্মিক মূল্যমানের পুনর্মূল্যায়ন করবার। বিশেষ করে, আজকের মুসলমানদের জন্যে অত্যাবশ্যক হয়ে দেখা দিয়েছে ইসলামী সাম্য, সহনশীলতা ও স্বাধীনতার মৌলিক নীতিসমূহের নতুন ব্যাখ্যায়নের।

শুধু মুসলমান নয়, বর্তমান প্রতীচীর কোনো কোনো প্রখ্যাত চিন্তা-নেতাও এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, মানবজাতিকে চরম দুর্দশা থেকে বাঁচাবার যোগ্যতা ইসলাম ধর্মে রয়েছে। এ উদ্দেশ্যেই ইকবাল বর্তমানকালের মুসলমানদের সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

> 'আজকের মুসলমানদের উচিত তাদের যথাকর্তব্য বুঝে নেওয়া, (কুরআনীয়) মূল নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে সমাজ জীবনকে পুনর্গঠিত করে তোলা এবং এখন পর্যন্ত মাত্র অংশতঃ বিকাশপ্রাপ্ত ইসলামী উদ্দেশ্যাবলীর আরও গভীরে প্রবেশ করে, সে আবিষ্কৃতির আলোকে এমন পারমার্থিক গণতন্ত্রের উদ্বোধন করা যা হলো ইসলামের চরম উদ্দেশ্যের কালক্রমিক রূপায়ণ।'

কামনা করি এ আহ্বান আজকের মুসলিম বিশ্বের অন্তরে গিয়ে পৌছাবে। বিশ্বের সমক্ষে তাদেরকে দেখাতে হবে যে, ইসলামের নীতিসমাহার শুধু মুসলমানদের জন্যে নয়, বরঞ্চ সমগ্র মানবজাতির জন্যে এক অভূতপূর্ব অবদান। এটা দেখাবার শ্রেষ্ঠতম পন্থা হলো নিজেদের গৃহে ও জীবনে প্রথমে এসব গুণের রূপায়ণ। ইতিহাসে আমাদের জন্যে অনেক নযীর রয়েছে। আমাদের সামনে রয়েছে হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এবং খুলাফায়ে রাশেদীন-এর জীবনাদর্শ।

আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চাইনে। কিন্তু এ স্থলে একটা ঐতিহাসিক দলীল আপনাদের সামনে উপস্থিত করা সমীচীন হবে। এ থেকে আপনারা জানবেন, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) ইসলামের ইতিহাসের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কি পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। হযরত সেন্ট ক্যাথেড্রিন মঠের সাধুদেরকে এবং খৃষ্টানদেরকে যে সনদ দিয়েছিলেন আমি এখানে তারই উল্লেখ করছি। সনদটিতে ইসলামী নীতিমালা কার্যকরীকরণের ব্যাপারে এত স্বচ্ছ ও সরাসরি ব্যাখ্যা রয়েছে যে,

আমি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আমীর আলীর 'হিস্ট্রী অব দ্য স্যারাসেন্‌স্'-গ্রন্থ থেকে তার সারমর্ম উদ্ধৃত করে দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি ঃ

> এই সনদ বলে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) খ্রীষ্টানদের জন্যে বিশেষ বিশেষ সুবিধা ও দায়িত্বমুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে তাদেরকে যে যে অধিকার দেওয়া হলো, তা লংঘন করলে মুসলমানদেরকে গুরুতর শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে বলেও স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হলো। এই সনদে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে দায়িত্বগ্রহণ করলেন যে, তিনি খৃষ্টানদেরকে রক্ষা করবেন, তাদের ওপর যাতে কোনো অনিষ্ট না পৌঁছায় তা দেখবেন এবং তাদের গির্যাসমূহের ও পুরোহিতদের বাসস্থানসমূহের নিরাপত্তা বিধান করবেন।

এই একই কর্তব্য তিনি তাঁর অনুসারীদের জন্যেও বাধ্যতামূলক করলেন। খৃষ্টানদের ওপর অন্যায়ভাবে কর বসানো, কোনো বিপক্ষে তাঁর পদ থেকে বিচ্যুত করা, কোনো খৃষ্টানকে জোরপূর্বক ধর্মচ্যুত করা, কোনো সাধুকে তাঁর মঠ থেকে বহিষ্কৃত করা, কোনো তীর্থযাত্রীকে তাঁর গন্তব্যে বাধা দেওয়া, মুসলমানদের মসজিদ বা গৃহ-নির্মাণের জন্যে কোনো গীর্জা ভেঙ্গে ফেলা কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করা হলো। আরও বিধান দেওয়া হলো যে, যে-সব খৃষ্টান নারী মুসলিমদের সাথে বিবাহিতা হবে, তারা তাদের নিজ ধর্ম পালন করবে এবং এ ব্যাপারে তাদের ওপর কোনো প্রকারের জবরদস্তি বা কোনোরূপে তাদের বিরক্তি উৎপাদন করা হবে না। খৃষ্টানগণ গির্যা ও মঠ মেরামত বা অন্যান্য স্বধর্মীয় কাজে অসুবিধার সম্মুখীন হলে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসতে।

এ সনদ থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, প্রকৃত মুসলমানদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য– অন্যান্য গুণাবলীর সাথে অবশ্য– হলো সহনশীলতা মনোবৃত্তি। লক্ষ্যণীয় যে, এ সহনশীলতা ভীরুতা বা কোনো উপস্থিত শঙ্কা থেকে উদ্ভূত নয়, বরঞ্চ সৎকর্মশীলতা ও নীতি-নিষ্ঠার ওপর দৃঢ় প্রত্যয়জনিত। এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, খাঁটি মুসলিম হিসেবে অন্যদের জীবন, মর্যাদা, ধর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রয়োজন হলে মুসলমানদেরকে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। ইসলামের ইতিহাস এ রকম বহু বহু উদাহরণে সমৃদ্ধ। ইকবাল মুসলিমের এই সামগ্রিক জীবনোদ্দেশ্যকে দু'টি মাত্র সুন্দর ছত্রে প্রকাশ করেছেন ঃ

> পুনর্বার গ্রহণ করো সাহস সততা ও ন্যায়নীতির শিক্ষা-
> কেননা, তোমাদের ওপরই আবার নির্দেশ আসছে
> জাতিসমূহের নেতৃত্বদানের।

ভারত

দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ইকবাল দিবস উপলক্ষে শ্রী বি. পি. এল. বেদী বলেন-

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল কোটি কোটি এশিয়াবাসী মানুষের চরম দুর্দিন। এখানে মানবীয় মর্যাদার মান তখন নিম্নতম বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছেছিল। এ শতাব্দী ছিল এশিয়াবাসীর একটানা দাসত্বের যুগ– মানসিক, দৈহিক এবং সাংস্কৃতিক, অপর পক্ষে শ্বেত জাতিসমূহের উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্বের কাল। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা এখানে এশিয়াবাসীকে গলরজ্জুবদ্ধ ভারবাহী পশুর মতো ব্যবহার করছিল। এ ইতিহাস।

এখানে-সেখানে মানুষের আত্মা হঠাৎ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল বটে; কিন্তু এসব আকস্মিক ব্যাপার পরাজয়বরণ করতে বাধ্য এবং ফলও তা-ই ঘটেছিল। অবশ্য, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় সিপাহী বিপ্লবের কথা নিশ্চয়ই সকলের মনে আছে। এ বিদ্রোহ ঘটেছিল অপেক্ষাকৃতভাবে অনেকখানি বৃহদাকারে। কিন্তু এশিয়ার এক অংশ থেকে অন্য অংশের বিচ্ছিন্নতা এত সম্পূর্ণ ছিল যে, কোনা জাতির বা কোনো দেশের ভাগ্যে কি ঘটছে না ঘটছে, অন্য জাতির কাছে তার খবরটা পৌঁছানো পর্যন্ত অসম্ভব ছিল। তদুপরি পরস্পরের মধ্যে যুধ্যমান বহিরাগত ইংরেজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো তাদের নিজ নিজ অধীনস্থ জাতিসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে নৈপুণ্যের সাথে আটক করে রেখেছিল। আমাদের ক্ষেত্রে এ অজ্ঞতার আরও বিশেষ কারণ এই ছিল যে, দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ ভারতের দৃষ্টি সব সময় নিবদ্ধ ছিল ইউরোপের প্রতি। এ শতকের তৃতীয় দশকের প্রথম দিকে মাত্র যখন আমরা কলেজ জীবনে প্রবেশ করেছি, তখন আমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম এক নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক বেদব্যাস প্রমুখ মনস্বী পন্ডিত ব্যক্তিদের গবেষণার ফলে আমরা জানতে পারলাম যে, ভারতের পুরাতন ঐতিহ্যের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাংস্কৃতিক ধারার সুগভীর যোগ রয়েছে। এর সমর্থনে (বর্তমান) মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলের সৌধাবলীর ছবি আমাদেরকে দেখানো হলো। বারাবাদুর মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও এর সাক্ষ্য দেয়। এগুলো আমাদের অতীত গৌরবের স্মৃতি বহন করে।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম জগতের সাথে অবশ্য আমাদের পরিচয় আরও কিছু ঘনিষ্ঠ ছিল; কারণ, পি. অ্যান্ড ও'র জাহাজগুলো তাদের গন্তব্য পথে এডেন বন্দরে নোঙ্গর করতো। তা ছাড়া ইতিহাসের পাঠ্য বইগুলো ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তি (তুরস্ক)-এর কথা আমাদেরকে

স্মরণে রাখতে বাধ্য করতো। বল্কান অঞ্চলের বিরামহীন যুদ্ধ-বিগ্রহের কথাও আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল। আরব দেশ সম্বন্ধে আমাদের আরও একটু ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের কারণ ছিল হজ্জ যাত্রীদের যাওয়া-আসার দৃশ্য। আমাদের বাল্যকালে কিভাবে তাঁদের যাবার বেলায় বিদায় দেওয়া হতো, আর ফিরে আসবার বেলায় স্বাগতম জানানো হতো তা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহের মধ্যে ১৯০৫ সালে জার শাসিত রাশিয়াকে পরাজতি করে জাপান প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল; আর চীন সম্বন্ধে আমরা জানতাম যে, এ ছিল একটি আহিফেনসেবী অলস মানুষদের এবং যুদ্ধংদেহী অস্ত্র ঝনঝন সামন্তপ্রধানদের দেশ।

এই সাধারণ পশ্চাৎপটে উদিত হলেন এক বিরাট ব্যক্তিত্ব যিনি মানুষের জীবনে নতুন অর্থ ও তাৎপর্য আরোপ করলেন। তিনি এলেন হতাশ মনে মর্যাদাবোধের, আর পতিতজনের কাছে বিদ্রোহের বাণী নিয়ে ঃ

ওঠো, জাগো, হে দুস্থজন।
পৃথিবীতে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি তুমি।
জগতটাকে কাঁপিয়ে তোলো।
শক্তিমানের প্রাসাদের দেওয়াল জানালা টেনে নামাও।
যে শস্যক্ষেত্র ক্ষুধার্তের আহার জোগায় না
জ্বালিয়ে দাও তার প্রত্যেকটি ধানের শীষ।

শত শত বছরের দাসত্ববন্ধনে পিষ্ট, অদৃষ্টবাদী কর্মবিমুখ এশিয়াবাসীর কাছে এ আহ্বান অভিনব মনে হলো। ইকবাল আরও এগিয়ে এলেন। একটি গৌরবময় সভ্যতাকে বিজেতার পদতলে লুণ্ঠিত দেখে তাঁর অন্তরাত্মা, তাঁর পুরুষসত্তা নিজেকে অত্যন্ত উৎপীড়িত বোধ করলো। এই সভ্যতা ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরা সব কিছুকেই অদৃষ্টের বিধান বলে ভাবতে শিখেছিল এবং সব কিছুই নিষ্ক্রিয় অন্তর দিয়ে গ্রহণ করে চলেছিল।

ইকবাল মানুষকে নতুন করে গড়ে তুলতে চাইলেন। তিনি সর্বপ্রথম মানুষকে নিয়তির বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড়াতে আহবান জানালেন- এমনকি, নিয়তি-স্রষ্টার মুখোমুখিও এবং তাঁর হাতিয়ার হলো মানবমর্যাদা। তাঁর আক্রোশ সঙ্গীতের অগ্নিশিখায় জ্বলে উঠলো মানুষের শক্তির স্তুতি জানিয়ে;

আমার দিগন্তবিস্তারী উন্মত্ত তাড়নার সম্মুখে
ফিরিশতা জিবরাইল একটি সামান্য শিকার মাত্র।
হে মর্যাদাদৃপ্ত মানুষের শক্তিময় প্রকাশ।
তোমার ফাঁস দিয়ে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠ বেষ্টন করে ধরো!

বিধাতার নির্বাচিত সৃষ্টি হিসেবে নিজের অধিকারের দাবীতে নিজ স্রষ্টার সামনা সামনি মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্যে তিনি মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছেন ঃ

"তোমার মর্যাদাকে এমন উত্তুঙ্গ আসনে অধিষ্ঠিত করো,
যাতে নিয়তির ছাপ ফেলবার পূর্বেই
শক্তিধর স্রষ্টা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হন ঃ

হে জীব। বলো, তোমার কি ইচ্ছে!”

ইকবালের রূঢ় আঘাত দাসত্ব শৃঙ্খলিত মানুষের অসহায়তা ও দ্বিধা দূর করে দিয়ে তাকে মনুষ্যত্বে উজ্জীবিত করে তুলেছে ঃ

কবর বিরক্তি ভরে জিজ্ঞাসা করলো-
আমি তো অন্ধকারে ছিলাম এবং থাকতামও;
কি আপদ! আমি আরও গাঢ় অন্ধকারে হারিয়ে গেলাম কি করে?
আমার বক্ষ কন্দরে এ অসহ্য পূতিগন্ধ কিসের?
নীরবগুঞ্জনে ফিরিশ্‌তাদের বিষণ্ন জবাব এলো-
আজ তোমার অভ্যন্তরে একটা দাসের শব গচ্ছিত হয়েছে!

ইকবালের এই হৃদয় আলোড়নকারী গতিধর্মিতা তাঁকে প্রাচ্যের আকাশের উদ্দীপ্ত নক্ষত্র বলে আখ্যায়িত করেছে। তাঁর এই অন্তর্জ্বালার উৎস ছিল নিজস্ব, আর তা বিকাশলাভ করেছে অনেকখানি তাঁর ইউরোপ প্রবাসের ফলে। এখানে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন রুশো, পেইন, লক, বেন্থাম এবং শিল্-এর গণতান্ত্রিক আদর্শ ও চিন্তাধারা থেকে। তাঁর দার্শনিক চিন্তার ঐশ্বর্য আসে শপেনহাওয়ার ও হেগেল থেকে, আর তিনি নৈতিক মূল্যবোধ গ্রহণ করেন কান্ট থেকে। তাঁর আকাশচারী কল্পনায় রয়েছে গ্যেটে, মিল্টন ও দান্তের গভীর ছাপ। হ্যপ্‌সবুর্গ, রোমনফ এবং হোহেন্‌যোলান-এর সাম্রাজ্যবাদ শৃঙ্খলিত ইউরোপীয় প্রজাসাধারণের দাসজীবন যাপন তিনি স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। রুশ সাম্রাজ্য তো জাতিপুঞ্জের কয়েদখানা বলেই খ্যাত ছিল। অতএব স্বভাবতই ইকবালের আবির্ভাবে প্রাচ্যের আত্মায় একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো এবং এ অভিনব স্ফুলিঙ্গ বন্ধন দশাগ্রস্ত সমগ্র এশিয়ার আসমানে ছড়িয়ে পড়লো শত-সহস্র শাখা-প্রশাখা মেলে।

ইকবালের কাব্যকলা ছিল বিশ্বজয়ী। তাঁর রচনার সর্বপ্রকার ধারাতেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর শক্তিমান গতিধর্মিতা। তাঁর চিন্তাধারার বহুবিচিত্র রেখায় রেখায় ফুটে উঠেছে তাঁর নিজস্ব রোমান্টিক ও বৈপ্লবিক রূপ। তাঁর বিপ্লবাত্মক বাণী যদি তলোয়ারধারে ঝরানো রক্তস্রোতের সাথে তুলিত হয়, তবে তাঁর রোমান্টিক আবেদন তুলিত হবে সুকোমল গোলাপের পাপড়ির সাথে। কিন্তু তাঁর আসল বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর বাণীর এ দু'ধারাই একটি মনোজ্ঞ আধ্যাত্মিক আবেগের সূত্রে সমন্বিত।

তিনি তাঁর মাতার স্মৃতিতে যে শোকগাঁথা রচনা করেছিলেন, তার আবেগমধুর আবেদন বিশ্বসাহিত্যের অন্য যে-কোন শ্রেষ্ঠতম কাব্যকীর্তিতে পাওয়া দুষ্কর হবে। একটি সূক্ষ্ম উপমা ব্যবহার করে তিনি হৃদয়হীনতার ওপর প্রেমের শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নরূপে ঃ

একটি গোলাব-পাপড়ির ধার হিরকের হৃদয়কে টুকরো টুকরো করতে সক্ষম।

চতুষ্পদীর মাধ্যমে কথোপকথনে গভীর ও সংবেদনশীল ভাব প্রকাশে ইকবাল ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর সব রকম কবিকীর্তির একই মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম মানুষের মর্যাদার স্তুতি। এ বিষয়ে তাঁর রচিত বিভিন্ন আঙ্গিকের কবিতা তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে অনায়াসে নিজ নিজ রূপ গ্রহণ করেছে। বিশ্ব মানব যাতে তার ন্যায্য মর্যাদার আসন গ্রহণ করতে পারে, তার প্রচেষ্টায় তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং আজ থেকে আঠাশ বছর পূর্বে, (১৯৩৮) যে জগতে মৃত্যুঞ্জয় মহাপুরুষেরা বাস করেন সে জগতে প্রয়াণ করেছেন।

জন্যে বৈপ্লবিক চিন্তাক্ষেত্রে তিনি পশ্চাৎপদ ছিলেন না। স্বয়ং কায়েদ-ই-আযম জিন্নাহ হেন ব্যক্তি এক সময় তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন যে,

> জাতীয় ভিত্তিতে ভারত বিভাগের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে যাঁরা সর্বপ্রথম চিন্তা করবার সাহস করেছিলেন, ইকবাল তাঁদের পুরোধাস্থানীয়।

অবশ্য তাঁর এ চিন্তা ছিল সমগ্র দেশের দরিদ্রজনেরই স্বার্থে এবং সর্বভারতীর আভ্যন্তরীণ শান্তির প্রয়োজনে। কিন্তু সম্ভবত অদৃষ্টের পরিহাসে ইকবাল স্মৃতিকে এই চরম দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হবে যে, এক দল উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী তাঁকে মুসলিম স্বার্থের ধ্বজাধারী হিসেবেই স্মরণে রাখবে। প্রকৃতপক্ষে, এ হলো ইকবালের জীবন ও কর্মের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ধারণা। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকার মানবতাবাদী এবং তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় রয়েছে সাম্য, স্বাধীনতা এবং প্রেমভিত্তিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের বাণী।

ইকবাল তাঁর খুদী (ব্যক্তিসত্তা) বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ এর উন্নততম প্রকাশ হলো মূল্যমান ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। এর সহায়তায় বিশিষ্টতম ব্যক্তিত্ব অর্জন প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজ পরিচিতি লাভ করে এবং ঈপ্সিতের নিজস্বতার আভাস পায়। এ না হলে সন্ধানী মনের অন্তর্নিহিত প্রকৃত তৃপ্তি পেতে পারে না।

উর্দু বা ফার্সীতে জ্ঞান না থাকায় আমাকে ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যেই ইকবালকে বুঝবার চেষ্টা করতে হয়েছে। তাঁর সাথে বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় কবির লেখারও আশ্চর্য সাদৃশ্য রয়েছে। দান্তে, গ্যেটে, ডান এবং ইংলন্ডের উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক কবি গোষ্ঠীর সাথে ইকবালের বাণী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো জন ডানের প্রাজ্ঞানিক কবিতার সাথে ইকবাল-মানসের সাদৃশ্য। ইকবাল বলেছেন ঃ

> ওহে হৃদয়ের নিগূঢ়তম ইঙ্গিতবাহী প্রেম!
> ওহে আমাদের বপন ও আমাদের ফসল।
> এ পার্থিব আত্মাগুলো আজ জরাগ্রস্ত।
> তুমি এসো, এবং আমাদের দেহকর্দম দিয়ে
> আর এক আদম সৃষ্টি করো।

ইকবাল তাঁর পূর্বসূরীদের অনেকের আদর্শ নিজে বহন করে চলেছেন ঃ তবু তাঁর সৃষ্টির মৌলিকতাও একান্ত স্পষ্ট। বিশেষজ্ঞরা *জাবিদ নামাহ*'কে তাঁর শ্রেষ্ঠতম রচনা বলে মনে করে থাকেন; কালিদাসের শকুন্তলা এবং হোমারের *ইলিয়াড*-এর সাথে এ কবিতাগ্রন্থ তুলিত হয়েছে; *বাঙ্গেদারার* লালিত্য উর্দু ভাষায় অতুলনীয়; *পয়াম-ই-মশ্‌রিক*—যাকে ইকবাল মনে করতেন গ্যেটের *ওয়েস্ট অস্টিলিচের দিভান*-এর প্রতিদান স্বরূপ- ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে বিদ্বজ্জনেরা ভাষার ওপর কবির অগাধ অধিকার এবং সুসংযত প্রকাশভঙ্গির পরিচয় লাভ করেছেন। কাব্যকীর্তির নিদর্শন স্বরূপ এগুলো বহুকাল বেঁচে থাকবে বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

যুদ্ধ এবং যুদ্ধ-পরবর্তী ইংলন্ডের কবিদের মধ্যে মৃত্যু ও ধ্বংস ব্যঞ্জক যে নৈরাশ্যবাদ দেখা দিয়েছে, অথবা নাৎসীদের ইউরোপ বিজয়কাল থেকে ফরাসী কবিদের মধ্যে যে বুদ্ধিবিমুখ জীবনবোধের সৃষ্টি হয়েছে, ইকবাল তার সাথে কখনও সায় দেননি। মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, মঙ্গল ও সুন্দরের প্রতীক

পরম বিধাতাই মানুষের অন্তরে বাসনার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর সৃষ্টিলীলার পর্যায়ে এর পরিপূর্ণতার উপাদানাবলী ছড়িয়ে দিয়েছেন। কবি হৃদয়ের কল্পনা চিরসুন্দরের এই অন্তররূপকে অনুভূতির জগতে ফুটিয়ে তোলে।

এখানে আমরা ইকবালকে দেখতে পাই কবিকে তাঁর কালের ঐশীবাণীর বাহকরূপে দাঁড় করাতে। কবির কাজ হলো মানুষকে সৃষ্টিধর্মী প্রেরণার সহায়তায় উচ্চতম মানসিক স্তরে উন্নীত করা। নিরাশাবাদীকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করে তিনি বলেছেন ঃ

যারা মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করে, ধিক্ তাদেরকে!
আর তাদের সে কবিকে
যে জীবনের আনন্দ থেকে মুখ ফেরায়।

প্রয়োজন দেখা দিলে একমাত্র এই দৃঢ়চিত্ত মুসলিমই ধর্মান্ধদেরকে কড়া কথা শুনিয়েছেন। বাগাড়ম্বরপ্রবণ সূফী নামধারীদেরকেও তিনি পসন্দ করতেন না। আল্লাহর প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস থেকে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে ঃ

সাহসী মানুষই খাঁটি মানুষ,
যে আল্লাহর মুখোমুখি হবার সাহস করে।

তিনি বলেছেন ঃ দোযখ একজন প্রতিশোধপ্রবণ ঈশ্বরের হাতে দন্ডাদেশপ্রাপ্তদের জন্যে চিরস্থায়ী অত্যাচার কেন্দ্র নয়। এটা হলো মানুষের কঠিন হয়ে যাওয়া ব্যক্তিসত্তাকে পুনর্বার সজীব ও উদ্যমশীল করে তুলবার ব্যবস্থারূপ একটি অনুভূতি সমষ্টি। বেহেশ্‌তও একটি ছুটির দিনের বনভোজন নয়। জীবন এক এবং অবিচ্ছিন্ন। পরম সত্য প্রতি মুহূর্তে নব নব গৌরবে আত্মপ্রকাশ করেন; তাঁর আলোক অনুসরণ করে মানুষ অবিরাম এগিয়ে চলে। এ পরম আলোক ধারণ করবার সৌভাগ্য যে ব্যক্তি অর্জন করেন তিনি কখনও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না। মুক্ত ব্যক্তিসত্তার প্রতিটি কর্ম নব নব পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এবং তাতে তার জন্যে আরও অধিক করে সৃষ্টিধর্মী বিকাশের পথ খুলে যায়। এই হলো স্বর্গীয় বা বেহেশ্‌তী জীবন। অতএব ভীরুতা নয়, সাহসিকতাই হলো স্রষ্টার চ্যালেঞ্জ-এর সমক্ষে মানুষের যথাযথ প্রত্যুত্তর।

ইকবালের আল্লাহ বিশ্বাসের সাথে তাঁর পাঠকদের একমত হবার কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। কিন্তু তিনি তাঁর আরাধ্যকে কোনো বাহ্যিক বিমূর্ত অস্তিত্ব বলে মনে করতেন না। তিনি বরঞ্চ রাজ সিংহাসনের প্রতি আনুগত্যের পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য দাবী করেছেন; এবং যেহেতু আল্লাহই হলেন সর্বজীবনের পরমতম আধ্যাত্মিক ভিত্তিমূল, অতএব আল্লাহর প্রতি আনুগত্য কার্যত রূপ পায় মানুষের নিজের আদর্শ সত্তার প্রতি আনুগত্যে। মানুষের সেবা-ধর্মের প্রতি উৎসর্গিত একটি মানব সমাজ গড়ে তুলবার স্বপ্ন ছিল কবি ইকবালের। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেকের জন্যে সমান সুযোগ সৃষ্টি। এ সমাজ আমাদের জীবনকালে আমাদের মধ্যেই গড়ে উঠবে- এ-ই ছিল তাঁর আশা।

ইকবালের এই মতবাদই এ যুগের মুসলিম মনকে সামন্ততান্ত্রিকতা থেকে আধুনিকতার দিকে দ্রুত টেনে আনতে সহায়ক হয়েছে, আর এই মতবাদের বিশ্বজনীনতাই তাঁকে বিশ্বজনের কাছে প্রিয় করে তুলেছে। *[সিলোন ডেইলী নিউজ, ২১-৪-৬১]*

– ঃ প্রথম খন্ড সমাপ্ত ঃ –

দ্বিতীয় খন্ড

(পাকিস্তান ও বিবিধ)

পাকিস্তান

করাচীতে ইকবাল দিবস পালন উপলক্ষে (১৯৬০) সভাপতির ভাষণে ইরানী রাষ্টদূত মাননীয় ডঃ এ, টি, মুক্তাদেরী বলেন-

ইকবাল কখনও ইরান সফর করেননি; কিন্তু তবুও এ দেশের প্রতি বিশেষ করে এর সংস্কৃতি, এর দর্শন, এর সূফী মতবাদের প্রতি তাঁর অনুরাগ এত প্রবল ছিল যে, তাঁর মতে যদি পৃথিবীর সব রাজনৈতিক সমস্যা তেহরানে বসে আলোচনা ও সমাধানের ব্যবস্থা করা যেতো, তবে মানব জাতির অদৃষ্ট অন্যরূপে প্রতিভাত হতো।

অন্যপক্ষে একজন প্রসিদ্ধ ইরানী কবি বলেছেন ঃ

"বর্তমান যুগের ধ্রুব হলেন ইকবাল এবং স্বতঃই এ-কে বলা যায় ইকবাল যুগ"।

আজকে আমি ইকবালের জীবনবোধ সম্বন্ধে কিছু বলতে আহূত হয়েছি। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা, ইকবালের সমগ্র দর্শন সৌধই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ভিত্তির ওপর। এ ক্ষেত্রে তিনি প্রেরণা গ্রহণ করেছেন মাওলানা জালালুদ্দীন মুহম্মদ বলখী থেকে, এবং এ প্রেরণা থেকেই রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভাবধারার মারফত তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন পাক-ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ও প্রাচ্যের নবজাগরণ প্রচেষ্টায় এবং সাথে সাথে মুসলিম সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে।

তাঁর মতে, আল্লাহ মানুষকে অপরিমেয় শক্তির অধিকারী করেছেন; অতএব কোনো মানুষেরই উচিত নয় নিজেকে অক্ষম, দুর্বল বা নীচ মনে করা ঃ

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে,
নিজ মর্যাদা তুমি বুঝতে পার না।
এমন কি ঝকঝকে মণিমুক্তাও
তার ক্বদর আহরণ করেছে তোমা থেকে;
না হলে, সে একটি পাথর বৈ কিছু নয়।
হে ঈদের চাঁদ।
অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার তোমার সাধ্য নেই।
তোমার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে হাজার হাজার চোখ।
নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো,

কিন্তু নিজ দারিদ্রে হতাশ হয়ো না;
কেননা, তোমার বুকে তারা পূর্ণ চন্দ্রের আবির্ভাব প্রত্যাশী।

কবির এ বাণীর উদ্দেশ্য মানুষ। অতএব কবি চেয়েছেন যে, প্রতিটি মানুষই জীবনের এ মহৎ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করুক এবং তাকে জাগরুক রাখবার জন্যে সতত সচেষ্ট থাকুক। এর জন্যে প্রয়োজন আলস্য, অবহেলা ও পরস্পর বিদ্বেষভাব থেকে মনকে মুক্ত রেখে নিজেকে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত রাখা। তার জানা উচিত যে, এ বিশাল পৃথিবীতে জীবনযুদ্ধে কারুর বিরাম নেই। মানুষ যদি একটি মুহূর্তের জন্যেও আলস্যে গা ভাসিয়ে দেয়, তবে কালস্রোত তাকে নিয়ে যাবে নিশ্চিহ্নতা ও মৃত্যুর দিকে। ঢেউ এবং সাগরতীরের বাদানুবাদরূপে ইকবাল তাঁর এই মতবাদের সুন্দর রূপ দিয়েছেন। এই বহুবিদিত কবিতাটিতে তিনি ঢেউকে উপমিত করেছেন মানব জীবনের সাথে, আর বলেছেন যে, ঢেউ ততক্ষণই ঢেউ থাকে যতক্ষণ সে চলন্ত থাকে এবং এগিয়ে চলে। কিন্তু যখনই তার চলা থেমে যায় তখনই সে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে এবং মৃত্যুগ্রাসে আপতিত হয়। জীবনের বেলাতেও হুবহু তা-ই।

কর্মবিমুখতা, আত্মবিলোপন, সত্যিকারের জীবনস্পৃহার প্রতি বিরূপভাব ইত্যাদি নেতিবাচক দার্শনিক আদর্শের বিরোধিতাই হলো ইকবাল দর্শনের মর্মকথা। এ জগত অসার; অতএব এর মধ্যে চাইবার আর কি আছে! মৃত্যুপথবাহী এ জীবনের প্রতি মমত্ববোধের কী মূল্য? ইত্যাদি মতবাদের সাথে তিনি কখনও আপোষ করেননি। অপরপক্ষে, তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন যে, মানুষের মধ্যে সব সময় জাগরুক থাকা চাই বাধা-বিপত্তি জয় করে এগিয়ে চলবার অন্তহীন উদ্যম, বিপদের সম্মুখে নির্ভয়ে দৃপ্তপদে দাঁড়াবার সাহস ঃ

সেই কারাভাঁ করুণার পাত্র
যা বিপদমুক্ত পথের সন্ধানে
এদিক-ওদিক হাতড়ে বেড়ায়।

জীবনযুদ্ধে অটল থাকবার এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়ে তিনি মনুষ্য সমাজকে আহবান করেছেন। তিমি মাছের মুখে শিশু সন্তানদেরকে উপদেশ দেওয়াবার ছলে তিনি বলেছেনঃ

আমাদের ধর্মে তীরের নিকটবর্তী হওয়া নিষিদ্ধ;
অতএব মহাসমুদ্রের তরঙ্গাবলীর সাথেই
তোমরা খেলা করো।
এই মহাসাগরই আমাদের গৃহাঙ্গন।

জীবনযাপন ক্ষেত্রে আমাদেরকে তিনি নকশ্ বন্দিয়াহ ত্বরীকা স্বীকৃত নীতি অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন। এ মতে অন্তর্নিহিত জীবনে মানুষ আল্লাহর সাথে যুক্ত; কিন্তু বাহ্যিক জীবনে তার সম্পর্ক প্রতিবেশীর সাথে। অতএব অন্যান্য মানুষের মতো আমাদেরও কর্তব্য ঃ জীবনের সুখ-শান্তি, সাংসারিক উন্নতি ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে যথা-সাধ্য চেষ্টিত থাকা। এ সব উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হবার আগে গাফলতি অকর্তব্য, অকৃতকার্য হলেও তার

জন্যে হতাশ হয়ে প্রচেষ্টা ছেড়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়; কেননা, সব প্রচেষ্টার ফল রয়েছে আল্লাহর হাতে এবং তিনিই জানেন আমাদের জন্যে কি ভাল, কি মন্দ ঃ

> যিনি তোমাকে ধনবান করলেন না,
> তিনিই জানেন কি তোমার চাই।

মানুষের আশাবাদকে উজ্জীবিত করবার জন্যেই ইকবাল হাফিয শিরাযীর নিম্নোক্ত পংক্তি ক'টির উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ

> তুমি একটি ধুলিকণার চেয়ে ক্ষুদ্র বা হীন নও,
> তুমি হতাশায় বিহ্বল হয়ে পড়ে থেকো না।
> প্রেমে অনুপ্রেরিত হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে উড়ে চল,
> সূর্যের নিঃসঙ্গ নিবাসও তোমার জন্যে অনতিক্রম্য নয়।

পবিত্র কুরআনেও উক্ত হয়েছে ঃ

> আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত সে জাতি নিজ পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে।

অতএব বলা বাহুল্য যে, দৃঢ় ও বিরামহীন প্রচেষ্টা ছাড়া কখনও উন্নতি লভ্য হয় না। শুধু নিয়তির দিকে তাকিয়ে থেকে কিছুই পাওয়া যাবে না। আল্লাহ আমাদের মধ্যে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তা যথাযথ ব্যবহার করে আমাদের চেষ্টা করতে হবে জীবনের উন্নতি, মানুষের উপকার, ব্যক্তির উৎকর্ষ, সমাজের উন্নয়ন এবং ইসলামের বিকাশ সাধনে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাময়িক অকৃতকার্যতার আঘাতে মুষড়ে পড়া চলবে না। মওলানা বল্খী বলেছেন যে,

> আমাদের উচিত হযরত রসূলুল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা এবং কৃতকার্যতার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টায় নিয়োজিত থেকেও ফলাফলের ব্যাপারে সর্বদা আল্লাহ তা'লার ওপর বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল হয়ে থাকা। সর্বপ্রকার সাংসারিক আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে মানুষের কর্তব্য হলো নিজের কৃতকার্যতা বা অকৃতকার্যতা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া। জীবনের উন্নতির জন্যে এবং বিশ্ববাসীর হিতের জন্যে আমাদের উদ্যম ও কর্মক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় নিয়োজিত রাখতে হবে। কেননা, তা না করলে প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহর প্রতিই অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে; তিনি আমাদেরকে যে-সব অন্তর্নিহিত গুণ দিয়েছেন তার বিকাশ সাধন বিঘ্নিত হবে।

মান্ষের এই অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বকেই ইকবাল আখ্যায়িত করেছেন খুদী বলে। খুদীর উন্নয়নই আমাদের এ মরজীবনের আসল লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে মওলানা রুমীর নিম্নোক্ত সন্দর্ভ প্রণিধানযোগ্য ঃ

> হ্যাঁ, সিংহ বললো, কিন্তু মহাপ্রভু আমাদের পায়ের তলায় একটি মই রেখে দিয়েছেন। এর সিঁড়ি বেয়ে আমাদের ছাদের দিকে এগিয়ে চলতে হবে। অদৃষ্টবাদ হলো নির্বোধ আশা নিয়ে মগ্ন থাকা। ক্ষুদ্র প্রয়োজনাদির মধ্যে জড়িয়ে পড়ে উচ্চাশা পোষণ বাতুলতা।

> মুক্তবুদ্ধি হলো আল্লাহ্‌র মহান দানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়াস; আর অদৃষ্টবাদ তার অস্বীকৃতি।
>
> শক্তি লাভের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানানোর ফলে শক্তি আরও বেড়ে যায়; অদৃষ্টবাদ তোমাকে উত্তরোত্তর দুর্বল করে তুলবে।
>
> আল্লাহ্‌র ওপর যদি বিশ্বাস স্থাপন করো, তবে তোমার কার্যের ফলাফলের জন্যেই তা করো; বীজ বপন কর এবং আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর কর। হে শ্রদ্ধেয় বন্ধু! নবী ও সাধুদের পথে যতক্ষণ অবিচলিত রয়েছে এতক্ষণ প্রাণপণে কর্মসাধনে চেষ্টিত থাকো।

ইকবাল-দর্শনের মূলভিত্তি এই কর্মবাদের সাথে সাথে রয়েছে অবিনশ্বর আল্লাহ্‌র ওপর পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতা ও তা-তে অবিচল বিশ্বাস। মানুষের মধ্যে যে একটি অসীম শক্তিধর গোপন ব্যক্তিত্ব রয়েছে, তারও হদিস এ থেকে পাওয়া যায়। সে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ প্রত্যেক মানুষের একান্ত কর্তব্য বলে তিনি ঘোষণা করেছেন। জীবন সত্যি সত্যিই একটি তীব্র ও অনবসর যুদ্ধক্ষেত্র। তিনি আরও বলেছেন ঃ

> জীবনযাত্রা যত দ্বন্দ্ববহুল হবে, জীবন যুদ্ধ যত কঠোর হবে; জীবনের স্বাদ ততই বেড়ে যাবে।
>
> জীবনের সত্যরূপ কি? জিজ্ঞাসিত হয়ে জনৈক উন্মুক্ত হৃদয় ব্যক্তি জবাব দিলেন ঃ এ যেন তীব্র শুরা; যত তিক্ত, ততই মধুর!

করাচীতে মশ্‌হূর কবি ফয়েয আহ্‌মদ ফয়েয (১৯৬৬) বলেন–

আজকে আমি ইকবাল-সাহিত্যের বরঞ্চ একটি অবহেলিত দিক্ নিয়ে আলোচনা করতে চাই; এ হলো আর্ট সংক্রান্ত দিক্ বা আপনারা বলতে পারেন–তাঁর খাঁটি কাব্যিক দিক্। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ইকবালের চিন্তাধারা, দর্শন, বাণী এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনেক রচনা ও বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যতদূর আমার জানা আছে, তাঁর কবি প্রতিভা এবং কাব্য সৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক শক্তি সম্পর্কে অতি অল্পই বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হয়েছে। এর জন্যে অবশ্য কবি নিজেও অংশত দায়ী; কেননা, তাঁর লেখায় তিনি নিজেই বারবার নির্দেশ জারি করেছেন যে, পাঠকবৃন্দ যেন তাঁর কাব্যরসে অভিভূত না হয়ে তাঁর বাণীর অর্থ উদ্‌ঘাটনে তৎপর হয়। আমার আরও মনে হয় ঃ আমাদের দেশে কবি এবং শিল্পীকে আমরা যে অধস্তন সামাজিক মর্যাদা দিয়ে থাকি; তা-ও এর জন্যে অংশত দায়ী। আমাদের মধ্যকার তথা-কথিত চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কবি-চরিত্রকে কতকটা অমর্যাদার চোখেই দেখেন এবং কবি-বাণীকে গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করতে অনেকখানি অসম্মত বটেন। কবিকে মর্যাদা দানের অবস্থা দেখা দিলে বরং তাঁরা তাঁকে চিন্তাবিদ বা দার্শনিক বা প্রচারক বা নিদেন পক্ষে রাজনীতিকের পোশাক পরিয়ে দেন; কবি হিসেবে আমাদের কাছে কবির কোনো বিশেষ স্বীকৃতি বা মর্যাদা নেই। সম্ভবত ইকবাল স্ব-সমাজের এ মনোভাবের সাথে পরিচিত ছিলেন এবং সে জন্যেই আমাদের সমাজদেহে ঘননিবিষ্ট এইসব যেন-তেন ছন্দ মিলিয়েদের সাথে তিনি নিজেকে কখনও জড়াতে দিলেন না।

যা-হোক, আমি আজ এ মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে দাঁড়াইনি। আমি শুধু এ কথা বলতে চেয়েছি যে, এভাবে বিচার করবার মধ্যে যা-কিছু ভাল বা যা কিছু মন্দ থাকুক না কেন, ইকবালের প্রতিভাসম্পন্ন একজন কবিকে যে নামেই পরিচিতি দেওয়া হোক্ না কেন, নিঃসন্দেহে তাঁর মহত্ত্ব তাতে খর্ব হবে না। আমি মনে করি, এ-কথা বললে আমাকে তেমন কোনো প্রতিবাদের সম্মুখীন হতে হবে না যে, ইকবালকে আপনারা দার্শনিক, চিন্তাবিদ, ধর্মনেতা, প্রচারক যা-ই বলুন না কেন, তাঁর বাণীকে যা প্রকৃতই শক্তিমান করে তুলেছে তা হলো তাঁর কবিতা। আমার এ বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি যে, তাঁর গদ্যে রচিত বক্তৃতাগুলো সত্যিই চমৎকার হয়ে থাকলেও, তাঁর কবিতার যত পাঠক রয়েছে, তার সামান্য ভগ্নাংশও তাঁর গদ্য রচনার পাঠক নয়; বরং তাঁর কবিতা একাধিক বংশ-পরম্পরার ওপর একাধিক দেশে যে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে, তাঁর গদ্য রচনার প্রভাব সে তুলনায় একান্ত নগণ্য। এ প্রমাণই আমাদের বোঝবার জন্যে যথেষ্ট যে, তাঁর চিন্তাধারার পুরো মূল্য দিয়েও, তাঁর কবিতার কাব্যগুণ অবশ্যই বিশিষ্ট মর্যাদার দাবিদার-এমন কি, এ গুণই তাঁর প্রধানতম ও প্রায় সামগ্রিক গুণ বটে।

অতএব আমি মনে করি যে, ইকবালের রচনার খাঁটি কাব্যিক দিকে দৃষ্টি দেওয়াও আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমার হাতের অল্প সময়ের মধ্যে আমি মাত্র কিছুখানি ইঙ্গিত দিয়ে যেতে পারি কিভাবে এ ক্ষেত্রে এগুতে হবে। অধিকতর ব্যাখ্যাদান বা উদাহরণ দানও সম্ভব নয়; কিন্তু অত কিছুর দরকারও করে না।

প্রথমতঃ আমার উল্লেখ করা উচিত যে, ইকবাল নিজেই 'আর্ট ফর আর্টস সেক' (ললিত কলার সার্থকতা ললিত কলাতেই)- মতবাদের চরম বিরোধী ছিলেন। অতএব আমরা তাঁর

আর্ট অথবা তাঁর স্টাইল অথবা তাঁর বিষয়বস্তু অথবা তাঁর অন্যান্য কাব্যিক গুণাবলীকে তাঁর বক্তব্য থেকে আলাদা করে বিচার করতে পারি না; কারণ যদিও তাঁর স্টাইলে কাল-প্রগতির লক্ষণ স্পষ্ট ছিল এবং বৈচিত্র্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু তবুও তাঁর সব রকমের প্রকাশভঙ্গির লক্ষ্য ছিল তাঁর ভাবের বাহন হিসেবে যথাযথ রূপ অর্জন। অতএব তাঁর স্টাইলের গতিধর্মিতা তাঁর চিন্তার গতিধর্মিতারই সমান্তরালভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে; এবং একটিকে অন্যটি থেকে পৃথক করে দেখার অর্থ হবে ব্যাপারটাকে অগভীর এবং ভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখা।

এ কথা মনে রেখে ইকবালের সৃষ্টির প্রতি তাকালে প্রথমেই আপনাদের চোখে প্রতিভাত হবে তাঁর প্রাথমিক জীবনের রচনাবলী এবং পরিণত ও শেষ জীবনের রচনাবলীর স্টাইল ও বর্ণনার মধ্যে প্রবল পার্থক্য। কিন্তু সাথে সাথে যে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আপনাদের চোখে পড়বে, তা হলো এই যে, এই স্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে একটি আন্তরিক মিল রয়েছে– আমার মতে, যার কারণ দ্বিবিধ।

প্রথমতঃ তাঁর কৈশোরের এবং একেবারে প্রাথমিক জীবনের রচনার গভীরতা ও একাগ্রতা লক্ষ্য করা যায়, তা তাঁর শেষ জীবনের রচনাবলীর মধ্যেও বিদ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ সত্য ও অস্তিত্বের রহস্যাবলীকে জানবার এবং আবিষ্কার করবার যে অনিবার্য আকাঙ্ক্ষা, যে জিজ্ঞাসা ও সন্ধান-স্পৃহা তাঁর রচনায় স্বতঃস্ফূর্ত, তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কখনও অনুপস্থিত থাকেনি। এই দুই অন্তর্মুখী গুণ তাঁর সমগ্র রচনাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে-আবার তাঁর স্টাইল প্রগতি তাঁকে দিয়েছে উদ্‌বর্তন ক্ষমতা। এখন এ উদ্‌বর্তনের বৈশিষ্ট্য কি? এর উপাদানাবলী কি?

আমি বলতে চাই যে, এ উদ্‌বর্তনের চারিটি উপাদান রয়েছে, আর প্রতিটি নির্ধারিত হয়েছে তাঁর চিন্তার এক একটি বিকাশ পর্যায়কে অবলম্বন করে।

প্রথমতঃ তাঁর প্রথমদিক্‌কার রচনাবলী হলো অলঙ্কারবহুল বর্ণাঢ্য এবং ইরানী প্রভাবিত। এর সহজবোধ্য কারণ হলো : তখন তিনি বাইদিল, নাযীর এবং গালিবের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন; তা-ছাড়া আমাদের ঊনবিংশ ও প্রাথমিক বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইরানী কবিদের যে অগাধ প্রতিপত্তি ছিল, তাঁর ব্যাপারেও তা ছিল সত্য। অতএব স্টাইল বিবেচনায় তাঁর কাব্যপ্রগতির লক্ষণ হলো আলঙ্কারিকতা থেকে সূক্ষ্মতার দিকে, বিক্ষিপ্ত থেকে স্পষ্টতার দিকে এবং বাগাড়ম্বর থেকে বুদ্ধিমত্তার দিকে প্রয়াণ। এ কথা বোঝাতে তেমন কিছু বাগবিস্তারের প্রয়োজন নেই; কারণ ইকবালের রসিক পাঠকের কাছে ব্যাপারটি সহজবোধ্য। তাঁর পরবর্তী রচনায় আলঙ্কারিকতা একেবারেই তিরোহিত হয়ে গেছে; এখানে উপমা ও অলঙ্কার দৃষ্টিগোচর হয় অতি অল্পই, কিম্বা হয়ই না। এখানে তাঁর রচনা বুদ্ধিবৃত্তিক, কঠোর এবং স্পষ্ট। এটাকে বলা যায় সংক্ষেপণ–অথবা বলতে পারেন, পরিপক্কতা। অন্যদিক হলো, তাঁর সম্প্রসারণধর্মিতা। এটা দেখা যায় তাঁর চিন্তায়, বিষয়বস্তুতে; কেননা, ইকবাল নিজেকে নিয়ে আরম্ভ করেছেন তাঁর প্রথম যৌবনের আবেগে, তাঁর অতি প্রাথমিক রচনাবলীতে। এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যক্ত করেছেন নিজের প্রেম, নিজের দুঃখ, নিজের একাকিত্ব, নিজের নৈরাশ্য, নিজের নিজকে। তারপর *'বাঙ্গে দারা'*-র শেষদিকে, নিজে থেকে তিনি এগিয়ে যান মুসলিম সম্প্রদায়ের দিকে, মুসলিম বিশ্বের দিকে। মুসলিম বিশ্ব থেকে তিনি এগিয়ে যান মানবতার দিকে এবং সেখান থেকে বিশ্ব

প্রকৃতির দিকে। অর্থাৎ নিজের থেকে শুরু করে তাঁর চিন্তাধারা সন্তরণ করে যায় বিশ্বব্রহ্মান্ডের উদ্দেশ্যে; আর এই চিন্তাধারাই তাঁর স্টাইল, তাঁর বর্ণনাকে পরিচালিত করে। প্রাথমিক রচনাবলীতে তিনি যখন অসংলগ্নভাবে নিজের অনুভূতি, নিজের প্রবণতা, নিজের অভিজ্ঞতা, নিজের অন্তর্মুখী খুঁটিনাটির বর্ণনা দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর স্টাইলও ছিল অসংলগ্ন। তখন তা ছিল অনিয়মিত কখনও সহজ, কখনও আলঙ্কারিক। পরবর্তীকালে যখন তাঁর সামগ্রিক চিন্তাধারা একটি নির্দিষ্ট ও সুগঠিক মূর্তিলাভ করলো, তখন তাঁর স্টাইলও হলো সেভাবে সুনির্ধারিত। এখন থেকে তা প্রায় অপরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করলো, তার আর উঁচু-নীচু রইলো না এবং প্রায় সমপদক্ষেপ ও সমতালে চললো। এইটি তঁর দ্বিতীয় পর্যায়। তৃতীয় পর্যায়কে বলা যায় একীকরণ পর্যায়। উদাহরণতঃ তাঁর প্রাথমিক রচনাবলীতে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র, মেঘ, নদী, পর্বত, নগরী ইত্যাদি বিষয়ক কবিতাবলী, কিন্তু এগুলোর মধ্যে কোনো যোগসূত্র নেই।

পরবর্তীকালে তাঁর চিন্তা যখন পরিণতি লাভ করলো, তখন দেখা গেল যে, সব কিছু, সমস্ত বিশ্বজগত একটিমাত্র চিন্তাসূত্রে জড়ানো এবং সে হলো বিশ্ব-প্রকৃতিতে মানুষের ভূমিকা এবং নিয়তির সাথে বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্ক। মানুষের ভূমিকা নির্ধারিত হবার পরে অন্য সবকিছুই নিজ নিজ স্থানে যথাযথরূপে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। কবির পরবর্তী জীবনের রচনাবলীতে যেখানে প্রাকৃতিক বা বাহ্যিক দৃশ্যাদির কথা রয়েছে (যেমন 'কির্‌মাক-ই-শাব' 'তা'ব' 'শাহীন' 'চাঁদ' 'সূরুজ' ইত্যাদি), সেখানে দেখা যাবে যে, তারা আর বহির্জগতের ব্যাপার নয়; তারা এখন এমন কতকগুলো নিদর্শন, যার সাহায্যে ইকবাল কোনো অন্তর্মুখীন সত্যের রূপায়ণ করেছেন। এগুলো এখন আর কতকগুলো আত্মনির্ভর বস্তু নয়। তিনি এখন আর ঈগল হিসেবে ঈগল পাখীকে দেখেন না, জোনাকি হিসেবে জোনাকিকে দেখেন না। আমার মনে হয় না যে, ঈগল কেমন দেখায় বা জোনাকি কেমন দেখায়, তা বর্ণনা করে তিনি সময় ব্যয় করেছেন। ঈগল পাখী, জোনাকি, চন্দ্র, সূর্য বাহ্যিকভাবে তাঁকে আর আকর্ষণ করে না একটি মহান ও সামগ্রিক সত্যের ইঙ্গিত বা প্রতীক হিসেবেই এদের প্রকৃত মূল্য। এটি হলো তাঁর রচনা ও স্টাইলের তৃতীয় উদ্‌বর্তনধারা; এখানে অসংলগ্ন ঘটনাবলী, অসংলগ্ন অনুভূতিকে তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ভাবপ্রবণ দু'দিক দিয়েই একটিমাত্র সুসামঞ্জস্য সামগ্রিক রূপ দিয়েছেন। সর্বশেষে, তাঁর চিন্তার চতুর্থ পর্যায়ে দেখা দিয়েছে আবেগের ক্ষেত্রে বিবর্তন। তাঁর পূর্বেকার রচনায় যে শব্দটি অধিকভাবে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা হলো 'মুহব্বত'; কিন্তু পরেকার রচনায় এ শব্দের স্থান গ্রহণ করেছে 'ইশ্‌ক'। এ হলো তাঁর ভাবপ্রবণতা থেকে গভীরতর উন্মাদনায় উত্তরণের নিদর্শন, বাহ্যিক আকর্ষণ থেকে চোখ ফিরিয়ে অন্তরের রূপৈশ্বর্যের সন্ধান। 'আশিক'-এর দৃষ্টিতে তার এ কাম্য বস্তু রয়েছে তার অন্তরেরই অন্তস্থলে, বহির্বিশ্ব থেকে এ আরোপিত নয়। এটি শুধু কোনো কিছুকে ভালবাসা বা ঘৃণা করা নয়, এ অন্তরাগ্নি হলো সর্বভুক, সর্বগ্রাসী।

আর একটি বিষয়ে আমি আপনাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ইকবালের শেষ জীবনের রচনা সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তাঁর স্টাইল হলো স্পষ্ট, সরল ও নিরলঙ্কার। তা হলে তার আকর্ষণ আর কি রইলো? সাধারণতঃ কবিরা অলঙ্কার, বাক্‌চাতুর্য ইত্যাদির সাহচর্যেই তো পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকেন। ইকবাল এসবের পরিবর্তে কি

কৌশল অবলম্বন করলেন? আমার মনে হয়, এ বিষয়টি সযত্নে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন; কিন্তু এখন পর্যন্ত এ নিয়ে অতি সামান্য আলোচনাই হয়েছে। উর্দু সাহিত্যে তাঁর প্রবর্তিত তিন চারটি ব্যাপার সকলেরই চোখে পড়বার মতো। উদাহরণতঃ একটি হলো তাঁর নামবাচক বিশেষ্য (Proper Names) ব্যবহার; অবশ্য এ ক্ষেত্রে দু'চারটি যেমন মযনু, ফরহাদ, লায়লা, শিরীন পুরাকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে; কিন্তু আমার মনে হয়, ভাষায় এর জনপ্রিয়তা ইকবালের হাত দিয়েই আবদ্ধ হয়েছে। তাঁর লেখায় আপনারা দেখতে পাবেন কুফা, হিজায, ইরাক, ফোরাত, ইস্পাহান, সমরকন্দ, কোহ-ই-আদম, নওয়াহ-ই-কাযিমা, কুর্তুবা ইত্যাদির প্রচলন। এসব শব্দের কাব্যিক তাৎপর্য সুপরিজ্ঞাত; সে জন্যে এগুলোকে বোঝার জন্যে আর কোনো উপমা বা রূপকের দরকার করে না। এ শব্দগলো স্বতঃই একটি দূরত্বের, একটি কালের, সাধারণ দৈনন্দিন নাগালের বাইরের একটি ভাব পরিবেশন করে বলতে পারেন যে, একটি রোমান্স-এর ভাব এদের মধ্যে বর্তমান; কেননা, রোমান্স তো স্থান বা কাল সম্পর্কে একটি দূরত্বভাবেরই দ্যোতক। অতএব ইকবালের লেখায় এই প্রপার নেম-এর ব্যবহার আলঙ্কারিকতার অভাবের অনেকখানি ক্ষতিপূরণ করেছে। দ্বিতীয়তঃ তাঁর আর একটি নতুন প্রবর্তন হলো কতকগুলো সহজ কিন্তু অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার। এসব শব্দ কঠিন বা দুর্বোধ্য নয়, বরঞ্চ অত্যন্ত স্বচ্ছ; যেমন- নাখ্বীল, তাইলসান, পানিয়া ইত্যাদি (পানিয়াঁ ফার্সী ভাষায় বহুল প্রচলিত, কিন্তু উর্দুতে নয়)। কিন্তু উর্দু ভাষায় এগুলো পূর্বে কখনও ব্যবহৃত হয়নি। আরও কতকগুলো এ রকম শব্দ পাওয়া যাবে, যেগুলো কবি ইচ্ছা করেই প্রবর্তন করেছেন, যেমন- 'খুতুত-ই-খামদার' 'মরীয' ইত্যাদি। প্রত্যেকেই জানেন, খুতুত-ই-খামদার কি; মরীয যদিও অপরিচিত তবুও এর অর্থ স্পষ্ট। এটিকে বলতে পারেন তাঁর একটি কৌশল; কিন্তু আসলে এ কৌশল নয়, হাতিয়ার বটে-যার সাহায্যে তিনি তাঁর বক্তব্যের কঠোরতাকে স্খলন এবং তাঁর কাব্য পরিবেশকে এক একটি বিশিষ্ট ভাবাবেগে অভিষিক্ত করেছেন। তাঁর তৃতীয় হাতিয়ার হলো নবতর ছন্দ মাত্রার ব্যবহার; এর উদাহরণ রয়েছে 'মসজিদ-ই-কুর্তুবা'তে। উর্দু কবিতায় পূর্বে ব্যবহৃত হয়নি-এ রকম প্রায় অর্ধ ডজন ছন্দ তিনি প্রথম প্রবর্তন করেছেন। তারপর তিনি একটি অপরিচিত ভাব সৃষ্টি করবার জন্যে প্রবর্তন করেছেন অপরিচিত ধ্বনি, অপরিচিত শব্দ, নাম, বিশেষ্য পদ এবং বিশেষ কৌশলে উদ্ভাবিত ব্যঞ্জনা। আমার মনে হয় না যে, ইকবালের মতো আর কোনো কবি উর্দু কবিতায় ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের এতখানি ধ্বনি-বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তিনি সোজাসুজি অনুকার শব্দ প্রয়োগ বা অনুরণন সৃষ্টি করতে যান নি। তাঁর রচনায় ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের ধ্বনি ব্যবস্থা যে তাঁর সচেতন স্বেচ্ছাকৃত, তা সহজেই বোঝা যায়। আমার জ্ঞাতসারে হাফিয-ই একমাত্র অন্য কবি, যিনি এ পন্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু উর্দু ভাষায় ইকবালের পূর্বে এ পদ্ধতি দেখা দেয়নি। উর্দুতে ইকবালের পূর্বে অন্যেরা অনুকার বা অনুরণনের ব্যবহার করেছেন বটে; কিন্তু কেউ এগুলোর সামগ্রিক সামঞ্জস্য বিধান করতে পারেন নি। আমার মনে হয়, উল্লিখিত কয়েকটি স্টাইলের ধরন-ধারণ ইকবালেরই স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য। অভিনিবেশ সহকারে যাঁরা ইকবাল পাঠ করবেন, তাঁরা দেখতে পাবেন যে, তিনি নিজ কবি-জীবনের আদ্যন্ত যে তত্ত্ব প্রচার করে গেছেন, তার যথাযথ প্রকাশের জন্যে এ স্টাইলের প্রয়োজন ছিল। আমার ধারণা, তাঁর কাব্যের মর্মবাণীর বিভিন্ন দিক্ রয়েছে

এবং পাঠক তাঁর যে কোনো দিক নিয়ে চর্চা করতে পারেন। কিন্তু তাঁর চরমতম অন্বেষা হলো মানবজগতকে নিয়ে। বিশ্বজগত ও মানুষ, বিশ্বজগতের মুখোমুখি মানুষ, বিশ্বজগতে মানুষ অথবা বিশ্বজগত মানুষ সম্পর্ক এক কথায়, মানবীয় বিশ্বজগত এ-ই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী পাঠ্য পুস্তক। এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি যে, পরম ধার্মিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়ে তিনি কখনও পরকালের কথা উল্লেখ করেন নি বা অতি কদাচিৎ করেছেন। তাঁর কবিতায় পরলোক নিয়ে কোনো বাগ-বিস্তার নেই, পরকালের পুরস্কার বা শাস্তির কথা নেই। তাঁর মতে, পুরস্কার বা শাস্তি এ জগতেই লভ্য। এর স্পষ্ট কারণ এই যে, তিনি গান গেয়ে গেলেন জীবন যুদ্ধের; জীবনের উদ্‌বর্তনের, বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে সংগ্রামের, মানবাত্মাকে মলিন করে রাখে যে-সব ভাব বা কর্ম, তা-কে রুখে দাঁড়াবার; অতএব যে পরকালে কোনো কর্ম নেই, কোনো দ্বন্দ্ব নেই তা তাঁর চিন্তার রাজ্যে একান্ত অবান্তর। সে জন্যে স্বভাবতঃই তিনি পরকালের উল্লেখ করেননি বা কদাচিৎ উল্লেখ করেছেন। যেভাবেই দেখুন না কেন, তাঁর শেষ কথা হলো মানুষের কথা, মানুষের বিশ্বের কথা, মানুষের একক মর্যাদার কথা, মানুষের মহত্ত্বের কথা। তিনি মানুষের একাধিত্বের কথা বলেন, কেননা মানুষ চর্তুদিকে শত্রুবেষ্টিত। তার প্রথম শত্রু হলো তার নিজেরই ভেতরকার লোভ, কাপুরুষতা, স্বার্থপরতা পরপীড়ন-প্রীতি ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ বহির্বিশ্বে তার শত্রু হলো বিরূপ প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জ। অতএব সে তার ক্ষুদ্র পরমাণুসদৃশ ব্যক্তিত্ব নিয়ে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির সাথে দ্বন্দ্বের সম্মুখীন। এখানে এই শত্রু পরিবৃত মানুষকে এমনভাবে মহত্ত্ব অর্জন করতে হবে যাতে সে তারকারাজির, চন্দ্রের, সূর্যের, মহাবিশ্বের সম্মুখে তাদের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এহেন বৃহতের বীজকে তার ক্ষুদ্রের মধ্যে লালন করতে এবং বিকশিত করে তুলতে হবে। জীবনের শেষ দিকে এই মহত্ত্ববোধই ইকবালের কবিকীর্তিকে অতুলনীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছিল, সুন্দর মহীয়ান করে তুলে ধরেছিল।

করাচীতে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক-এর গভর্নর জনাব মহবুবুর রশীদ বলেন–

'এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার জন্যে আমি যখন পোটলা-পুটলি জড় করলাম
সবাই বললো ঃ আমরা ভালো করেই তাকে চিনতাম।
আসলে এই মুসাফিরকে কেউ চেনেনি;
কেউ জানতো না সে কোথা থেকে এলো,
কি বললো, আর কাকে বললো।'

সমসাময়িকদের সম্বন্ধে, আর বাহ্যিক ও আকস্মিক ভাব সঙ্গতির সাহায্যে যারা কবির অন্তর্লোককে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস পেতেন তাঁদের সম্বন্ধে ইকবাল এ মন্তব্য করে গেছেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর হৃদয়ের গভীরতা, তাঁর বাণীর মর্মকথা পাঠকদের কাছে দুরূহ হতে বাধ্য, যদিও তিনি আচার-ব্যবহারে, পোশাক-পরিচ্ছদে তাঁদেরই একজন ছিলেন।

এমনকি, তিনি তাঁর জীবনকথা লিপিবদ্ধ করবার ব্যাপারেও উৎসাহবোধ করেননি; কেননা, 'এসব সামান্য ব্যাপার' তাঁকে বোঝবার বেলায় কোনো কাজে আসবার কথা নয়। তিনি নিজেই বলে গেছেন যে, তাঁর ব্যক্তিত্ব হলো 'কতকগুলো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সমাবেশ' এবং 'আসল ব্যাপার হলো আমার মানসিক দ্বন্দ্ব অনুধাবন।'

যা হোক, নানা দিক থেকে ভুল করবার ঝুঁকি নিয়ে এবং অনেক ক্ষেত্রে ভুলচুক্ করেও, ইকবালের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক বিভিন্ন দিক থেকে তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, বহুবিচিত্র ব্যক্তিত্ব এবং সমসাময়িক জীবন ও চিন্তার সর্বক্ষেত্রে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির ফলে এ হতে বাধ্য হয়েছে। মহৎ ও সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাকে আমরা এভাবেই দেখি, যদিও এতে মতদ্বৈততার অনেকখানি অবকাশ থাকে। আমরা স্বভাবতঃই আমাদের একান্ত প্রয়োজনে তাঁদের নিকট সাহচর্য্য কামনা করি; কিন্তু তার ফল এই দাঁড়ায় যে, আমাদের নিজেদের বিশ্বাস ও সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে এবং আমাদের সাংসারিক ও পার্থিব প্রয়োজনে তাঁদেরকে আমরা সীমায়িত করে দেখি, আমাদের সংকীর্ণ দৃশ্যপটে তাঁদের মাহাত্ম্যকে খর্বাকারে চিত্রিত করি।

অতএব ইকবালের মতো প্রতিভাকে বুঝতে হলে আমাদের উচিত যতখানি সম্ভব নির্মুক্ত মনে তাকে সমসাময়িক পটভূমিকায় স্থাপন করে দেখা। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, এই পটভূমিকাও তাঁর সময়ের বহু পূর্ব থেকে সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবিত।

হিন্দু অধ্যুষিত ভারতীয় জীবনের ওপর ইসলামের প্রতিফলন থেকে আমরা আজকের আলোচনার সূত্রপাত করতে পারি। কে. এম. পান্নিকর তাঁর 'সার্ভে অব ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রী' গ্রন্থে সংক্ষেপতঃ বলেছে ঃ

"ভারতে একটি ধর্ম হিসেবে ইসলাম প্রবর্তনের প্রধান সামাজিক ফল দাঁড়ালো সমাজকে খাড়াভাবে দু'ভাগে বিভক্তকরণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে হিন্দু সমাজে যে

সব বিভাগ দেখা দিয়েছিল, সেগুলোর প্রকৃতি ছিল কতকটা আনুভূতিক; বৌদ্ধধর্ম বা জৈনধর্ম সমাজদেহে তেমন সর্বাঙ্গীন বিচ্ছিন্নতা ঘটাতে পারেনি। হিন্দুত্বের পক্ষে এসব উপধর্মকে আত্মস্থ করে নেয়া সম্ভব ছিল এবং কালক্রমে এরা হিন্দুধর্মের পরিধির মধ্যেই যার যার আঞ্চলিক আবাস গড়ে নিয়েছিল। অপরপক্ষে ইসলাম ভারতীয় সমাজকে আপাদমস্তক স্পষ্টত দু'ভাবে বিভক্ত করে ফেলে; এবং আজকের দিনের ভাষায় আমাদের কাছে যা দুই জাতিত্ব বলে পরিচিত হয়েছে, তা সেই প্রথম দিনেই জন্মগ্রহণ করে। এরপর থেকে একই ভিত্তিভূমির ওপর দু'টি সমান্তরাল সমাজ খাড়াভাবে বিভক্ত অবস্থায় বিরাজ করতে থাকে। জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দু'টি সমাজ আলাহিদা বা পৃথক হয়ে গেল এবং আলাহিদা-আলাহিদারূপে আত্মপ্রকাশ করলো। এ দুয়ের মধ্যে কোনরকম সামাজিক সংশ্রব বা জীবনের ক্ষেত্রে আদান-প্রদান থাকলো না। অবশ্য হিন্দুত্ব থেকে ইসলামে ধর্মান্তরণ অবিরাম চলতে থাকলো; কিন্তু সাথে সাথে নতুন মতবাদ ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং নতুন প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তার মনোভাব উদ্দীপনের ফলে হিন্দু সমাজদেহ উত্তরোত্তর অধিকতর শক্তিশালী হয়ে দেখা দিলো।"

মুসলিম শক্তির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পতনের মূল নিহিত ছিল সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে বিশৃঙ্খলা ও অন্তর্বিরোধ দেখা দিয়েছিল তাতে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের বিপর্যয়ের ফলে মুসলিম শক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার সকল আশা বিলীন হয়ে যায় এবং সমগ্র পাক-ভারতীয় উপমহাদেশব্যাপী বৃটিশ জাতির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান সম্প্রদায় হঠাৎ দেখলো যে, তারা সমস্ত ক্ষমতা ও শক্তি থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ১৮৩৩ সালে ফার্সীকে সরকারী ভাষার মর্যাদা থেকে বিতাড়িত করা হয়। গভীর হতাশায় তখন মুসলমানেরা ইংরেজের দেয়া নতুন শিক্ষা অবিলম্বে গ্রহণ করতে রাজী হলো না; এবং এর ফলে, তারা এতদিন দেশের শাসনকার্যে যে উচ্চপদ অধিকার করেছিল, তা সাথে সাথে হারালো। মুসলিম ফৌজদারী আইন বাতিল করে দিয়ে তদস্থলে 'কোড অব্ ম্যাকলে'-এর প্রবর্তন করা হলো, শরীয়ত আইনের পরিবর্তে ইঙ্গ-মুসলিম আইন জারী করা হলো। এ চ্যালেঞ্জ-এর মুকাবিলায় মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া দেখা দিলো বিভিন্নভাবে, যেমন-ওয়াহ্হাবী ধর্মান্ধতা, সাংস্কৃতিক অসহায়তা, উদ্ধত ঘৃণা এবং এমন কি, প্রকাশ্য শত্রুতা পর্যন্ত।

এর ফলে, ইকবালের সমসাময়িক মুসলমানেরা পারিপার্শ্বিকতার সাথে যে নৈরাশ্য ও অসামঞ্জস্যমূলক ভাব নিয়ে জীবন-যাপন করছিল, তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় তাদের ধর্মীয় মনোভাবে। তাদের এই ভগ্নোদ্যমের বেলায় ধর্ম দেখা দেয় একটা সান্ত্বনাস্বরূপ, কর্মপ্রেরণাস্বরূপ নয়। পৃথিবীতে আল্লাহ্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যম ত্যাগ করে এ মনোভাব বরং স্বর্গস্থ আল্লাহ্র রাজত্বের উদ্দেশ্যে পলায়নের চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভাবাবেগের ক্ষেত্রে মুসলিম ভারতের সমাজ জীবনে এই যে সঙ্কট দেখা দিলো, তা কিন্তু হিন্দু ভারতকে স্পর্শ করতে পারলো না। হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে রাজশক্তির পরিবর্তন শুধুমাত্র প্রভু পরিবর্তনরূপেই দেখা দিলো। মুসলিমদের মনে দিল্লী দরবারে মর্যাদাহানি যেমন শোকাবহ হয়ে প্রতিভাত হলো, হিন্দুর কাছে তার কোনো মূল্যই নেই। হিন্দুরা সহজেই পরিবর্তিত অবস্থার সাথে নিজেদের খাপখাইয়ে নিতে পারলো এবং তদ্বারা লাভবান হলো।

মুসলমানদের জন্যে বৃটিশের সাথে আপোষ করার অর্থ হলো অধিকতর অপমানিত হবার পথ প্রশস্ত করা। পাশ্চাত্য তার তীব্র বিরোধিতার চোখে দেখলো, যার অবশ্যম্ভাবী ফল হলো সরকারী চাকরি থেকে তাদের সরাসরি অন্তর্ধান এবং সাথে সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও বহুবিধ বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধা।

এক কথায়, আফিম যুদ্ধের পূর্বে ও পরে পাশ্চাত্যের শক্তিসমূহের অনুপ্রবেশের পরিপ্রেক্ষিতে মহাচীনবাসীরা যে মনোভাব দেখিয়েছিল, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবার পর মুসলমানেরাও অনেকখানি তা-ই করলো। তারা আধুনিক অগ্রসরমান সভ্যতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিজেদের খোলসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলো। পক্ষান্তরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন মনোভাব। কমোডর পেরীর বোমাবর্ষণের পর জাপানের উদ্যমশীল সৈনিকগোষ্ঠী যেমন ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে এগিয়ে চলেছিল, হিন্দু সম্প্রদায়ের মনোভঙ্গি ও কর্মপ্রয়াস ছিলো অনেকটা সে রকমের। এদিকে চীনবাসী এবং ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায় বাস্তবের দিকে তাকিয়ে দেখতে অস্বীকৃতি জ্ঞান করলো; আর অন্যদিকে জাপানের স্যামুরাই সম্প্রদায়ও ভাবপ্রবণতাকে আশ্রয় না দিয়েই স্যামুরাইদের এই বাস্তবভিত্তিক পন্থা অনুসরণ করলো।

ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় এমন এক অবস্থায় এসে পড়েছিল যে, সেখানে থেকে আর কোনদিকেই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলা না। এখন এই চরম দুর্গতির অবস্থা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করবার জন্যে একটি নতুন পথ উদ্ভাবন একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ালো। আলীগড় আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক জীবনযাত্রা থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনা। পরে এ আন্দোলন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে প্রবীণের দল পাক-ভারত উপমহাদেশের বাইরের মুসলমানদের কোনো তোয়াক্কা না রেখে স্বদেশীয় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে ঐকান্তিকভাবে মনোনিবেশ করলেন; আর অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়স্ক ও চরমপন্থী দল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইসলামবিরোধী নীতি ও কার্যক্রমের জন্যে স্পষ্টত বৃটিশ মনোভাব অবলম্বন করলেন। এড্ওয়ার্ড থম্পসন ও জি.টি. গ্যারাট ব্যাপারটি এভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

> "এই মহাযুদ্ধ-পূর্ববর্তী কয়েক বছরের বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি মুসলিম সম্প্রদায়ের অসন্তোষ বাড়িয়ে তোলে। মুসলিম রাজ্যগুলো একটার পর একটা কোনো না কোন ইউরোপীয় শক্তি দখল করে নেয়, আর বৃটিশ শক্তি হয়তো এ ব্যবস্থায় নিজেরাও যোগ দেয়। যেমন– মরক্কো ও ইরানের বেলায় অথবা মৌনতা অবলম্বন করে। যেমন- ত্রিপলীতে। ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দের বলকান যুদ্ধকে মুসলমানেরা মনে করে ইসলামের ওপর সার্বিক আক্রমণের একটি অংশরূপে। এর মধ্যে ভারতীয় তরুণ মুসলিম সম্প্রদায় তাদের শিক্ষিত শ্রেণী এবং অন্যান্য দেশীয় তাদের স্বধর্মীদের ন্যায় দিন দিন অধিকতরভাবে জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ছে। তুরস্কের রেড ক্রিসেন্ট ফান্ডের জন্যে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে; আবার সাধারণ শত্রুতার মনোভাব কিছুসংখ্যক মুসলমানকে উগ্রপন্থী আন্দোলনের দিকে টেনে এনেছে; এ আন্দোলনে পূর্বের একক হিন্দুমনোভাব অনেকখানি লোপ পেয়েছে।"

ইকবাল সর্বান্তকরণে এই বামপন্থী মুসলিম আন্দোলনে যোগ দিলেন। তাঁর কার্যে ইসলামের সঙ্কটের বাণী তীব্র ও দুরন্ত রূপ গ্রহণ করলো। 'নালায়ে ইয়াতীম' (পিতৃহীনের ক্রন্দন) কবিতায় তিনি নিজ সম্প্রদায়ের হতাশা ও উত্তরাধিকারচ্যুতির মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ যখন মুসলিম বিশ্বের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে তার বিষাক্ত ফনা উদ্যত করলা, তখন ইকবাল আইয়ুব নবীর মতো আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদের হাত তুললেন ঃ

আল্লাহ্ কি বিশ্বাসীবৃন্দের এ কঠোরতম পরীক্ষা ও সঙ্কটের সময়
তাদেরকে ত্যাগ করলেন?
মন্দিরের মূর্তিরা বলছে- মুসলিম জাতি গতাসু!
এবং তারা এই ভেবে উৎফুল্ল যে কা'বার ওয়ালীরা আর নেই।
তারা বলে ঃ পৃথিবীর দৃশ্যপট থেকে এখন উষ্ট্রচালকেরা বিলুপ্ত।
তারা পালিয়েছে তাদের কুরআন বগলে নিয়ে।
বহু ঈশ্বরবাদীরা আমাদের দেখে হাসছে।
তোমার কি কোনো অনুভূতি নেই, হে প্রভু।
তোমার একত্বের প্রতি তোমার কি কোনো শ্রদ্ধাবোধ নেই?
তাদের বাসগৃহের ওপর তুমি করুণা বিতরণ কর,
আর তোমার বর্জবৃষ্টি হয় আমাদের আবাসের ওপর!

কিন্তু তিনি নিরাশাবাদী ছিলেন না। ধর্মবিশ্বাসের পুনরুজ্জীবন সাধন করে মুসলিম ভারতকে ঘিরে ধরা অন্ধকার বিদূরিত করা সম্ভব এবং তাদের নেবানো বাতি আবার জ্বালিয়ে তোলা যায়। তিনি সমসাময়িকদের কানে নতুন আশা ও উদ্যমের বাণী শোনালেন, এবং তাতে করে বক্ষ্যমাণ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম চিন্তাবিদ্ রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। মহান ইসলামের স্বর্ণযুগ থেকে বিচ্যুতি কখন, কিভাবে ঘটলো, তা সঠিকভাবে নির্ধারণের জন্য তিনি নিজ মনীষা নিয়োগ করলেন। তাঁর মতে, এ ব্যাপারটি যথার্থভাবে নির্ধারণ ছাড়া পৃথিবীর মুসলিম অধঃগতনের সঠিক কারণ বুঝতে পারা অসম্ভব এবং তাতে প্রতিকারও হবে বিঘ্নিত- এমন কি, অসম্ভাব্য।

তিনি দেখতে পেলেন যে, খলীফাহ্ মামুন-এর আমলে মুসলিম জগতের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে যে হেলেনীয় ভাবধারার আমদানী করা হয়েছিল, তাই রয়েছে মুসলিমদের বিপথগামী হবার মূলে। প্লাতো প্রমুখ গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তধারার প্রভাবে পড়ে ইসলামের যে রূপান্তর ঘটে, তাতেই মুসলমানেরা নিজেদের গতিশীল প্রত্যক্ষবাদ ত্যাগ করে একটা নিষ্ক্রিয় ধ্যানপর জীবন- যাপন পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল-যার ফলে, অনেক ক্ষেত্রে তারা নৈরাশ্যবাদ ও অদৃষ্টবাদের জালে জড়িয়ে পড়লো। তিনি প্লাতোকে বৃদ্ধ মেষপালের চালক বলে আখ্যাত করেন এবং প্লাতোও বেদান্তনির্ভর ওয়াহদাতুল ওজুদ (ঈশ্বর সর্বত্র ও সর্বকালব্যাপী এবং সমগ্র বিশ্বজগত তাঁর থেকে নিঃসারিত– এই সর্বেশ্বরবাদী বিশ্বাস) মতবাদপোষক সূফিতত্ত্বকে দৃঢ় স্বরে আক্রমণ করেন। এ মৃতসাগর থেকে নিজ সম্প্রদায়কে উদ্ধার করতে হলে, কিছুতেই তিনি নিষ্ক্রিয়তা ও নির্বাণের আপ্রাণ

বিরোধিতা না করে পারেন না। এ কারণেই তিনি সুফিবাদের শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ হাফিজ শিরাযীকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

মদ্য ব্যবসায়ী হাফিয থেকে সাবধান হও।
তাঁর পাত্রে মারাত্মক বিষ ছাড়া আর কিছুই নেই।
এই মাতালদের রাজা আসলে এক মেষ বটেন।
তাঁর গানের সুরে রয়েছে মানুষকে সম্মোহিত করবার ছলাকলা।
তাঁর মদের পেয়ালা ছুঁড়ে ফেলে দাও,
ওতে বিষ ছাড়া আর কিছু নেই।

আসরার ই খুদী (খুদী রহস্য)-তে ইকবাল খুদী (অহংঃ সর্ব কর্ম ও প্রচেষ্টার কেন্দ্রভূমি, মানব ব্যক্তিত্বের অন্তস্থল)-এর বিকাশের ওপর জোর দিয়েছেন। মানুষের উচিত সর্ব প্রযত্নে খুদীর বিকাশ সাধন করা এবং তার পরিপূর্ণতা অর্জনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। তাঁর মতে, মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় আদর্শ আত্ম-অস্বীকৃতি নয়, বরং আত্মপ্রতিষ্ঠা, আর যে এই আদর্শ আয়ত্ত করবে, সে ক্রমশ আত্মব্যক্তিত্ব ও আত্মবৈশিষ্ট্যের পথে অগ্রসর হবে। হযরত রসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর গুণাবলীতে ভূষিত হও। অতএব মানুষও এ পথে অধিক থেকে অধিকতর একত্ব অর্জন করে। ইকবাল বলেন এখন পর্যন্ত, এর শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হলো সেই খুদী, যার দ্বারা ব্যক্তিসত্তা একটি আত্মনির্ভর ও বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণতি লাভ করে। দৈহিকভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে মানুষ একটি স্বনির্ভর কেন্দ্র বটে, কিন্তু এখনও সে একটি পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্ত্বা নয়। আল্লাহ থেকে তার দূরত্ব যত বেশী হবে, তার ব্যক্তিসত্তাও তত দুর্বল থাকবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকটতম হতে পেরেছেন তিনিই হলেন পরিপূর্ণ মানব। এ নয় যে, তিনি অবশেষে আল্লাতে নিমজ্জিত হয়ে গেলেন; বরঞ্চ তিনিই নিজের মধ্যে আল্লাহকে আত্মস্থ করে নেন।

খুদীর বিকাশ ও পূর্ণতাপ্রাপ্তির কার্যক্রম স্থান-কালের বাইরের ব্যাপার নয়; বরঞ্চ স্থান-কালে অবস্থিত এই পৃথিবীতেই সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে তা লভ্য। ইকবালের মতে, জীবন হলো একটি অগ্রসরমান আত্মকরণপদ্ধতি। যাত্রাপথের সব বাধাকে আত্মস্থ করে এ এগোয়। এর প্রাণস্পন্দন হলো বিরামহীনভাবে ইচ্ছা ও আদর্শ সৃষ্টি এবং আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রসারণের জন্যে এ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি ইত্যাদি কতকগুলো যন্ত্রপাতির সৃষ্টি করে নিয়েছে; এগুলোর সাহায্যে সে পথের বিঘ্নাবলীকে আত্মসাৎ করে নেয়। জীবন পথে সবচেয়ে বড় বিঘ্ন হলো সব বস্তুময় বিশ্বপ্রকৃতি; কিন্তু তবুও বিশ্বপ্রকৃতি অসৎ নয়; কেননা, এ জীবনের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বিকাশ সম্ভব করে তোলে। খুদী নিজ পথের সমস্ত বাধা-বিঘ্ন আংশিকভাবে দূরীভূত করে স্বাধীনতা অর্জন করে। আংশিকভাবে এ স্বাধীন, আর নির্ধারিত এবং সর্বতোভাবে মুক্ত-স্বাধীন ব্যক্তিত্ব আল্লাহর নিকটবর্তী হবার পথে এ অধিকতর স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকে। একটি মাত্র কথায়; জীবন হলো স্বাধীনতা প্রয়াস।

তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে নিজেদেরকে অদৃষ্টবাদ ও নিস্পৃহতার কর্দম থেকে টেনে তুলতে এবং নিজেদের নিয়তিকে আয়ত্ত করবার সংগ্রামের পথে আত্মবিশ্বাস অর্জন

করতে এই খূদী বিকাশতত্ত্বই একান্ত প্রয়োজন ছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে মুসলিম কন্‌ফারেন্সের সভাপতির ভাষণে ইকবাল স্বধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ

> যা হোক, আপনাদের এই মহান ধর্মীয় আদর্শকে মধ্যযুগীয় ধর্মবেত্তা ও আইনবিদ্‌দের কল্পনাজাল থেকে মুক্ত করে আনতে হবে। শতাব্দী শতাব্দী ধরে আমরা নিজেদের চারিদিকে চিন্তা ও ভাবপ্রবণতায় যে কারা প্রাচীর গড়ে তুলেছি, আমাদের অধ্যাত্মজীবন তার মধ্যে বন্দী। আর আমাদের বয়স্ক সম্প্রদায়ের এ কথাও স্মরণ করা উচিত যে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে, তারা নিজেদের যুগে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং এমনকি ধর্মীয় যে বিপত্তির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে তাতে উৎরাবার মতো যথাযোগ্যভাবে অস্ত্র সজ্জিত করতে পারিনি। আমাদের সমগ্র সম্প্রদায়কেই তাদের বর্তমান স্থবির মনোভাব আমূল পরিবর্তন করতে হবে, যাতে এর মধ্যে নবতর আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শস্পৃহা বহুকাল থেকেই তার অন্তর্নিহিত জীবনের গভীরতা আবিষ্কারে বিমুখ। এর ফলে তারা জীবনের পূর্ণ ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণ-বৈচিত্র্য নিয়ে বেঁচে থাকবার কথা ভুলে গেছে। ঢুকে পড়েছে যে প্রকাশ্য সংগ্রামে তারা তাদের নিয়তির পথ বাধামুক্ত করে নিতে পারবে না। এ মনোভাব থেকে তারা ভীরুর মতো কতকগুলো অশুভ শক্তির সাথে আপোষ করতে উদ্যত। অকল্যাণকর পরিবেশের পরিবর্তন যে চায়, তাকে অবশ্যই নিজের অন্তর্নিহিত সত্তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধন করতে হবে। যে পর্যন্ত কোনো জাতিই পরিচ্ছন্ন আদর্শের আলোকে নিজেদের দৈনন্দিন কর্ম প্রচেষ্টার পটভূমিকা বিরামহীনভাবে আলোকিত রেখে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ না করে, সে পর্যন্ত আল্লাহ নিজ হাতে তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটান না। এই আদর্শের আলোকে সম্প্রদায়ের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের উজ্জীবন এবং ঘুমন্ত কর্মস্পৃহার সংগঠন একান্ত প্রয়োজন। জীবনের শিখা অন্য থেকে ধার করা যায় না।

নিজ আত্মার মন্দিরেই এ প্রদীপ্‌ জ্বালিয়ে ধরতে হয়।

এই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়কে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত করে অধিকতর আধুনিক রাজনৈতিক ধারণাবলী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। পাকিস্তানের অভ্যুদয় ইকবালেরই ভবিষ্যদ্বাণীর সার্থক রূপায়ণ। একজন কবি দার্শনিকের পক্ষে এমন সরাসরিভাবে একটি জাতির নিয়তি নির্মাণ কার্যে হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অতি বিরল।

ইকবালের সমালোচকেরা যখন তখন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে আপাত-স্ববিরোধিতার উল্লেখ করতে উৎসাহবোধ করেন। ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা প্রসঙ্গে জনৈক তরুণ বুদ্ধিজীবী আমার হাতে ইকবালের তথাকথিত অস্বচ্ছ চিন্তার উদাহরণাবলীর একটি তালিকা ধরে দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল ঃ

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন; তখন তাঁর চোখে ছিল ঃ আমার ভারত সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে উত্তম। যা হোক, অল্পকাল পরেই ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা যখন মুসলমানদের বিশেষ সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করলো, তাদের জন্যে ব্যবস্থা পরিষদে এবং সরকারী কার্যে আলাদা কোটা রাখতে অস্বীকৃতি জানালো, তখন ইকবাল ব্রাহ্মণদের ওপর বিরক্ত হয়ে বললেন, তাদের জগতে মুসলমানদের স্থান হতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকরূপে। বিশ্বযুদ্ধ পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের অসঙ্গতি ও অপূর্ণতার প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো; তিনি একে আক্রমণমূলক প্রসারণাবাদ বলে আখ্যায়িত করলেন এবং সান্ত্বনার জন্যে হেজাযের দিকে ফির তাকালেন। সাথে সাথে তিনি রুশ বিপ্লবের প্রতি আকৃষ্ট হলেন এবং তাকে আফতাব ই তাযা বলে আখ্যা দিলেন। উৎসাহের আতিশয্যে তিনি বাল-ই-জিব্‌রীল-এ লেনিনকে নিয়ে সপ্তাকাশে উড়লেন, ফিরিশ্‌তাদেরকে আল্লাহর নির্দেশনামা শোনালেনঃ

ওঠ! আমার দুনিয়ার বঞ্চিতদের জাগিয়ে দাও;
ধনীর প্রাসাদের প্রতিটি ইষ্টক কাঁপিয়ে তোলো।
যে শস্যক্ষেত্র থেকে কৃষক তার জীবিকা সংস্থান করতে পারে না,
তার প্রতিটি শস্যকণা জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও।

মানসিক বিবর্তনের এ পর্যায়ে তিনি মনে করতেন যে জাতি, বর্ণ, সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় গঠন-পুষ্ট যে সংস্কৃতি বক্ষ্যমাণ পৃথিবীতে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা হলো ধনতন্ত্রী সমাজেরই একটি লেজুড়মাত্র। তিনি এ সংস্কৃতির তীব্র নিন্দা করেছেন এবং এ ভেবে আনন্দ প্রকাশ করেছেন যে, মানুষ এসব শৃংখল থেকে ক্রমশ নিজেকে মুক্ত করে নিচ্ছে। পর মুহূর্তে কিন্তু তিনি আবার গোষ্ঠীগত গণতন্ত্র ও খিলাফত-এর তারিফ করেছেন। সমালোচক আরও উল্লেখ করেন যে, কয়েক বছর পরে যখন ইতালী ও জার্মানীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন দর্শন অনুসারী ফ্যাসীবাদের উদ্ভব হলো, তখন তিনি পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করলেন; এবং এমনকি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মুসোলিনীর নীতিবাক্য লোহার যে অধিকারী, সেই রুটির অধিকারী কথাটির ঘনঘন উদ্ধৃতি দিতে আনন্দবোধ করলেন।

এই তরুণ সমালোচকের সিদ্ধান্ত হলো ঃ ইকবাল তাঁর কালের মুসলিম সমাজের মধ্যেকার বিভিন্ন ও পরস্পর বিপরীতমুখী মনোভঙ্গি ও সামাজিক মতিগতিসমূহ নিজ অন্তর দর্পণে প্রতিফলিত করেছেন। এই ভাবপ্রবণ যুবকের মতে, বর্তমান মানুষ জীবনের প্রতিক্ষেত্রে যে কঠোর বাস্তব সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয়েছে, সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেগুলোর সমাধানের পথে তাকে এগিয়ে যেতে হবে এবং পদে পদে দুরতিক্রম্য চ্যালেঞ্জ জয় করেই তাকে নবতর জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে হবে। ইকবালের বাণী এর সহায়ক নয়। ইসলামের পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে যে ধারণা তাঁর কবিতায় অমরত্ব লাভ করেছে, তা কবিসুলভ স্বপ্ন, ঐতিহাসিক সত্য সম্ভাবনা নয়। অতীতকে পুনর্জাগরিত করবার এ মতবাদ একজন দার্শনিকের আকাশচারী কল্পনার খোরাক যোগাতে পারে, হয়তো বা তারকারাজির সীমার অতীতে নতুন জগত আবিষ্কার করতে পারে, কিন্তু বাস্তব পৃথিবীতে স্বর্গ রচনা করতে পারে না।

অধিকতর সহানুভূতিশীল পাঠকেরা চেয়েছেন ঃ কবি যা তাঁর সমসাময়িকদের সাথে সাথে একাত্ম হয়ে ভেবেছেন এবং যা ভবিষ্যৎকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, এ দু'য়ের মধ্যে সীমারেখা টানতে। তাঁরা বলেছেন যে, ভাবপ্রবণতার ক্ষেত্রে ইকবাল তাঁর সমসাময়িকদের হৃদয় স্পন্দন নিবিড়ভাবে নিজ হৃদয়ে অনুভব করতেন; কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি তাদের থেকে বহু দূরে দূর-ভবিষ্যতে বাস করতেন। সমসাময়িকদের গর্ববোধ ও সংস্কারাবলী, আশা ও কামনায় ইকবালও অংশীদার ছিলেন। তিনি এক সময় ডগ্‌মা'র সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে নিজ দেশবাসী ও নিজ সম্প্রদায়ের আচার-বিচারকে তুলে ধরতেন, কিন্তু পরমুহূর্তে সব ডগমার বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসতেন। বস্তুত তিনি তাঁর জাতির ভালো-মন্দ, মৌলিক ক্ষণিক সর্বপ্রকার আবেগ-অনুভব নিজ অন্তরে ও হৃদয়ে গ্রহণ করতেন এবং এগুলোর মধ্যে সহজাত যুক্তিবিরুদ্ধ মনোভাবাবলীর স্থানও ছিল। কিন্তু সাথে সাথে তিনি এসব কিছু থেকে নিজেকে বহু উর্ধ্বে উন্নীত করে তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে মুক্তির উপায় স্বরূপ ইসলামী চিন্তার পুনর্ব্যাখ্যায় নেতৃত্ব দান করেছেন।

এই বিশ্লেষণ অবশ্য নির্বিচার সাধারণভুক্তিকরণ দোষদুষ্ট এবং ব্যাপারটাকে অতি সহজ করে দেখবার চেষ্টার ফল। এর একটিও সমর্থনযোগ্য নয়। একজন সৃষ্টিধর্মী প্রতিভাকে সাধারণ বাজারী মাপকাঠি দিয়ে পরিমাপ করতে যাওয়া বা দৈনন্দিন ব্যবসায়িক আইন-কানুন দিয়ে বিচার করা চলে না। ইকবালের সামগ্রিক সাধনার মূল্যায়ন করতে হলে, সহানুভূতি ও গুণগ্রাহিতার সাথে তাঁর পরিবেশের প্রেক্ষিতে তাঁর অন্তহীন সত্যানুসন্ধিৎসার বিষয় বিবেচনা করতে হবে। তাঁর চারিত্রিক অখন্ডতা তাঁকে আত্মপ্রসাদবোধ বা একটি বিশেষ ধারণার প্রতি অন্ধ আনুগত্যে স্থির থাকতে দিতে পারতো না। যখন তিনি দেখেছেন যে, কোনো ধারণা বা আদর্শ, সংজ্ঞা বা মতবাদ বাস্তবভিত্তিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে বা পরিণত মানসিকতার সংঘাতে ভূপাতিত হয়েছে, তখনই তিনি তার ভাঙ্গনশীল ভিত্তিভূমি পর্যন্ত উপড়ে ফেলে নবোদ্যমে নতুন পথ কাটতে লেগে গেছেন। তাঁকে অস্থিরমতিত্ব বা অপরিণতবুদ্ধিত্বের দোষ দেবার অর্থ হলো জীবনবোধের অমর্যাদা করা পরিবর্তে আলোকসজ্জার মধ্যে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের বিচিত্র রূপায়ণকে অস্বীকার করা। জীবনকে যাঁরা পরিণত বিকাশ সম্ভাবনা রহিত ব্যবস্থাপত্র বলে মনে করেন, ইকবাল হেন প্রতিভার বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাঁদেরকে নিদারুণ ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন বলতে হবে। এ ধরনের কাজ রীতিমতো পাপাচারের শামিল। তাঁর পরিবর্তমান ও বিকাশমান চিন্তা ও আদর্শকে কড়াকড়িভাবে বিধিবদ্ধ সূত্রাবলীর আওতায় এনে বিচার করতে যাওয়াটা মূলত অন্যায়। ইকবাল তাঁর সৃষ্টিধর্মী তীর্থযাত্রার পথে সব সময়ই ক্ষুদ্র থেকে আরম্ভ করে বৃহৎ -এর দিকে এগিয়ে গেছেন, এবং আরও বৃহত্তরের দিকে নির্দেশ দিয়েছেন। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ থেকে আরম্ভ করে তিনি ইসলামী আন্তর্জাতিক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের দিকে প্রয়াণ করেছেন। এদিক থেকে বিচার করলে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি তিনি যে দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন, তাকে পশ্চাদপসরণ বলা চলে না; কেননা, তিনি ভারতীয় মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশসমূহ সমবায়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন অর্থে বুঝতেন, ভবিষ্যতের পটভূমিতে তিনি বিশ্ব মুসলিম সংঘ গঠনের যে স্বপ্ন দেখতেন তারই

অংশবিশেষ হিসেবে। এ ক্ষেত্রে কবি ভুল করেননি; বরং তাঁরাই ভুল পথে পা বাড়িয়েছেন, যাঁরা তাঁকে শুধুমাত্র পাকিস্তানের আঞ্চলিক কবি বলে আখ্যায়িত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মৌলিক বিষয়বস্তু পাকিস্তান নয়, বরঞ্চ মানুষ ও মহাবিশ্ব সম্পর্ক।

তাঁর প্রথম জীবনে রচিত বইগুলোতে দেখা যায়, তিনি প্রধানত নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত। নিজস্ব আত্মিক রূপ এবং বহির্জাগতিক বাস্তব সত্য সম্পর্কে তাঁর নিজের অনুভূতি নিয়েই তখন তাঁর পরিমন্ডল সীমায়িত। তারপর তাঁর প্রধান অলঙ্কারধর্মী কবিতাবলীতে ঝঙ্কৃত হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গান। তারপর আসে আন্তর্জাতিক মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ। তারপর তাঁর কাব্য পরিণতিতে দেখা যায় বিশ্ব প্রকৃতির মুখোমুখি মানুষের মাহাত্ম্য ও যশোগাঁথা কীর্তনে তাঁর আত্মনিয়োগ। এখানে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা বিশ্ববিধাতা আল্লাহও রয়েছেন। এবং মানব বিবর্তনের পর্যায়ক্রমে তিনিও জড়িত। *বাল-ই-জিব্রীল* ও তৎপরবর্তী পর্যায়ে তিনি মানুষের জয়গান করেছেন এবং মানুষের নিঃসঙ্গতার কথা বলেছেন এ দু'টি পরস্পর পরিপূরক ব্যাপার; কেননা অধিকতর উচ্চতায় উপনীত হবার অর্থই হলো নিজেকে অন্য সবকিছু থেকে আলাদা করে নেওয়া; এবং মানুষের ওপর যে সংগ্রাম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার নিজের বিরুদ্ধে, বিশ্বপ্রকৃতি ও সমাজের শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে বলতে কি, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি এবং সমগ্র ভাবীকালের বিরুদ্ধে সে অবস্থায় তার প্রায় অসহনীয় একাকিত্ব সহ্য করে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। ইকবাল মনে করেন যে, এই দুরন্ত চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার ক্ষমতাতেই নিহিত রয়েছে মানুষের প্রকৃত মাহাত্ম্য। অবশ্য তাকে প্রথম থেকেই জানতে হবে যে, এ চ্যালেঞ্জ কখনও সে পুরোপুরি পূরণ করতে পারবে না। একাধারে নিজের এবং নিজ শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এ পথে তাকে অনন্তকাল ধরে এবং অবিরাম প্রচেষ্টায় অগ্রসর হতে হবে।

ইকবালের পরিণত বয়সে রচিত কবিতালী এই অপূর্ব মহিমান্বিত ভাবের রূপায়ণের যথাযোগ্য বাহন হবার গৌরব অর্জন করেছে। তিনি এখানে সেই মানুষের জয়গান করেছেন যে, মানুষ বিজয়ীর বেশে পথের সকল বাধাবিঘ্ন উল্লংঘন করে এগিয়ে চলবে, কিন্তু তার এ পথের অন্তসীমা কখনও দৃষ্টিগোচর হবে না।

শেষপর্যায়ে ইকবাল দেখেছিলেন বিশ্ব প্রকৃতি ও নিজের ওপর বিজয় লাভের পথে মানুষের অন্তহীন ভবিষ্যৎ। এই অনন্ত সংগ্রামের অন্তর্নিহিত প্রেরণার উৎস হলো প্রেম-আদর্শের প্রতি প্রেম এবং মহত্ত্বের প্রতি প্রেম, এ পথে মানুষ যতই মহত্ত্ব অর্জন করুক না কেন, ততই সে আরও উচ্চস্তরের মহত্ত্বের পরিচয় পাবে এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকবে। এ মহত্ত্বের শেষ স্তর নেই এবং প্রেমের আকুতির স্পৃহার শেষ নেই। মহাকাশে দূর-দূরান্তরস্থিত তারকারাজির সীমা পেরিয়েও আরও বহু অনাবিষ্কৃত জগত রয়েছে। ইকবাল সেই অনন্ত-অসীমের দিকে চোখ তুলে নিজের খুদীর মহত্ত্ব অবলোকন করেছেন: মানুষের মহত্ত্ব; আনন্দ, বেদনা এবং এই আদর্শের পথে আত্মার অভিসারের তীব্র আকু[illegible]র গান গেয়েছেন। তাঁকে রাজনীতিক দার্শনিকরূপে অঙ্কিত করা ভ্রমাত্মক। সমগ্র মানবজাতির জন্যে এই কবি দার্শনিকের যে বাণী ছিল, এ ক্ষেত্রে তা অনুধাবনীয় ঃ

হে পাশ্চাত্যবাসী
আল্লাহর পৃথিবী একটি দোকান ঘর নয়।
আর তোমরা যাকে সত্যিকারের স্বর্ণমুদ্রা মনে করছো
তা মেকী বলেই প্রমাণিত হবে।
তোমাদের নিজেদের উদ্যত খঞ্জরের উপরই আপতিত হবে
তোমাদের সভ্যতা।
ভঙ্গুর বৃক্ষশাখায় নির্মিত কুলায়
ভেঙ্গে পড়বে আজ নয় আগামীকাল
কখনো এ স্থায়ী হবার নয়।
আজকের বিনম্র পিপীলিকা সংঘ
যে নৌকো তৈরি করবে গোলাব পাপড়ি দিয়ে,
তাই আমাদেরকে পার করে নিয়ে যাবে
ঝড়-ঝঞ্জা তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্রের ওপারে।

কবি এখানে শ্যেণদৃষ্টি দিয়ে বক্ষমাণ বিশ্ববিজয়ী শ্বেত-সভ্যতার সঙ্কট ও রোগ আবিষ্কার করেছেন, এবং দু'টি বিশ্বযুদ্ধ তাকে বিশ্ববাসীর চোখের সামনে তুলে ধরেছে। রাজনীতি তাঁর প্রথমা প্রেয়সী ছিল না, ছিল তাঁর দর্শনের একটি উপজাত শাখামাত্র। বিশ্বব্যাপী ইকবালের পাঠক-পাঠিকাসংঘ এ সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করলে পাকিস্তান ও বহির্বিশ্ব উভয়েরই সমূহ কল্যাণ সাধিত হবে।

লাহোরে ইকবাল দিবস উপলক্ষে ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় সৈয়দ মহবুব মুর্শেদ বর্লেন-

আজকের এই মহান দিবসে আমি সুগভীর কর্তব্যবোধ ও বিনয়াবনত মন নিয়ে আপনাদের সহস্রকণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলাতে এসেছি। আমি মস্তক অবনত করছি সেই পবিত্র স্মৃতির প্রতি যার দীপ্তি কখনও ম্লান হবে না। সে জীবন ছিল একটি বিমল অগ্নিশিখাসদৃশ। নিয়তি তাঁকে পরম গৌরবে অভিষিক্ত করেছে, মৃত্যু তাঁকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, অসীম তাঁকে ধরা দিয়েছে;' দ্রষ্টা, চারণ, দিশারী, দার্শনিক, কবি, স্বাপ্নিক এবং সর্বোপরি ঋষি ও গুরু এই হলো ইকবালের সত্যিকারের পরিচিতি। বহুবর্ণ মিনারের মতো স্থান-কালের শুভ্র ঔজ্জ্বল্যে চিত্ররূপ ধরে দন্ডায়মান সে জীবন। অনন্ত প্রবহমান ও উচ্ছ্বাসমুখর স্রোতধারা কালগর্ভে লীন হবার নয়, জরা একে স্পর্শ করতে পারে না। জীবনের জ্বরাগ্রস্ত কোলাহল এবং কালচক্রের তীব্র মর্মরধ্বনির উর্ধ্বে সঞ্চরণরত তাঁর কণ্ঠস্বর মানুষকে শুনিয়েছে অমরত্বের বাণী, যে বাণীর ভাষা অপূর্ব, ঝঙ্কার অতুলনীয়। যতদিন সমীর প্রবাহ আমাদেরকে ঘিরে বিরাজ করবে, যতদিন আসমানে তারকারাজি আলোক বিকিরণ করবে, ততদিন আমরা ও আমাদের উত্তরপুরুষেরা তাঁকে অভিনন্দন জানাব, তস্‌লীম দেব। নিজের সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

> আমার পরে তারা আমার কবিতা পড়বে,
> হৃদয়ঙ্গম করবে এবং বলবে ঃ
> নিজের খুদীকে জেনেছিল যে মানুষ
> পৃথিবীতে সে বিপ্লব এনে দিয়ে গেছে।

আমরা কবির কাব্য বিচার করি তুলনা-নিরপেক্ষ মন নিয়ে, কিন্তু তাঁর প্রতিভা বিচার করি তুলনামূলকভাবে। কোনো দেশ যখন বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান কবির জন্মে ধন্য হয়, অথচ তাঁদের একজন অন্যদের চেয়ে উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়ান, তখন এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, তিনি সাধারণ মানুষের মনের অর্গল ছিন্ন করে উর্ধ্বদেশে উন্নীত হয়েছেন। তারপর তাঁর কাব্যের উৎকর্ষ, সঙ্গীতের উদাত্ততা, চিন্তার গভীরতা, আদর্শের উত্তুঙ্গতা, অঙ্কন সমৃদ্ধি, উদ্দেশ্যের অকপটতা এবং বর্ণনার লালিত্য বিচারে তাঁকে মানব ইতিহাসের অমর কবিগোষ্ঠীর মধ্যে স্থান দেওয়া হয়। ইকবাল সম্বন্ধে গিরামী বলেছেন ঃ

> বিশ্ব রহস্যের যাঁরা খবর রাখেন তাঁদের চোখে
> ইকবাল একজন পয়গম্বরের কর্তব্য পালন করে গেছেন,
> যদিও তাঁকে পয়গম্বর বলা যায় না ।

আজকের এই বিদ্বজ্জন সমাজের কাছে আমি কোনো পান্ডিত্যের দাবী নিয়ে আসিনি, কিন্তু এ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মাঝে মাঝে তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসবার সৌভাগ্য ছাড়াও আমি তাঁর বহুমুখী চিন্তাধারা এবং সাহিত্য সম্পদের সাথে যৎকিঞ্চিৎ পরিচিতির দাবী করি। ইকবালের বাণী আমার অন্তরে যে অভূতপূর্ব প্রেরণা যুগিয়েছে, যেভাবে তা আমার হৃদয়মন কানায় কানায় ভরে তুলেছে তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আজ এ অল্প পরিসরে আমি শুধু তাঁর প্রশংসা-কীর্তনই করতে পারি. আমার ভরা হৃদয়ের অর্ঘ্য তাঁকে নিবেদন

করতে পারি; তাঁর বিশাল সাহিত্যিক দার্শনিক কীর্তির পরিচিতি দান প্রচেষ্টা আমার জন্যে অত্যন্ত অনধিকারের কাজ হবে। প্রকৃতপক্ষে তাঁকে কোনোভাবে শ্রেণী নিবদ্ধ করতে যাওয়া বা কতকগুলো বৈয়াকরণিক রীতি-নীতির মধ্যে আবদ্ধ করে দেখবার চেষ্টা করা সম্ভব নয়। অতএব আমি প্রয়াস পাবো তাঁর বহুমুখী সৃষ্টিকে যতখানি সম্ভব সাধারণভাবে রূপায়িত করে তুলে ধরতে। তিনি বলেছেন ঃ

এক-এর রহস্য বহুতে নিমজ্জিত;
জোনাকীর আলোক এবং ফুলের সুঘ্রাণ আসলে একই।

আমরা তাকে দেখতে পাই অসীমে দৃষ্টি নিবদ্ধ এক একান্ত একেলা মুসাফিররূপে। তাঁর কবিকীর্তি দিগন্তের রূপ মহিমায় ঝলোমলো; গৃহকোণের আমেজ তাতে নেই। তাঁর অন্তরের অক্লান্ত আবেগ তাঁকে কখনও আলস্য শয়নের অবসর দেয়নি। অন্যদিকে তাঁর চিন্তা ও অনুসন্ধিৎসার গভীরতা, বর্ণনাশৈলির উচ্চমান, কলা-কৌশলের নৈপুণ্য তাঁকে তুলে ধরেছে সকলের উর্ধ্বে। দৃশ্যমান জগতের সুখ-দুঃখের আড়ালে তিনি অদৃশ্য সুন্দরের সন্ধান করে বেড়িয়েছেন। নিজ জীবনেই তিনি পরিপূর্ণ সুন্দরকে অনুধাবনের পথ কেটে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, অসীমের রূপসীমার প্রসারে ধরা দেয় না, ধরা দেয় মানব চরিত্রের পূর্ণতায়। এর জন্যে বিরামহীন সাধনা ও অনুসন্ধিৎসাই তাঁকে দৃশ্যমান বিশ্বের মোহাচ্ছন্ন বন্দিত্ব থেকে কিম্বা কর্মবিমুখ জীবন-যাপন থেকে বিমুক্ত রেখিছিল। তিনি লিখেছেন ঃ

যে সঙ্গীত আজ নিশ্চুপ হলো তা হয়তো আবার শোনা যাবে কিম্বা যাবে না,
হেজায সমীরণ হয়তো আবার বইবে কিম্বা বইবে না।
এ ফকিরের দিন ফুরালো,
আর একজন রহস্যজ্ঞানী হয়তো আসবে কিম্বা আসবে না।

আমি চিন্তা করতে শিখলাম এবং বিশ্বাস করলাম যে, প্রতিভা একটি খেয়ালিপনা নয়, মানবগুণ একটি মুখোশমাত্র নয়। মানুষের হৃদয়ে অনাবিল প্রেমের আসন রয়েছে। মানুষের জীবন উপহাস বা স্বপ্নমাত্র নয়।

প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে রয়েছে অমরত্বের প্রতি আকুতি; এর থেকে প্রথমে তার মনে আশার সঞ্চার হয় এবং পরে সে আশা এ বিশ্বাসে রূপান্তর লাভ করে যে, তার মধ্যে আল্লাহ এমন কিছু দিয়েছেন যা ধুলি থেকে উত্থিত হয়েও পুষ্প সম্ভারে বিকাশ লাভ করে। হাসরত মোহানী বলেছেন ঃ

হে হাসরত! এই একমুঠো ধুলো বিফলে যাবে না,
এর কিছুটা মাটির সাথে মিশবে, আর কিছুটা আকাশের সাথে।

আল্লাহ মানুষকে অমরত্ব সম্ভাবনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর অশেষের রূপ তাতে আরোপিত করেছেন। মানুষের উদ্ভব এ থেকে এবং মানুষের জীবনাদর্শ এরই রূপায়ণ। এই ছিল ইকবালের বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানব জীবনের অমর অংশ ধুলায় বিলীন হবে না; সূর্যের মতো, তা মৃত্যুর পরেও পুনরুত্থিত হবে। তিনি আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন ভবিষ্যত সমীরণের সুস্নিগ্ধ আঘ্রাণ নিতে, স্বপ্নছায়া অতিক্রম করে আশার বর্তিকা

জ্বালিয়ে ধরতে। তিনি জানিয়েছেন যে যারা অনন্ত জীবনে বিশ্বাসী, তাদের জন্যে এই জীবন একটি অপেক্ষমাণ মন্‌যিল মাত্র। আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে বালুকারাশিও গুণে শেষ করা চলে; রূপময় পরজীবন এ বালুতট থেকে সুদূর প্রসারিত অনন্ত এবং অসীম তার প্রসার। এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মানুষের সাম্প্রতিক জীবনকে একটি দুর্দশার মানচিত্র বা চোখের জলের নদীর উপর একটি ক্রন্দনময় সেতুবন্ধ বলে মনে করা চলে না; তা হলো একটি পরম আশার পরম সান্ত্বনার ক্ষেত্র। এ আশাময় দৃষ্টি, এ দূরপ্রসারী কল্পনা নিয়ে ইকবাল মানব ভবিষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন।

কবিতার মোহমধুর রাজ্যে ইকবালের অভ্যুদয় হলো গযল ও অনুপম ছন্দ সম্পদের মাধ্যমে। যে শব্দ ঝঙ্কার ও উন্মাদনা তাঁর কাব্য বৈশিষ্ট্য, তা যথাযথরূপে অনুবাদে রূপান্তরিত করা অসম্ভব। এক একটি লাইন জোয়ারের ঢেউয়ের মতো সাবলীল ভঙ্গিতে ফেঁপে ওঠে, আছড়ে পড়ে। একটি শব্দ কোথাও হুমড়ি খায় না, একটি লাইন পিছিয়ে পড়ে না। বাঁশরীর সুরের মধুর বেদনার মতো প্রতিটি ছত্রের অন্তর ভরে জেগে ওঠে একটি সতৃষ্ণ অনুভূতি। এ অনুভূতি একাধারে সৈনিকের পথ চলার মতো দৃপ্ত এবং চন্দ্রের কিরণের মতো, প্রতিহত আশ্রুর মতো বেদনাবাহী। তাঁর শব্দ সম্ভার, তাঁর বর্ণনাভঙ্গি এতো উচ্চগ্রামের যে, তা থেকে অনন্তকাল আলোক বিকিরিত হতে থাকবে। তাঁর কাব্যস্রোতে সন্তরণকারী পাঠক ঊর্মির পরম্পরায় একটি অপূর্ব স্বপ্নজগতে প্রয়াণ করে। অস্বাস্থ্যের বেড়াজাল ছিন্ন করে সে প্রকৃতির অন্তঃকরণে প্রবেশাধিকার পায়। তাঁর কাব্যের ধারা নিখুঁত, যাদুমন এবং পাঠককে পরমানন্দে আত্মহারা করবার মতো শক্তিমান।

বসন্তের সুরভি, প্রস্ফুটিত পুষ্পের রূপ, পক্ষীর কুজন, প্রজাপতির বিচিত্র বর্ণলীলা, নির্ঝরের অফুরন্ত গতিভঙ্গির মতো বয়ে চলেছে তাঁর রূপকল্প তাঁর রচনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বর্ণনার উচ্ছ্বাস কখনও প্রদমিত হয়নি, অথচ মাত্রাজ্ঞান পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে।

পূর্বচরিত রচনাশৈলি ও উপমা প্রয়োগ করেও তিনি তাঁর সম্মুখের পথ সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীল শক্তিমত্তার কাছে অভিভূত না হয়ে পড়া অসম্ভব। দৈনন্দিন লাভ-ক্ষতির হিসাব, উচ্চাশাজনিত শ্রম, হাঙ্গামা-হুজ্জত, প্রতিযোগিতা এবং ক্লান্তি থেকে মানুষের মনকে বিমুক্ত করে তাঁর কাব্য তাঁকে এক পরম শান্তিময় উর্ধ্বদেশে টেনে নিয়ে যায়। এ প্রশান্ত অথচ উদ্দীপনাময় আহ্বানের শক্তি তুলনাহীন, আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। জীবনের উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে আবার এ জীবনকে এক মহত্তর ঐক্যতানে বন্দী করে নেয়। উদাত্ত ছন্দদোলায় তা আত্মাকে উজ্জীবিত করে তোলে।

ধর্মীয় দর্শনে নিমজ্জিত চিত্ততা, দৃঢ় ও আপোষহীন আস্তিক্যবোধ, জ্বলন্ত বিশ্বাস-এ সবই ইকবালের ঐকান্তিক ও অকপট অন্তরের প্রকাশ। বলতে কি, এগুলো তাঁর অন্তরে প্রবহমান একটি ফল্গুধারার বহিঃপ্রকাশ শুধু নয়, বরঞ্চ এ থেকে তাঁর অনুভূতি পেয়েছে প্রকাশের ভাষা। কালবক্ষে তাঁর অক্ষয় খ্যাতির অনেকখানি নির্ভর করবে এর ওপর।

দর্শন হলো সকল শিল্পের শিল্প; এবং দার্শনিক ইকবালের জীবন শুধু তাঁর জীবনকাল দিয়ে বিবেচিত হবে না। এ জীবন হলো নির্জলা অগ্নিশিখা এবং উন্মাদনা স্বরূপ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, আমাদের জীবনীশক্তি আসে একটি অদৃশ্য আলোক থেকে এবং সে আলোকের অবস্থান আমাদের অন্তর্জগতেই। তাঁর ভাষা হলো ইতিহাসের রক্ষণাগার।

কর্দোভা, গ্রানাডা এবং মুসলিম ইতিহাসের অন্যান্য বিষয় ও ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর উল্লেখে রয়েছে ভবিষ্যতের প্রতি আশান্বিত দৃষ্টিপাত- আফসোস অথবা পরাজিত মনের পশ্চাৎদৃষ্টি নয়। তাঁর মন কখনও ধুলিলুণ্ঠিত হয়নি। তিনি চেয়েছেন মানুষের জন্যে সুউচ্চ আশার বাণী রেখে যেতে এবং কঠোর আত্মশাসন এবং সাথে সাথে সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি উদার মনোভঙ্গি নিয়ে দৃষ্টিপাত করতে। জাতীয়তাসুলভ মনোবৃত্তির রূপায়ণের বেলায় তিনি কখনও নিজ বিশ্বজনীন নীতিবোধ থেকে বিচ্যুত হননি।

তাঁর লেখনী সব সময় তাঁর অন্তরকে অচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করেছে। তাঁর কাব্যকলা থেকে দার্শনিক চিন্তায় প্রয়াণ এত সুষম ও অনায়াস যে, পাঠক বুঝতেই পারে না কোথায়, কখন পরিবর্তনটা ঘটলো। আত্মার উজ্জীবন তিনি পরিপূর্ণরূপে অনুধাবন করেছেন এবং তুলনাহীন উপমা ও কল্পনার রেখায় রেখায় অঙ্কিত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি জীবনের একটি এমন মহৎ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায়নে কৃতকার্য হয়েছেন, যা অন্য ক্ষুদ্রতর স্রষ্টাদের দ্বারা সম্ভবপর হয়নি বা হতো না। তাঁর বাণী অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ক্ষেত্রে বিশেষ সমৃদ্ধ। তাঁর প্রতিভার উৎস হলো একটি সুগভীর ধর্মীয় বিশ্বাস। এ হেন কবি কীর্তির ধারক পৃথিবীতে অনেকজন জন্মায় না। এ রকম গভীর অনুরাগ ও প্রশান্তিপূর্ণ সাহিত্য, এ রকম সুউজ্জ্বল আলোকবর্তিকা যে সেখানে ছড়িয়ে নেই।

ইকবাল দর্শন ধর্মভিত্তিক, কিন্তু আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার বিরোধী নয়। অবশ্য, তিনি প্লাতোবাদী বিমূর্ত চিন্তাধারার চেয়ে জালালুদ্দীন রূমীর নৈতিক প্রবণতার দিকেই অধিকতর আকৃষ্ট ছিলেন। রূমী সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

রুমের পীর মৃত্তিকাকে অমৃতে পরিণত করেছেন,
আমার ধুলিকণা সমারোহে তিনি স্বর্গীয় দীপ্তি আরোপ করেছেন।

জালালুদ্দীন রূমীকে তিনি গুরু বলে উল্লেখ করেছেন। জালাল উদ্দীনের প্রভাব তাঁর অন্তরের পরতে পরতে ব্যাপ্ত। তিনি নিজেকে এই মহান গুরুর শিষ্য বলে ঘোষণা করেছেন ঃ

আমার মুর্শিদ রূমী অমলিন দর্শনের ধারক,
আমাকে তিনি জানিয়েছেন জীবন ও মৃত্যুর গূঢ় রহস্য।

আসরার ই খুদীর প্রস্তাবনায় তিনি বর্ণনা করেছেন, কিভাবে রূমী তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে জেগে উঠ্‌তে এবং কবিতা রচনা করতে নির্দেশ দেন। যদিও তিনি সুফী নামধারী ব্যক্তিদের দ্বারা আচরিত ও উপাদিষ্ট বৈরাগ্যের বিরোধী ছিলেন, তবুও সাথে সাথে বিলাসিতা ও পার্থিব প্রমোদ স্পৃহা তার স্বীকৃতি লাভ করেনি। তাঁর বিশ্বাস অনুসারে আত্মত্যাগপরায়ণতা আত্মবিলোপের নামান্তর ছিল না। অবশ্য তিনি তাসাউফ বা সুফীবাদ বর্জন করেছিলেন বললে পুরোপুরি সত্য বলা হবে না। সুফী মতবাদ সাধারণ অনুসারীদের হাতে যে পূর্ণ আত্মবিলোপনের রূপ নিয়েছে এবং কঠোর সংসার বিরাগ সম্বল করেছে, ইকবালের মন তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে দ্বিধা করেনি; কিন্তু সুফীর এবং তাঁর উদ্দেশ্য অভিন্ন।

সূফিতত্ত্বের মহান নেতাদের মতবাদের সঙ্গে ইকবালের দর্শন অসামঞ্জস্য নয়। যেমন ঃ

জীবনের উদ্দেশ্য হলো লক্ষ্যস্থলে পৌছা-

তা হলো নিজ খুদীকে অনাবৃত অবস্থায় অবলোকন করা।

সূফী দর্শনের কোনো কোনো জনপ্রিয় শিক্ষক নির্জলা আত্মত্যাগ ও আত্মবিলোপন প্রচার করে গেছেন এবং ইসলাম অননুমোদিত সর্বেশ্বরবাদে জড়িয়ে পড়েছেন। এসব নবোদ্ভূত মতবাদাদি প্রতিরোধ করতে ইকবাল সর্বশক্তি ব্যয় করেছেন। তিনি বারংবার জোর দিয়েছেন আত্মোপলব্ধির ওপর। কিন্তু আত্মবিলোপনের প্রতি তাঁর বিরোধিতার কারণ সেই একই আদর্শের উপলব্ধি যা সূফীদেরও আদর্শ। তা হলো ঃ পরম-এর সাথে আপন-এর মিলন। শেষতম বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, এ গন্তব্যে পৌছাবার দু'টি ভিন্ন পথ রয়েছে; বিরোধ হলো পন্থায়, কিন্তু লক্ষ্যে নয়। লক্ষ্যের ব্যাপারে কোনো বিভেদ নেই; প্রকৃত প্রস্তাবে ইকবাল আন্তরিকভাবে সূফীদের প্রতি প্রশংসমান। তিনি তাঁদের সুখ্যাতিতে মুখর এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তিনি বলেছেন ঃ

আল্লাহ! সুফীর হৃদয় কি প্রবল শক্তিধর।
তাঁর নিশ্বাস মৃত মোমবাতিতে আগুন ধরাতে পারে।
তুমি যদি হৃদয়কে জীবন্ত করতে চাও, তবে প্রণত হও তাঁর কাছে।
একটি জীবন্ত হৃদয় হলো একটি মুক্তা যা রাজকোষে অলভ্য।
প্রশ্ন করো না, যদি তুমি বিশ্বাসী হৃদয়ের মালিক হও, তবে চেয়ে দেখো।
আস্তিনে প্রচ্ছন্ন (মুসার) শ্বেত হস্ত।

তা হলে ইকবাল কোন্ স্থির উদ্দেশ্যের পানে এগিয়ে চলেছেন? তাঁর দৃষ্টি কিসে নিবদ্ধ? তিনি বিশ্বাস করেন যে, জীবনের উদ্দেশ্য হলো আত্মোপলব্ধি। তাঁর কাছে জীবন সত্য, জীবন মরু মরীচিকা নয়, একটি উদ্দেশ্যহীন ফাঁকা আওয়াজ বা ক্রুদ্ধ ডামাডোল নয়। বেদান্তের আনুষ্ঠানিকতা ও দ্বান্দ্বিকতা তিনি অস্বীকার করেছেন। তথাকথিত সূফীদের সর্বেশ্বরবাদ এবং জীবনকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তি ও মায়ার আকর বলে প্রচারণাকে তিনি নাকচ করেছেন। কোনো কোনো দার্শনিক গোষ্ঠী মনে করে থাকেন যে, জীবাত্মা হলো পরম সত্যের সামনে খাড়া করা একটি পর্দাবিশেষ এবং আত্মবিলোপনই হলো জীবনের শেষ উদ্দেশ্য; ইকবাল এ মত বর্জন করেছেন। তাঁর মতে নিজেকে বিসর্জন দিয়ে নয়, বরঞ্চ নিজের মধ্যে পরম সত্যকে অনুভব করে ব্যক্তি জীবেন পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হবে– এ-ই হলো জীবনের উদ্দেশ্য। এ থেকে দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য একই। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায় ঃ এ উদ্দেশ্য সাধন হবে কি পরম-এ আত্মবিসর্জন দিয়ে, না পরমকে আপনার মধ্যে ধারণ করে? যা শেষতক পদ্ধতির প্রশ্ন, মৌলিক প্রশ্ন নয়।

কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ অনুসারীদের এই পন্থাগত ব্যবধানের গুরুত্বও অবহেলাযোগ্য নয়। ইকবাল পক্ষ নিয়েছেন আত্মবিলোপনবাদীদের বিরুদ্ধে। তাঁর মতে, কেবলমাত্র আত্মবিকাশ ও আত্মউপলব্ধির ফলেই পরমকে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব। এই বিকাশমান আত্মন্ই ইকবালের খুদী।

ইকবাল বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির বিকাশের জন্যে সমাজ জীবন অপরিহার্য। আর হযরত মুহম্মদ প্রবর্তিত ইসলামই হলো সেই ঈপ্সিত সমাজ ব্যবস্থা। এ ধারণা তিনি সংক্ষেপে

অথচ স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন হযরত রসূলুল্লাহর (সাঃ) হাবশী ভক্ত বিলাল সম্বন্ধে বলতে যেয়ে ঃ

এখনও জীবন্ত পুরাতন আসমান যা শতাব্দী শতাব্দী ধরে শুনছে।

ইকবাল! কার প্রেম থেকে এসব মহৎ দান আসে?

ইসকান্দর রূমী বিলুপ্ত হয়েছে, কিন্তু হাবশী আজও জীবন্ত।

ব্যক্তিসত্ত্বার পরিপূর্ণতা অর্জন সম্ভব করে তুলবার জন্যে ইকবাল চেয়েছেন পৃথিবীতে আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁর দর্শন তাঁর লেখার সর্বত্র জুড়ে আছে; কিন্তু তা পরিপূর্ণরূপে কেন্দ্রীভূত হয়েছে *আসরার-ই-খুদী* ও *রমুয-ই-বেখুদীতে* সংগৃহীত তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাবলীতে। তাঁর দর্শনের নীতি ও মৌল তত্ত্বাবলী ব্যাখ্যাত হয়েছে প্রথমোক্ত গ্রন্থে এবং সামাজিক প্রেক্ষিতে প্রতিফলিত হয়েছে দ্বিতীয় গ্রন্থে।

তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিসত্ত্বা সমাজ জীবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলে, সে মৃত্যুকে জয় করে অনন্ত জীবনের প্রান্তে উপনীত হয়- যার অপর নাম হলো ইসলাম। তিনি জোর করে বলেছেন যে, কোনো জাতির আত্মবৈশিষ্ট্য রক্ষার ক্ষেত্রে গঠনশীল হাতিয়ার হিসেবে কার্যকারিতাতেই রয়েছে ইতিহাসের প্রকৃত মূল্য।

ইকবালের মতে, আমাদের বিশ্বজগত একটি সম্পন্ন বস্তু নয়, এ এখনও নব নব সৃষ্টিরূপ পাচ্ছে। সৃষ্টি কর্ম অনবরত চলছে এবং তাতে মানুষেরও অংশ রয়েছে। মানুষের নৈতিক এবং ধর্মীয় আদর্শ হচ্ছে আত্মোপলব্ধি। এর উচ্চতম প্রকাশ হলো খুদী-যাতে ব্যক্তিসত্ত্বা আত্মনির্ভর ও অন্যনিরপেক্ষ কেন্দ্ররূপ লাভ করে। আল্লাহ থেকে যে যত অধিক দূরত্বে অবস্থান করবে, তার ব্যক্তিত্ব ততই দুর্বল থাকবে। যে আল্লাহর নিকটতম হতে পারবে সে-ই হবে সবচেয়ে পরিপূর্ণ মানব। সে আল্লাহতে আত্মবিসর্জন দেয় না, বরঞ্চ আল্লাহকে আত্মায়ত্ত করে নেয়। জীবন তা হলে হলো একটি আত্মস্থকরণ ক্রিয়া পদ্ধতি।

এটা সহজেই স্বীকার্য যে, *আসরার-ই-খুদীর* প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। এর রচনাশৈলির সাহসিকতা উল্লেখযোগ্য, এর ভাবধারায় রয়েছে সুষ্ঠু নৈতিক চিন্তা; কিন্তু এতে অন্তর্নিহিত অনুভূতি ও কল্পনার অনুপম দীপ্তি মনকে ডিঙ্গিয়ে হৃদয়কে আগে অধিকার করে নেয়। তবু বলতে হয় যে, এর রচনাশৈলি অতি উচ্চপর্যায়ের। ইকবালের মতবাদ হলো জীবন অবিরতভাবে গতিশীল। গতিহীন হওয়ার অর্থই মৃত্যু। অতএব জীবন জিজ্ঞাসা হলো অনন্ত, জীবন প্রগতি অফুরন্ত। তাঁর মতে, জীবন হলো গতি ঃ

চিরস্থিরতা ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইকবাল দর্শনের গতিশীলতা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

তাঁর দর্শনের গতিধর্মিতা তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারাকেও প্রভাবিত করেছে। তিনি ব্যক্তিকে সমষ্টির আওতায় দেখেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা তাঁর দর্শন থেকে উৎসারিত। আবার তাঁর দর্শন হলো তাঁর ধর্মীয় মনোভাবের প্রতিফলন। এ হলো একটি আন্তরিক বিশ্বাসের সামাজিক অভিব্যক্তি। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেছেন যে, মানুষ একটি অশুচি পৃথিবীর অধিবাসী নয় এবং এ সংসার ত্যাগ করতে হবে বলে যে ধারণা তা মিথ্যা। তাঁর ইসলামী নীতি অনুযায়ী তিনি দেহ ও আত্মার মধ্যে সংযোগ সাধন করেছেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শন হলো

প্রায়োগিক, অবশ্য উন্নত ও উন্নয়নশীল। তাঁর বিশ্বাস ঃ বিমুক্ত আত্মার জন্যে স্বাধীনতা হারানো মৃত্যুতুল্য। তিনি আমাদেরকে নির্দেশ দেন স্বাধীনতার সাথে বেঁচে থাকতে এবং স্বাধীনতার সাথে মৃত্যুবরণ করতে।

এ প্রসেঙ্গ তিনি আমাদেরকে বলেছেন হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করতে ঃ

মুস্তফার প্রতি ভালবাসা যিনি পোষণ করেন
ভূভাগ এবং জলভাগ তাঁর আস্তিনে জড়ানো।

তিনি বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তি জীবন সমাজ জীবনে গ্রথিত; এবং জাতীয় ঐক্য ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে। তাঁর ধারণায় ধর্ম রাজনীতি থেকে পৃথক নয়। তিনি বলেন ঃ

রাজতন্ত্রের জৌলুসই হোক বা গণতন্ত্রের তামাশাই হোক,
ধর্মকে রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে চেঙ্গিসতন্ত্রই বাকী থাকে।

এ কথা সত্যি যে, কোনো জাতির আশা-আকক্ষা তার জাতীয় চেতনা থেকেই উৎসারিত হয়ে থাকে; সাথে সাথে ইকবাল বিশ্বাস করেন যে, বিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রেরণা ছাড়া জাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে না। কবি একটি সর্বব্যাপী আধ্যাত্মিক আবহাওয়ায় নিজেকে নিমজ্জিত দেখতে পান। এই প্রচ্ছন্ন সুন্দরের মুখোশ খুলে ধরেছে তাঁর কবিতা। আকুল অথচ গভীর অর্থপূর্ণ বাণীর বাহন। আমরা দেখতে পাই যে, আত্মার অভিব্যক্তির শত-সহস্র পন্থা রয়েছে।

একজন আরস্তরকে ফকীরী লেবাস পরিয়ে দেখলেই ইকবালকে দেখা হবে না। ইকবাল হলেন একজন একনিষ্ঠ আলোক সন্ধানী। তিনি আসমানের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকেননি, দু'হাত বাড়িয়ে তার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, মানবাত্মার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতারূপ যে নাস্তিক্যবাদ তা হলো অল্পসংখ্যক মানুষের নীতি এবং তার দুই আরাধ্য হলো ধন ও ক্ষমতা। তিনি ঈশ্বর ধ্যানকে বিষয় চিন্তার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসবার সাথে সাথে, ঘনায়মান গোধূলিতে মানুষের মন স্বতঃই বিশ্বস্রষ্টার দিকে আকৃষ্ট হয়।

এ উপমহাদেশের রাজনীতিতে যৌবনে তিনি প্রবল আবেগ ও জ্বলন্ত বিশ্বাসের সাথে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে অখন্ড ভারত ও একক সার্বভৌম শাসন ব্যবস্থার প্রতি তাঁর বীতরাগ দেখা দেয়। তিনি অবশ্য দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, ধর্মাচরণে পার্থক্যের জন্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি অনুচিত। তাঁর একটি প্রসিদ্ধ বাণী ঃ

ধর্ম পরস্পরে ঘৃণা শিক্ষা দেয় না।

কিন্তু যুদ্ধোন্মুখ হিন্দুদের কাছে তিনি তিক্ততম অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতার ধারা প্রবাহ তাঁকে তীব্র আঘাত হেনেছিল। দুঃখের সাথে তিনি বলেছেন ঃ

হে ইকবাল! এ জগতে আমার দুঃখের অংশীদার নেই,
কে আমার গোপন বেদনার গভীরতা পরিমাপ করবে?

ঘটনা পরম্পরায় বাধ্য হয়ে তিনি মুসলমানদের জন্যে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখলেন।

আমরা দেখেছি, কিভাবে তাঁর গভীর ধর্মীয় বিশ্বাস তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। দেশবাসীর রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় তাঁর অবদান তুলনাহীন। কিন্তু সর্বোপরি তাঁর বৃহত্তম দান ছিল উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব সাধনের ব্যাপারে। তিনি *'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন'* শীর্ষক কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এসব বক্তৃতায় তিনি বর্তমান কালের সমস্যাবলীর প্রেক্ষিতে ইসলামের গতিশীলতা ও ধর্মীয় দর্শনের পুনর্ব্যাখ্যাদান ও পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকের পর, এলাহাবাদে আহূত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে তিনি ভারতে একটি সুব্যবস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী জানান। তিনি বলেন ঃ

> অতএব আমি ভারত এবং ইসলাম দু'য়েরই শ্রেষ্ঠ স্বার্থে একটি সুব্যবস্থিত মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের দাবী জানাচ্ছি। ভারতের জন্যে এর অর্থ হবে আভ্যন্তরীণ শক্তি-সাম্যের ফলে নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতিষ্ঠা; ইসলামের জন্যে এতে লভ্য এবং নিজ আইন-কানুন, নিজ শিক্ষা-পদ্ধতি, ভাবধারা ও বর্তমানকালের চিন্তা-ভাবনার সান্নিধ্যে আনবার সুযোগ।

এতকাল যে পাকিস্তান স্বপ্ন উপমহাদেশের রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অস্পষ্ট গুঞ্জন তুলেছিল, তা কবির দ্ব্যর্থহীন বাণীতে সন্দেহাতীত রূপ লাভ করলো। তাঁর স্বপ্ন কালে বাস্তবে পরিণত হলো; কিন্তু তা তিনি দেখে যেতে পারেননি। মুসলিম লীগের অধিবেশনে তিনি যে রাজনৈতিক পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, তারই ফলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। তিনি মোটা কথায় বলতে গেলে (পাকিস্তানের নীলনকশা দিয়ে ফাঁকা বায়ুমন্ডলে একটি স্থিতি, একটি নাম সংযোগ করলেন। 'পাকিস্তান ইকবাল আর ইকবাল পাকিস্তান'-এর কথা বললে কবিসুলভ অত্যুক্তি করা হবে না; কেননা, পাকিস্তানের জন্ম-পূর্ব হৃদয় তাঁরই গ্রহণশীল ও পরিচর্যাধর্মী বক্ষ কন্দরে প্রথম স্পন্দিত হয়েছিল।

ইকবাল ছিলেন একাধারে দার্শনিক, কবি, প্রচারক, দ্রষ্টা, শিক্ষক ও সংস্কারক-এক কথায় একালের শ্রেষ্ঠতম চিন্তা-নেতাদের অন্যতম। তিনি মানবতার একজন অপরাজেয় প্রতিভূ ছিলেন। মানুষের সমস্যাবলী, দুঃখ-দুর্দশা, সংগ্রাম, নিরাশা ও বিজয়ের সাথে তাঁর মতো আর কেউ নিজেকে বিজড়িত করেনি। তাঁর চিন্তা, তাঁর মন ভরে বিরাজ করতো একটি বিশ্বব্যাপী প্রেম। প্রথম জীবনে তিনি কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হন, তারপর তাঁর কর্মবহুল জীবন এবং অশান্ত আত্মা তাঁকে আর কখনও বিরাম দেয়নি। অসীমের উদ্দেশ্যে তাঁর অনন্ত অন্বেষা তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে ঃ

> একটি উন্মত্ত ঊর্মি তীরবেগে ছুটে যেতে যেতে বলে গেলো ঃ
> চলমানতাই আমার জীবন, থামলেই মৃত্যু।

তাঁর জীবন মধ্যাহ্ন গড়িয়ে যাবার পর অর্থাৎ তাঁর চল্লিশোত্তর বয়সে তাঁর সাথে কয়েকবার সাক্ষাৎকারের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এ ছিল আমার এক মহান ও বিশিষ্ট সুযোগ। তাঁর মানবীয় চিন্তার ঔজ্জ্বল্য এবং বিশ্বজনের প্রতি তাঁর উদারমমা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁকে জানার মানেই ছিল তাঁকে ভালবাসা। শুভ্র পোশাকে আচ্ছাদিত তাঁর মূর্তি ছিল একটি পূর্ণ মানবতার প্রতীক। যুক্তি-তর্কে তিনি ছিলেন অসাধারণ। আচার-আচরণ যদি

মানুষের আন্তরিক ঐশ্বর্যের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে, তবে তিনি ছিলেন উচ্চতম মানবগুণের অধিকারী। তাঁর সমক্ষে কাল ও প্রসর নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলতো। ইসলামের জীবন দায়িনী প্রেরণা বলে তিনি প্রতিভাত হতেন একজন পুনরুজ্জীবিত ইরানীয় সাধকের মতো।

তাঁর প্রতিভার যাদুস্পর্শ সমাজের হীনতম অঞ্চলকেও একটি রাজ্য গৌরবে গৌরবান্বিত করতো, জীবনের সাধারণ পথকে উজ্জ্বল করে তুলতো এবং শূন্যদিগন্ত পুষ্প সুবাসে ভরে দিতো। দরিদ্রের গৃহে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন মানুষের হৃদয় স্পন্দন, মানবীয় বেদনার সঙ্গীত স্বনন। বিরাট-বিশাল উপাসনালয় সদৃশ তাঁর অন্তরের বাতায়ন ভরে ছিল স্নিগ্ধোজ্জ্বল সূর্য কিরণজাল। তাঁর শান্ত-শুভ্র অন্তরের প্রভা মানুষের মনে পরম প্রশান্তির প্রলেপ দিয়ে যেতো, মানুষের মন ভরে তুলতো প্রীতি ও সৌরভ-সম্পদে। এমনই ছিল ইকবালের চরিত্র, এমনই ছিল তাঁর অমলিন ও রাজকীয় ব্যক্তিসত্তা।

এই বহুমুখী রচনাকুশলী কবি, গীতিকার, মহাকাব্য প্রণেতা, মসনবী স্রষ্টা, ব্যঙ্গাত্মক লেখনী চালক, প্রাবন্ধিক, পন্ডিত, রাজনীতিক ও দার্শনিক ছিলেন স্বয়ং একটি বিশ্বকোষের সাথে তুলনীয়। বলা যায় যে, তিনি যাঁর সন্ধানে ফিরতেন সেই ইন্সান-ই-কামিল (পরিপূর্ণ মানব) তিনিই ছিলেন। যদিও তিনি শান্তিকামী প্রাচ্যদর্শনের সাথে গভীর আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, তবুও প্রতীচ্য থেকে আহরিত দর্শন জ্ঞানকেও তিনি তুচ্ছবোধ করেননি। তাঁর চিন্তাধারার বিশ্বজনীন আবেদনের কারণ তাঁর এই অসীম ঔদার্য। তাঁর দেশপ্রেমের অন্তর্নিহিত শক্তি হলো ইসলাম ধর্মের বিশ্বভ্রাতৃত্ব; এ শক্তির মাধ্যমে তিনি সমগ্র বিশ্বকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছেন।

বর্তমান জগতের চিন্তাধারাকে ইকবাল-দর্শন কতখানি প্রভাবিত করেছে তা বলা কঠিন। কিন্তু এ কথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে, তাঁর উদ্দেশ্য বিরাটভাবেই সাফল্য লাভ করেছে। ইকবালের মতো এত অধিকসংখ্যক পাঠক লাভ কদাচিৎ কোনো লেখকের ভাগ্যে ঘটে থাকে। সব না হলেও তাঁর একাধিক বই ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, জার্মান, আরবী ও তুর্কী ইত্যাদি প্রতিটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর উপাসনামন্ডিত সঙ্গীতের সুর ভেসে উঠেছে তাঁর একান্ত মানবীয় স্বানুভূতি থেকে। এই হলো তাঁর কালজয়ী আকর্ষণ শক্তির মূল উৎস। ফরিয়াদের গান গেয়ে ঘুরে বেড়ানো সাধু ব্যক্তি তিনি নন। তাঁর 'শিকওয়া'র ভাবধারা বৈষ্ণবগীতির সমধর্মী নয়। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানব জীবন একটি বায়ুর ঝাপটার সাথে ভুলনীয় নয়, যা নিঃশেষিত হবার আগে অনুভূতই হয় না।

তাঁর বাণী হতাশার রোদন-সর্বস্ব নয়। ইসলাম সৌধের ভগ্নদশা অবলোকন ও রূপায়ণের বেলায় তাঁর কণ্ঠ ক্রন্দনে ভরে উঠেছে, কিন্তু সে ক্রন্দনে রয়েছে আশাময় আবেদন। তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে শুরু করেছে; মুসলিম বিশ্ব জুড়ে নতুন জীবন-স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে। জগত-সংসারের প্রতি বিরাগের সমর্থনহীন পরকালপ্রবণতা সাধারণ মানুষ সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। মানুষের সাধারণ জীবন যাত্রার পথ থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন। কেন? তা অনেক সময় তাঁর চতুষ্পার্শ্বের মানুষকে হতবুদ্ধি করেছে। কিন্তু তিনি সংসার বিরাগী, বিজন-কামী 'সাধু' ছিলেন না। জীবনকালে তিনি একাধারে রাজপুরুষ এবং দীন প্রজাবর্গের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। অবশেষে যখন শেষ ঘন্টাধ্বনি ধ্বনিত হলো, তখন লাহোরবাসী তাঁর প্রতি তাদের গভীরতম শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ

ইসলামের আত্মার শক্তির প্রতিবিম্বরূপ বাদশাহী মসজিদের পাদদেশে তাঁর শেষ বিশ্রামস্থল নির্বাচন করলো। এর চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না।

যা অস্থায়ী, যা বিলুপ্ত হবার-তা বিলুপ্ত হবে। তাঁর নশ্বর দেহাবশেষের ওপর তৃণ গজাবে। যা মরণশীল তা মরণের কোলে ঢলে পড়বে। কিন্তু সব কিছু ছাড়িয়ে তাঁর মরণজয়ী খ্যাতি চিরন্তন সূর্যকিরণে পুষ্পিত হয়ে দেখা দেবে। জাতীয়তার শক্তিমান দ্যোতনা তাঁর সুরে ছিল; কিন্তু শেষ মূল্যায়নে তাঁর স্থান জগতের শ্রেষ্ঠতম মনীষীদের সাথেই থাকবে। আজকে তাঁর স্মরণক্ষণে প্রার্থনাবাক্যের সাথে সাথে আমরা মৃত্যুকে সম্বোধন করে বলতে পারি ঃ

ফুলদানিটি তুমি ভাঙ্গতে পারো, চূর্ণ করতে পারো–
যা তোমার ইচ্ছা!
কিন্তু তাকে ঘিরে যে গোলাব সুবাস বিরাজ করছে
তার কাছে তুমি হার মেনেছ!

ঢাকায় ইকবাল দিবস পালন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইম্যারিটাস্ প্রফেসর ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন–

১

আল্লামা মুহম্মদ ইকবাল কেবল চিন্তাবীর দার্শনিক কবি ছিলেন না। অধিকন্তু তিনি ছিলেন একজন কর্মবীর। তাঁর কথায় ঃ

গতি হ'তে জগতের জীবন,
এ-ই এর প্রাচীন রীতি।
এ পথে স্থিতি অসঙ্গত,
স্থিতিতে মৃত্যু লুক্কায়িত।
চলনশীল নিষ্কৃতি পেয়েছে,
যে একটা থেমেছে সে-ই বিধ্বস্ত হয়েছে।

যাঁর বাণী ছিল গতিবাদের প্রশস্তিতে, তিনি কর্মবীর না হয়ে থাকতে পারেন না। তিনি ছাত্র-জীবনে কর্তব্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। তিনি ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে প্রতি বছর পরীক্ষায় প্রথম থাকতেন। প্রাইমারী ও মধ্য (Middle) পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পান। এন্ট্র্যান্স পরিক্ষাতেও তিনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হয়ে সরকারী বৃত্তি পান। বি.এ পরীক্ষায় তিনি ফারসী ও ইংরেজীতে প্রথমস্থান অধিকার করে দু'টি স্বর্ণপদক লাভ করেন। এর দু'বছর পরে ১৮৯৯ সালে তিনি দর্শনশাস্ত্রে এম.এ পাস করে স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত হন।

এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে তিনি লাহোরের ওরিএন্টাল কলেজে ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রের সহকারী অধ্যাপক পদ লাভ করেন।

অধ্যাপক জীবনে তাঁর জ্ঞান পিপাসা আরও বেড়ে গেল। তিনি উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিলাত যাত্রা করেন। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হয়ে যথাসময়ে দর্শনশাস্ত্রে এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু এতে তাঁর জ্ঞান পিপাসা নিবৃত্ত হলো না। তিনি জার্মানীর মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি লাভ করলেন।

অনেকে চাকরিজীবনে আরামপ্রিয় হয়ে যায়। কিন্তু ইকবাল ছিলেন অন্য ধারার লোক। তাঁর অধ্যাপক জীবন ছিল এক তাপসের জীবন। তাঁর শোবার ঘরে একটি বড় টেবিলের উপর বইয়ের কাঁড়ি থাকত। সেই সঙ্গে খাতা ও পেনসিল থাকত। যেভাব মনে উঠ্ত তিনি অমনি তা লিখে ফেলতেন। এই সময় তাঁর দৈনিক কার্যের রুটিনে আমরা তাঁর কর্মময় জীবনের পরিচয় পাই। তিনি ফজরে উঠে নামায পড়তেন। নামাযের শেষে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তারপর কিছুক্ষণ বুক ডন করতেন বা মুগুরু ভাঁজতেন। অনেক সময় গভীর রাতে উঠে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। একবার তিনি ক্রমাগত দু'মাস তাহাজ্জুদের নামায পড়েছিলেন।

পরে তিনি অধ্যাপকের পদে ইস্তফা দিয়ে ব্যারিস্টারিতে রত হন। তিনি তখন ৫০০ টাকা বেতন পেতেন। কেউ তাঁকে চাকরি ত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ

'আমার স্বজাতিকে দিবার জন্যে আমার বিশেষ বাণী রয়েছে। সরকারী চাকরিতে থাকলে আমি তা দিতে সক্ষম হই না, এ জন্য চাকরি ছেড়েছি।'

অধ্যাপক জীবনে এবং ব্যারিস্টারির সময়ে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কাজে কখনই আটকে থাকতে পারেন নি। তাঁর কবিতা রচনায় এবং পুস্তক প্রণয়নে আমরা তাঁর কর্মমুখর জীবনের পরিচয় পাই। যে বছর তিনি এম.এ পাস করেন, সেই বছর লাহোরের আঞ্জুমন-ই-হিমায়ত-ই-ইসলামের বার্ষিক সভায় তাঁর সর্বপ্রথম কবিতা 'নালা-এয়াতীম' (অনাথের আর্তনাদ) পাঠ করেন; মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য সেবা অক্ষুণ্ণ ছিল। অনেক জ্ঞানী তাঁদের জ্ঞান সাধনায় জীবন পাত করেন। তাঁরা গ্রন্থরচনায় বিমুখ থাকেন। কিন্তু কর্মবীর ইকবাল অনেকগুলো অমূল্য গ্রন্থ রচনা করে পৃথিবীকে জ্ঞান সমৃদ্ধ করে গেছেন। তিনি অধ্যাপক জীবনে অর্থনীতি বিজ্ঞান (Economics) সম্বন্ধে সর্বপ্রথম উর্দু পুস্তক রচনা করেন। তাঁর ডক্টরেটের থিসিস Development of Metaphysics in Persia তাঁকে বিদ্বৎসমাজের নিকট পরিচিত করে। উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজীতে রচিত তাঁর গ্রন্থাবলী সর্বজন পরিচিত।

আল্লামা ইকবালের কর্মময় জীবন কেবল সাহিত্য সেবায় ব্যয়িত হয়নি। তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির সেবার জন্য ১৯২৬ সালে পাঞ্জাবের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদ অধিকার করেন। তিনি ১৯২৭ সালে Simon Commision-এর সমক্ষে সাক্ষ্যদান করেন, যদিও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই কমিশন বয়কট করেছিল।

তিনি ১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর All India Muslim League-এর এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর ভাষণে যা বলেন, তাতে ভবিষ্যতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সূচনা করে। তিনি বলেছিলেন ঃ

'আমি দেখতে চাই পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান সম্মিলিত হয়ে যেন এক রাষ্ট্র গঠিত হয়। ভারত সাম্রাজ্যের ভিতরে বা বাহিরে স্বায়ত্তশাসিত একটি সম্মিলিত উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র সংগঠন আমার কাছে মুসলমানদের শেষ ভাগ্য বলে মনে হয়, অন্ততঃপক্ষে উত্তর-পশ্চিম ভারতবাসীর জন্যে।'

তিনি ১৯৩১ ও ৩২ সালে লন্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। তিনি তাতে যথাশক্তি মুসলিম ভারতের দাবী-দাওয়া পেশ করেন। ইকবাল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের সহিত সম্মানজনক মীমাংসার জন্যে চেষ্টা করেন। কিন্তু কতক হিন্দু ও শিখ সদস্যের একগুঁয়েমিতে তাঁর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু তদানীন্তন ভারতের শাসনতন্ত্রে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের জন্যে পৃথক নির্বাচন ও স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ইকবালের প্রচেষ্টায় গোলটেবিল বৈঠকে সিদ্ধান্ত লওয়া হয়।

ফিরবার পথে তিনি ফ্রান্স, স্পেন, ইতালি, মিসর ও ফিলিস্তিন ঘুরে আসেন। ফিলিস্তিনে তিনি এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনেও যোগদান করেন।

১৯৩৪ সালে তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন।

১৯৩৮ সালের ২৩শে মার্চ তিনি রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। ২১ এপ্রিল তিনি অমরধামে গমন করেন। এইরূপে কর্মবীর ইকবালের জীবন অবসান হয়। কিন্তু 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'; তাই তিনি চিরজীবী। হাফিয বলেন-

হরগিয নমীরদ আঁ কি দিলশ জিন্দাহ্ শুদ বইশ্ক
সুব্‌ত-স্ত বর জরীদা-ই-আলম দওয়ামে মা।
'-হিয়াটি যার প্রেমজীবিত মরণ নাইক তাহার,
ভবের খাতায় অমর কোঠায় দেখ লেখা মোদের'।

ইকবালের হৃদয় আল্লাহ, রসূল, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল, তাই তিনি অমর।

২

দৈবের উপর নির্ভর না করে নতুন সৃষ্টির জন্যে যথাসাধ্য পুরস্কার অবলম্বন করতে ইকবাল উৎসাহ দান করেছেন ঃ

'নিজের দুনিয়া তুমি নিজে সৃষ্টি কর, যদি তুমি জীবিতের মধ্যে হও।
আদমের গুপ্ত তত্ত্ব হচ্ছে মন, জীবন হচ্ছে সৃজনকারী।'

তিনি আরও বলেন ঃ

'উঠ! নতুন পৃথিবীর স্রষ্টা হও,
বুকের মাঝে আগুন লও,
ইব্রাহীমের মত বিখ্যাত হও।
অশুভ পৃথিবীর সঙ্গে সন্ধি করা
যুদ্ধক্ষেত্রে ঢাল ফেলে দেবার সমান।
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি যে নিজ কাজে পরিপক্ব,
কাল তার ভাবগতিকের সঙ্গে সন্ধি করে।

অন্যত্র ঃ

'জীবনের অর্থ সৃজনক্ষমতা,
জিগিসাই জীবনের মূল।'

ইকবালের মতে, বিপদ বরণের নামই হচ্ছে জীবন ঃ

'জীবন্ত হৃদয়বানদের ধর্মমত এই যে বিপদবরণই জীবন। আমি কা'বার পথে যাত্রা করি নাই, কেননা পথে কোনও বিপদ নাই।'

তিনি দৃঢ় মনুষ্যত্ব লাভের উপদেশ দিচ্ছেন, আর সেই সঙ্গে দরদী মন সৃষ্টি করতে বলছেন-

'এক মুঠো ধুলো থেকে একটি দেহ সৃষ্টি করে-
এমন একটি দেহ যা পাহাড়ের কেল্লার চেয়েও দৃঢ়।
তার মধ্যে সৃষ্টি কর একটি দরদী দিল্
যেন পাহাড়ের প্রান্তে একটি প্রস্রবণ।'

তিনি আপনভোলা মানুষকে তার তেজ দেখাতে বলছেন ঃ

তুমি এক তলোয়ার, নিজের খাপ থেকে বাইরে এস,
বাইরে এস, নিজের খাপ থেকে বাইরে এস।
নিজের সম্ভাবনা থেকে নেকাব সরিয়ে ফেল।
চাঁদ, সূর্য আর তারা সকলকে ঘিরে ফেল।'

তিনি পৃথিবীর নেতৃত্বলাভের কর্মপন্থা বাত্লাচ্ছেন ঃ

'পড় আবার সত্যের, ন্যায়ের, বীরত্বের পাঠ,
তবেই তোমার দ্বারা পৃথিবীর নেতৃত্বের কাজ নেওয়া হবে।'

আদর্শ কর্মী পুরুষকে আল্লামা ইকবাল বান্দা-ই-মু'মিন বলেছেন। তার পরিচয়ে তিনি বলেন ঃ

'আল্লাহ্‌র হাত মু'মিন বান্দার হাত
শক্তিশালী, কর্মস্রষ্টা, কর্মপ্রসারী, কর্মকারী,
পার্থিব কিন্তু স্বর্গীয় স্বভাব দাস কিন্তু প্রভুর গুণান্বিত।
ইহ পরলোকের অভাব রহিত তরু হৃদয় নিরুদ্বেগ;
তার আশা অল্প, তার লক্ষ্য মহৎ,
কথোপকথন মৃদু, অনুসন্ধান তীব্র,
কি যুদ্ধে, কি বন্ধুসভায় পবিত্র হৃদয়, পবিত্র কর্ম।'

আল্লামা ইকবালের কর্মবাদ তাঁর মুনাজাতে জাজ্বল্যমান ঃ

য়া রব! দিলে মুসলিম কো ওহ্ যিন্দহ্ তমন্না দে,
জো ক্বল্‌ব কো গরমা দে, জো রুহ কো তড়পা দে।
ফির ইস্ ওআদী-এ ফারাঁ কে হর যররে কো চমকা দে,
ফির শওকে তমাশা দে, ফির যওকে তকাযা দে।
মহরূমে তমাশা কো ফির দীদা-এ বীনা দে,
দেখা হায় জো কুছ মাঁয়নে অওরোঁ কো ভী দেখ্‌লা দে।
ভট্‌কে হূএ আহূঁ কো ফির সূএ হরম লে চল,
ইস শাহর কে খুগর কো ওআস'আতে সাহরা দে।
পয়দা দিলে বীরাঁ মেঁ ফির শোরিশে মহ্শর কর,
ইস দওর কী যুল্‌মত মেঁ হর কল্‌বে পরেশাঁ কো
ওহ দাগে মুহব্বত দে, জো চাঁদকো শরমা দে।
রফ্অত মে মকসদ কো হমদোশে সুরয়ান্ কর্,
খোদ্দারী এ সাহিল দে, আযাদী এ দর্‌য়া দে।
বে-লওস মুহব্বত হো, বে-বাক সদাকত হো,

সীনোঁ মেঁ উজালা কর দিল, সূরতে মীনা দে।
ইহ্‌সান ইনায়ৎ কর আসরে মূসীবৎ কা,
ইম্‌রোজ কী শোরিশ মেঁ আন্দিশাএ ফরদা দে।
মঁয় বুলবুলে নালাঁ হূঁ এক উজ্‌ড়ে গুলিস্তাঁ কা,
তাসীর কা সাইল হূঁ, মুহ্‌তাজ কো দাতা দে।

আমার অনুবাদ–

'দাও গো খুদা! মুসলিম হৃদে সজীব ইচ্ছা জাগিয়ে দাও,
কর চিত্ত তপ্ত তাতে, মৃত আত্মা চেতিয়ে দাও।
ফারানের ফের প্রতি কণা আলোর তেজে চমকে দাও,
দাও তারে ফের কৌতূহলটি, সন্ধান-স্বাদ চাখিয়ে দাও।
বঞ্চিতেরে কৌতুক দেখা দু'চক্ষু ফের পাইয়ে দাও,
দেখেছি যা কিছু আমি অন্যেরে তা দেখিয়ে দাও।
ফিরিয়ে আন পথভোলা ফের হরিণেরে কাবার দিক,
শহরের এই 'বড়'দেরে সাহারার ফের বিস্তার দাও।
সৃষ্টি কর প্রতি হৃদে প্রলয়ের ফের ভীম নিনাদ,
শূন্য উটের হাওদা পরে লায়লীকে ফের বসিয়ে দাও।
নব্য যুগের অন্ধকারে প্রতি ব্যাকুল হিয়াটিরে,
চাঁদকে হারায় এমন প্রেমের কলঙ্কেতে দাগিয়ে দাও।
তাদের যেন উচ্চ লক্ষ্য ধ্রুবতারা ছাড়িয়ে যাও,
তটভূমির স্বনিয়ন্ত্রণে সমুদ্রের স্বাধীনতা দাও।
প্রেম যেন হয় কলুষবিহীন, সত্য যেন হয় নির্ভয়,
বক্ষে হিয়া উজল করে মীনা পাত্র বানিয়ে দাও।
বিপৎপাতের পিছু পিছু আত্মচেতন করো প্রদান,
আজকের সব গন্ডগোলে কালকের চিন্তা মিলিয়ে দাও।
শূন্য গোলাপবাগের আমি বিলাপকারী এক বুলবুলি,
সফলতা যাচ্ঞাকারী ভিখারীকে হে দাতা, দাও!'

এই উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে ঢাকা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন–

পাকিস্তানের জাতীয় কবি ইকবাল দু'হাত ভরে আমাদেরকে দান করেছেন, আর আমরা অন্তর দিয়ে তাই গ্রহণ করছি; জীবনের এমন একটি দিনও তো যায় না, যেদিন এ কথাটা মনে পড়ে না। কৃতজ্ঞতার সাথে মনে করব তাঁর মহান ভাবধারা ও আদর্শ অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল আমাদের কর্ম ও চিন্তাকে প্রভাবান্বিত করেছে এবং অনাগত ভবিষ্যতেও যুগে যুগে করবে।

স্বর্গের ইকবাল মর্তে এসেছিলেন এখানকার মানুষের প্রতি তাঁর মনের সুগভীর প্রীতি, প্রাণের অসীম ভালবাসা ও হৃদয়ের অফুরন্ত কল্যাণ ঢেলে দিতে। একমাত্র নীল আকাশের বিশালতার সাথেই তাঁর হৃদয়ের পরিব্যাপ্তি ও উদারতার তুলনা চলে। আল্লাহ্‌র রহমতের ধারা বয়ে নিয়েই তিনি আমাদের মাঝে এসেছিলেন এই মাটির পৃথিবীতে, জাতির ললাটে এঁকে দিলেন চির গৌরবোজ্জ্বল এমন এক অক্ষয় টিকা যা কোন কালেই মুছবার নয়। তাঁর এ দানের কথা ভুলবার নয়।

এই উপমহাদেশের সম্বিৎহারা মুসলমান তার অতীতকে ভুলে গিয়েছিল; তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নানা লাঞ্ছনায় চাপা পড়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মুসলমান যখন সবেমাত্র আত্মোপলব্ধি করতে শুরু করেছে, সেই সময় কবি ইকবাল পঞ্চনদের তীরে সিংহনাদে আবির্ভূত হলেন মস্তকে তাঁর দিব্য-জ্যোতির বলয়, কণ্ঠে নবজাগরণের গান, হৃদয়ে আল্লাহ্‌র পবিত্র কোরআন এবং মুখে দুস্থ ও ব্যথিতের সান্ত্বনার বাণী।

কবির পিতা শেখ নূর মুহাম্মদ তাঁর পুত্রের জন্মের আভাস আগেই পেয়েছিলেন। তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে, নীল আকাশ থেকে ছুটে এসে এক কপোত তাঁর কোল জুড়ে বসল। স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। শান্তি ও সৌন্দর্যের প্রতীক কপোতের মতই পিতৃগৃহ আলো করে কবি এলেন পৃথিবীর সংশয়, বিক্ষোভ ও অশান্তি জর্জর মানুষকে শান্তি, সত্য ও ন্যায়পথের সন্ধান দিতে।

ইকবালের কবি প্রতিভা অতি অল্প বয়সেই তাঁর ওস্তাদ মৌলভী মীর হাসানের যত্নে ও শিক্ষায় সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং পরে খ্যাতনামা অধ্যাপক আর্নলডের উৎসাহে তিনি তাঁর সাধনায় এগিয়ে চলেন পরম আগ্রহে। বলা বাহুল্য, এই দুই শিক্ষকের প্রভাবেই কবি ইকবালের মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির এক অদ্ভুত মিলন ঘটে। আজ আমরা তাঁর যে ভুবনমোহিনী প্রতিভার রূপ দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত, তা তাঁর এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষার যুগল মিলনের রূপ।

প্রাচ্য সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত ও নানা সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ তাঁকে নিরন্তর উৎসারিত করে এবং পাশ্চাত্যের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য তাঁর হৃদয়ে স্থান লাভ করে। তিনি বলেন যে, পাশ্চাত্যের জ্ঞানী ও গুণীজনের সংসর্গ তাঁর হৃদয়কে উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু তাই বলে, যেখানে তাঁর নিজের স্বচ্ছ বুদ্ধি এবং মনীষা তাঁকে বিভিন্ন মত ও পথের সন্ধান দিয়েছে, অকাতরে সে কথা বলতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হননি।

এক সময়ে মনে করা হোত যে, যাঁরা ছন্দ রচনা করেন, তাঁরা এক বিশেষ জগতের মানুষ। কিন্তু ইকবালের কবি-প্রতিভা তাঁকে মানুষের কর্মজীবন থেকে সরিয়ে নেবার প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার সাথে সাথে চলল তাঁর মনের ভাবধারাকে ভাষা ও ছন্দের মধ্যে ধরে রাখার সাধনা। ইকবালের বিভিন্নমুখী প্রতিভা সারা বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, সাহিত্যিক, অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ ও আইনজ্ঞ, কিন্তু সবার উপরে তিনি ছিলেন নির্ভীক সত্যদ্রষ্টা কবি।

ইকবালের সাধনার দৃঢ়তার খবর পাওয়া যায়, তাঁর হঠাৎ ফারসী কবিতা লেখা থেকে। লন্ডনে এক সাহিত্য সভায় তাঁকে প্রশ্ন করা হয় তিনি ফারসীতে কবিতা লেখেন কি-না। তখন পর্যন্ত দু'একটি ছাড়া তাঁর সব কবিতারই ভাষা ছিল উর্দূ। কিন্তু এই প্রশ্নে তাঁর মনে ফারসীতে কবিতা লেখার বাসনা জাগে এবং দৃঢ়চিত্ত ইকবাল তাঁর ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার সাধনায় নিমগ্ন হন। অল্পদিনের মধ্যেই ভাব ও ভাষায় ঐশ্বর্যমন্ডিত কতকগুলো শক্তিশালী কবিতা রচিত হয় এবং রসপিপাসু মানুষের অভিনন্দন লাভ করে। তাঁর অনেক বিশ্ব-বিখ্যাত কবিতা ফারসী ভাষায় লিখিত।

লন্ডনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার কাজ শেষ করে দেশে ফিরে এসে নবোৎসাহে তিনি সাধনায় নিমগ্ন হলেন। বছর তিনেক পরেই তাঁর সর্বজনপ্রিয় খন্ডকাব্য *'শিকওয়া'* প্রকাশিত হল। পরে তাঁর *'জওয়াব-ই-শিকওয়া'*-ও রচিত হল। বিস্মিত মানুষ দেখল, কবি তাঁর স্রষ্টার মাঝে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলীন করে দিয়েছেন এবং তাঁদের মাঝে এমন এক গভীর নৈকট্য স্থাপিত হয়েছে যে, তাঁর মনের কথা তিনি অকপটে বলতে পেরেছেন। যাঁরা এই কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করতে পারেননি, তাঁরাই সেদিন তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপ্রীতিকর সমালোচনার অবতারণা করেছিলেন। কবি সমাজে বাস করেন, তাই আমার মনে হয় সমাজের একটা ক্ষুদ্র অংশের মনেও অপ্রয়োজনে আঘাত দিতে তাঁর মন সায় দেয়নি এবং সেই কারণেই তাদের সন্তুষ্টির জন্য *'জওয়াব-ই-শিকওয়া'* রচিত হয়েছে। *'শিকওয়া'* পাঠ করলেই বোঝা যায়, কবির মন সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রেমে কত গভীরভাবে পূর্ণ। যাঁর সাথে কোনো সম্বন্ধ নেই, তাঁর প্রতি কোনো অভিযোগও থাকে না। তাঁর অসঙ্গত ব্যবহারকে অনায়াসেই উপেক্ষা করা চলে। কিন্তু ভালবাসা যেখানে মনের গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করে এক অনির্বচনীয় প্রেমে হৃদয় পূর্ণ করে দেয়, সেখানেই ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত অভিযোগ। এই অভিযোগের মধ্যে যে অভিমান প্রকাশ পেয়েছে তা দেখে অনায়াসে বলা চলে, অভিযোগকারী একেবারে অভিযুক্তের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছেন। তৌহীদের শক্তিশালী বাণী যাঁর হৃদয়কে পূর্ণ করে রেখেছে, তাঁর লেখনী থেকেই এমন রচনা সম্ভব।

দরদী ইকবাল নিজেকে কখনও ভাববিলাসে নিমগ্ন রেখে তৃপ্ত হননি। ত্রিপোলী ও বলকান যুদ্ধের সময় তাঁর সহানুভূতিশীল মন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে এবং মুসলমান সমাজে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তাতে *'জওয়াব ই-শিকওয়া'*র বিক্রয়লব্ধ অর্থ দান করে তিনি মুসলমানদের প্রতি তাঁর সক্রিয় সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তিনি এমন কোনো বিত্তশালী লোক ছিলেন না, তাঁর পক্ষে এই দান খুব সহজও ছিল না; কিন্তু নিপীড়িত মানুষের বেদনায় চঞ্চল কবির মনে পার্থিব হিসাবের স্থান ছিল না। তা যদি থাকত তবে অধ্যাপনার

চাকরিটিও তিনি অত সহজে ত্যাগ করতে পারতেন না। তাঁর অন্তরের বাণীকে দেশের কাছে পৌছে দেওয়াই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। পার্থিব ধনের প্রতি লোভ তাঁকে কখনও স্পর্শ করেনি।

রাজনৈতিক জীবনে ইকবাল ছিলেন দেশাত্মবোধের একটা জীবন্ত নিদর্শন। দেশের পরাধীনতা এবং জাতীয় দীনতা তাঁকে নিরন্তর আঘাত করেছে। তাঁর শক্তিশালী লেখনী ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার বিরামহীন সাধনায় পরিচালিত হয়েছে। মানুষের বেদনায় মন যতই বিহ্বল হয়েছে, ততই তাঁর ব্যথাপ্লুত সুর মানুষের অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করেছে। মানুষ ইকবাল ছিলেন প্রেম ও করুণায় বিগলিতপ্রাণ। প্রতি দিনের নানা কর্মপ্রবাহের মধ্যে তাঁর অসাধারণ সৌজন্য, সুরুচি, নম্রতা ও ধীরতা তাঁর অভিজাত মনের পরিচয় বহন করে। না না ঘটনার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর মনের প্রসারতা ও দৃষ্টির গভীরতা। তাঁর প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যবোধ ফুটে বেরিয়েছিল তাঁর প্রতিভাদীপ্ত ললাটে। তাঁর বিশ্ববিখ্যাত আন্তর্জাতিকতার উৎস ছিল এই মনের ঔদার্য ও হৃদয়ের আত্মীয়তা।

কবি ইকবাল ধ্যাননেত্রে কল্পনা করেছিলেন এই উপমহাদেশের বুকে এক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের ও শক্তিমান মুসলিম জাতির। তাঁর এই কল্পনায় কোনো কলঙ্ক ছিল না, কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল না, আর ছিল না আত্মপ্রভুত্ব বিস্তারের স্বপ্ন-বিলাস। ছিল তাঁর স্রষ্টার নিকট এক ঈমানদার মুসলমানের নিষ্কলুষ অন্তরের ব্যাকুল আকুতি। ঈমানদার মুসলমানের প্রার্থনা কখনো ব্যর্থ হয় না। তাঁর কল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলো পাকিস্তান বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নিল, চির অক্ষয় ও অব্যয় হয়ে।

আঠারো বছর আগে সিন্ধুর সাগরসৈকতে কায়েদে আযম যে-দিন অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা উত্তোলন করেন, সেই গৌরবময় দিনটির মহিম্ময়মূর্তি দেখতে পেয়েছি আমাদের ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বরের ঐতিহাসিক বিজয়ের মধ্যে। ইকবাল তাঁর ধ্যানলোকে যে মহান জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন, তারই সাহসী নওজওয়ানেরা ঈমান, একতা ও শৃঙ্খলার বলে বলীয়ান হয়ে পররাজ্যলোভী হিন্দুস্তানের অতর্কিত আক্রমণকে পর্যুদস্ত করে প্রাণের চেয়েও প্রিয় পাকিস্তানকে রক্ষা করে উদ্যম ও চরিত্র বলে বলীয়ান এক অসীম সাহসী জাতির পরিচয় দিয়েছে। যে জাতীয় সংহতি এবং জাতীয় ঐক্য ইকবালের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, তার সার্বিক এবং সার্থক রূপায়ণ আজ হয়েছে, এ কথা আনন্দের সাথে, কৃতজ্ঞতার সাথে, গর্বের সাথে বলব। এক সুরে, এক মন্ত্রে, একই আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত দশ কোটি মানুষের এক মহান জাতির জন্যে ইতিহাসে রচিত হয়েছে এক চির গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী। বিপদের দিনে শত্রুর আক্রমণের মুখে পাকিস্তানে যে অপূর্ব জাতীয় সংহতি দেখা দিয়েছে, বিশ্ববাসী তাতে মুগ্ধ। এই জাতীয় সংহতি এবং ঐক্য আমাদের প্রাণের চেয়েও মূল্যবান সম্পদ, এই কথা যেন আমরা চিরদিন স্মরণ রাখি এবং এই গৌরবগাঁথা যেন আমরা কখনও ম্লান হতে না দিই। তা হলেই ইকবালের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হবে। ইকবালের জন্মভূমি সিয়ালকোট আক্রমণের মধ্য দিয়ে জাতি কবির অন্তর্বাণীকে নতুন করে অনুভব করুক এবং কবির উপলব্ধ সত্যকে নতুন করে জাতি অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিক-বোধ হয় এই ছিল সর্বনিয়ন্তা আল্লাহর ইচ্ছা। তাঁর সেই ইচ্ছা

পূর্ণ হয়েছে- দুর্যোগ ভরা রাতের অবসানে পাক সরজমিনে এক গৌরবোজ্জ্বল রবির উদয় হয়েছে, পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবালের মহাস্বপ্ন সফল হতে চলেছে।

এই প্রসঙ্গে আমি ইকবাল একাডেমীর দায়িত্বের কথা, বিশেষ করে এ প্রতিষ্ঠানের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার বিশেষ দায়িত্বের কথা স্মরণ করছি। ইকবাল একাডেমীর দায়িত্ব যেমন অসীম, এর পূর্বাঞ্চলীয় শাখার দায়িত্বও তেমন কঠোর ও কঠিন। দেশের জনসাধারণকে ইকবালের মহৎ কাব্যের সাথে নানাভাবে পরিচিত করে তোলাই যে এই প্রতিষ্ঠানের প্রধানতম উদ্দেশ্য- তাতে কোন সন্দেহ নেই। পূর্ব পাকিস্তানের (সাবেক) বাংলা ভাষাভাষীরা তাঁর মূল কাব্য না পড়তে পারলেও তাদের সাথে কবি ইকবালের নিবিড় পরি য় ঘটানোর ব্যবস্থা ইকবাল একাডেমীক্লেই করতে হবে। তাঁর সকল কবিতা, কাব্য ও গ্রন্থের সহজ ও সার্থক অনুবাদের মাধ্যমেই এটা সম্ভব হতে পারে। ইকবাল একাডেমী থেকে তাঁর গ্রন্থের সমস্ত সংস্করণ যাতে সহজেই ও সুলভ মূল্যে জনসাধারণ পেতে পারে, তার ব্যবস্থা করার ভারও নিতে হবে। ইকবাল কাব্যের তত্ত্বকথা পর্যালোচনা ও সমালোচনা প্রভৃতির বাংলায় প্রচার করাও একান্ত আবশ্যক। একাডেমীতে কবির নানা বয়সের প্রতিমূর্তি এবং তাঁর হাতের লেখা চিঠিপত্র এবং নানা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষিত হওয়া উচিত। এদিকেও ইকবাল একাডেমীর এই শাখার আশু দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। পৃথিবীর যত ভাষায় ইকবালের কাব্য ও গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে, ইকবাল একাডেমীর যাদুঘরে সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ তারও একটা বিশেষ সংগ্রহ সংরক্ষিত থাকা প্রয়োজন। এ কাজও একাডেমীকেই করতে হবে। এ সমস্ত অভাব যত শীঘ্র সম্ভব দূর কতে হবে এবং জাতি ইকবাল একাডেমীর কাছ থেকেই এ সমস্ত গঠনমূলক কাজ আশা করে থাকে।

পরিশেষে বার বার মনে হচ্ছে, ইসলামের চিরন্তন বাণী যখন আমাদের দেশে নানা কারণে তার সঞ্জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলতে থাকে, তখন সে বাণী কবি ইকবালের মুখে লাভ করেছে নতুন রূপ, নবীন প্রেরণা ও অভিনব শক্তি। আমরা তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রবুদ্ধ হয়েছি, জীবনপথে এগিয়ে চলার পাথেয় খুঁজে পেয়েছি। ইকবালের সংস্পর্শে জাতির প্রাণে জেগেছে তাযা-বতাযার গান; তাঁরই আদর্শ জাতিকে করেছে সুসংযত ও সুসংহত, শোভন, সুন্দর ও লোভন। জাতীয় কবি ইকবালকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করি ও হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে তাঁকে আপন মনে বরণ করি।

এই উপলক্ষে ঢাকা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি আবদুল মওদূদ তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে (৩-৬-৬৭) বলেন–

পাকিস্তানের দুই রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও উর্দুর দুই জাতীয় কবি নজরুল-ইকবাল উভয় অংশেরই জনগণ চিত্তে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। প্রায় তিন দশক অতিক্রান্ত হলো, ইকবাল আমাদের মধ্য থেকে অনন্তে মিশে গেছে। আর প্রায় পাঁচিশ বছর হলো, নজরুলের কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁদের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তির বিষয়ে লেখনী চালনা পাকিস্তানের উভয় অংশেই আজ জাতীয় শিল্পের রূপগ্রহণ করেছে। জাতীয় জীবন পরিক্রমায় এ একটি সুস্থ লক্ষণ, সন্দেহ নেই।

ইকবালের আবির্ভাব এক যুগ সন্ধিক্ষণ–একদিকে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ, শিল্পবিপ্লব ও বস্তুবাদী ভাবধারার প্রাচ্যের উপর সবল আক্রমণ উদ্যত, অন্যদিকে প্রাচ্য সভ্যতার সন্তর্বিচ্ছিন্নতা, অনৈক্য ও নির্জীবন। একদিকে সামন্তযুগ নিঃশেষিত প্রায়, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক যুগের বলিষ্ঠ আগমনী। ইকবালের শিক্ষা লাভেও দু'টি ধারার সঙ্গম ঘটেছিল। মশহুর আলেম মীর হাসানের প্রভাবে ইকবাল যেমন একদিকে ইসলামের অতীত ঐতিহ্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, সেই রকম টমাস আর্নল্ডের সাহচর্যে পাশ্চাত্য চিন্তাধরার মহৎ দিকটার সংগে পরিচিত। কেম্ব্রিজের তিনি মেধাবী পণ্ডিত, জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি। লন্ডন থেকে তিনি ব্যারিস্টারীও পাস করেন। তাঁর মতো চোস্ত ইংরেজী গদ্য কম পাক-ভারতীয় লিখেছেন। একজন পাক্কা মুসলিম তিনি, রোযা, নামায প্রভৃতি বাহ্যিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর একনিষ্ঠ পালনে কখনও তাঁর গাফিলতি ছিল না। কোরআন পাঠে বা শ্রবণে তাঁর আগ্রহ ছিল সমধিক এবং তাঁর চক্ষু দু'টি প্রায়ই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠতো। তিনি কোরআনের মর্মবাণীই অনুধাবন করতেন না, তার প্রতিটি শব্দের অর্থেও অকুণ্ঠ বিশ্বাসী ছিলেন। জীবন দর্শনের বিভিন্ন ধারায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইসলামী শিক্ষার দু'টি মৌল উৎস কোরআন ও হাদিসের একান্ত অনুসারী। ইকবাল নিঃসন্দেহে ইসলামের কবি, ইসলামের আধুনিকতম প্রবক্তা এবং মুসলিম জাতির পুনরুজ্জীবন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন মন্ত্রের অতি আধুনিকতম উদ্‌গাতা। সমগ্র ইকবাল সাহিত্যে ইসলামের অনুপম শিক্ষার মহিমা ও সৌন্দর্য নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মুক্তছন্দে কীর্তিত হয়েছে। এ জন্যে তাঁর চিত্তের পরিচয় স্পষ্টতর দেখতে পাই ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর আদর্শিক ছবিতে, যে আদর্শ পৃথিবীকে নতুন করে সাম্য, মৈত্রী এবং মুক্তির বিশেষ সন্ধান দেবে।

ছাত্র হিসাবে তিন বছর (১৯০৫-০৮) ইউরোপে প্রবাসকালে তিনটি বিষয় ইকবালের মানীষাদীপ্ত চিত্তে গভীর রেখাপাত করে ;

প্রথমতঃ ইউরোপবাসীর অফুরন্ত জীবনীশক্তি, অভাবনীয় কর্মক্ষমতা, সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা।

দ্বিতীয়তঃ মানব জীবনের বিপুল সম্ভাবনা যার বাস্তব সাফল্য ইউরোপীয় জীবনে অহরহ দেখা দিচ্ছে, অথচ প্রাচ্য খণ্ডের লোকের যা কল্পনারও অতীত।

তৃতীয়তঃ ইউরোপীয় এতোসব সম্ভাবনা ও সফলতার মধ্যেও হৃদয়হীন হিংসা ও রক্তক্ষয়ী শ্রেণীসংগ্রামের তীব্র বিষ থাবায় তা মানবতার প্রকৃত কল্যাণমুখী হয়নি। তাদের পতনের বীজও তার মধ্যে লুক্কায়িত আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট এবং কোরআন-হাদিসের একনিষ্ঠ অনুসারী কবি ইকবাল ইসলাম ধর্মীয় চিন্তাধারাকে নতুন রূপ দিতে চেষ্টা করলেন তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতাবলী Reconstruction of Religious Thought in Islam-এ। এসব বক্তৃতার আসল উদ্দেশ্য ছিলো আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তা-ভাবনার আলোকে ইসলামী শিক্ষাধারার নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা ও সংস্কার করা। তিনি প্রথমেই ঘোষণা করলেন যে, ইসলাম কখনও ধর্ম বা বিজ্ঞানের মধ্যে সীমারেখা টানেনি। প্রকৃত সত্য এই যে, ধর্মীয় ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বিভিন্ন পথে চালিত হলেও তাদের লক্ষ্য একই। ইকবাল ক্লাসিক্যাল ইসলামকে যুগোপযোগী ছাঁচে ঢালবার প্রকৃষ্ট হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেন ইজতিহাদকে। ইজতিহাদের নিরংকুশ অধিকারকে স্বীকার করে *'জাবিদ নামায়'* তিনি ইসলামের এই রূপই এঁকে গেছেন ঃ

নতুন পাতায় তার ব্যবস্থা ভরে যাবে,
শাশ্বত হয়ে নবনব রূপে রূপায়িত হবে,
বাহিরের পরিবর্তনে ভিতরের রূপ বদলাবে না
কেবল বাহিরটাই বারে বারে নতুন রূপ ধারণ করবে।

ইকবাল-কাব্যে সর্বমানবিকতার ব্যঞ্জনা পাই প্রধানত দু'টি কারণে–মানুষের প্রতিশ্রুতির বাস্তব জ্ঞান এবং মানুষের চিরন্তন মঙ্গলবাদ। ইসলামের মহান ভূমিকার যে পরিচয় ইকবাল দিয়েছেন তা যেমন আদর্শিক, তেমনই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে সমুজ্জ্বল। বাক্যের মাধুর্য ও ব্যঞ্জনা, রসের উচ্ছলতা এবং দিগন্তপ্রসারী কল্পনা তাঁর বহু কবিতায় যে অনুপম ভাষা পেয়েছে, তা উর্দু ও ফারসী ভাষার ধ্বনিকে অতিক্রম করে সর্বমানবের চিত্ত হরণ করে। জার্মানীর কবিগুরু গ্যেটের মতো ভাষার ব্যঞ্জনা, চিন্তা-ভাবনার উৎকর্ষ ও বাণীর মাধুর্যেই শুধু ইকবালের শ্রেষ্ঠত্ব নয়, সর্বমানবিকতার আবেদনে তাঁর কবিতা চিত্তচারী। তাছাড়া বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ও প্রেরণার উৎস অনুসন্ধানে কবিচিত্তের উদারতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। হিন্দু বেদমন্ত্র স্পর্শ করেছিলো তাঁকে, কোরআনের সংগে যেন চলেছে গীতাধ্যয়ন পরপ্রকোষ্ঠে; মন্দির, মসজিদ, শিখ, সুফী, দরবেশ, ব্রাহ্মণ, ইংরেজ, কর্দোভা, নেপোলীয়ানের সমাধি, সিসিলি, শেক্সপীয়ার, নীট্শে, গ্যেটে, লেনিন, কার্লমার্কস, আইনস্টাইন, গালিব, রাম, স্বামী রামতীর্থ ও গুরুনানক স্থান পেলো তাঁর গীতি কবিতার আসরে। এই মর্তলোকের অনুভবনীয় বিষয়েই শুধু তাঁর কণ্ঠে সংগীত বেজে উঠেনি, *'জাবিদ নামা'য়* তিনি অন্যান্য গ্রহ লোকেরও সন্ধান দিয়েছেন। তিনি উর্দু ও ফারসী দু'টি ভাষায় সমান তালে কাব্য সৃষ্টি করে গেছেন, তৃতীয় ভাষা আরবীতে কাব্য সাধনার প্রচেষ্টার সময় তাঁর কণ্ঠ নীরব হয়ে যায়।

এখানে একটি কথা বিশদ হওয়া দরকার। ইকবাল আপন চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে উর্দু ও ফারসী ভাষায় কবিতা সৃষ্টি করলেও তাঁর কবিকর্মের শ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি হয়েছে ফারসী কবিতাতেই। আর তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে, ফারসী ভাষার মধুর ধ্বনি, শব্দের স্বচ্ছন্দ নির্বাচন ও ব্যঞ্জনা এবং অলংকার, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার ঐশ্বর্য তাঁকে

স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট করেছিল ফারসীকে আপন শ্রেষ্ঠতম বাণীকর্মের ও ভাবধারার বিকাশের বাহন হিসেবে গ্রহণ করতে। আর একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ভাষার এসব প্রসাদগুণেই ফারসী প্রাচ্যের ফরাসী ভাষারূপে বিশ্বনন্দিত। ইকবাল নিজেও স্বীকার করেছেন *'আসরার-ই-খুদীতে'* যে, তিনি ফারসী ভাষাকে চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন দু'টি কারণে–ফরাসীর মধুক্ষরা সুরের জন্যে, আর ফারসীর মাধ্যমে বহির্বিশ্বে তাঁর কাব্যসুধা বিতরণের জন্যেও। এই উৎকর্ষ প্রসাদেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাক-ভারতীয় কবিগুরু হযরত আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রীঃ) ফারসী কবিতায় এতোখানি প্রাণ মাতানো ঝংকার তুলেছিলেন, যার দরুন ইরানীরাও তাঁকে *'তুতীয়ে-হিন্দ'* বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলো।

আমার দৃষ্টিতে, ইকবাল-কাব্যের মর্মবাণী হচ্ছে মানবতার জয়গান। মানুষের বিপুল সম্ভাবনায় প্রচন্ড আশা। এ জন্যে তিনি মানুষকে উদ্যোগী হতে, তাকে কর্মপাগল ও প্রাণচঞ্চল করে তুলতে নির্মম কষাঘাত করেছেন। 'তকদীর' অর্থাৎ অদৃষ্টকে মেনে যারা আত্মোসম্মোহিত, শায়িত ও নিষ্ক্রিয়, তাদেরকে তিনি দীক্ষা দিলেন 'তদবীর' অর্থাৎ কর্মে, পৌরুষমন্ত্রে। ইসলামের একটি মহৎ বৈশিষ্ট্য হলো ঃ এ মানুষকে নিছক সৃষ্টি হিসেবে দেখেনি-দেখেছে সচেতন সৃষ্টিশীল জীবন হিসেবে।

আল্লাহ্‌র অন্য শ্রেষ্ঠ তিনি 'খালেক'-স্রষ্টা, সৃষ্টি-রহস্য তাঁর শ্রেষ্ঠ বিলাস। স্রষ্টার খলিফা মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব হচ্ছে সৃষ্টি উল্লাসে। মানুষকে আল্লাহ্‌র সৃষ্টি উন্মাদনায় দীক্ষা দিচ্ছেন ঃ

তুমি কি জীবন্ত? উদ্যমী হও, সৃষ্টিধর্মী হও,
আমার মতো সারা পৃথিবী বিজয়ী হও।
তোমার যা অযোগ্য, তা দীর্ঘ-বিদীর্ণ করে ফেলো,
তোমার আপন সত্তায় নতুন জগৎ সৃষ্টি করো।
আযাদ মানুষের পক্ষে সবচেয়ে গ্লানিকর হচ্ছে
অন্যের সৃষ্ট জগতে নিশ্বাস গ্রহণ করা।
যে মানুষ সৃষ্টিক্ষম নয়–
আমার চোখে সে যিন্দিক, সে কাফের।
আমার সৌন্দর্য ভান্ডার থেকে সে তার অংশ লয় না,
প্রাণ-মহীরূহ থেকে সে খাদ্য গ্রহণ করে না।
আল্লাহ্‌র মানুষ তরবারীর মত শাণিত ও দীপ্ত হও।

তিনি মানুষকে সব রকম দুর্বলতা নিঃশেষে ঝেড়ে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ 'সব রকম দুর্বলতাই জীবনের সম্পদ লুণ্ঠন করে তার গর্ভে লুকিয়ে থাকে মিথ্যা, ভয় ও আত্মপ্রবঞ্চনা।" তারপর কবি গৌরবময়, মহিমাময়, ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্যে আত্মভোলা বিমূঢ় মানুষকে সচেতন করে বলেছেন ঃ

তোমার কাঁচা অধোগামী সত্তার জন্যই তুমি ঘৃণিত, অপমানিত,
তোমার নরম শরীর ও আরামপ্রিয়তাই তোমায় পুড়িয়ে মারছে।

মিথ্যা ভয়, দুঃখ ও সন্দেহ পরিত্যাগ করো–
পাথরের মতো কঠিন ও হীরার মতো দামী হও।
তার দ্বারাই ইহলোক-পরলোক আলোকিত হয়
যে-জন কঠোর কর্মী ও কৃচ্ছ্রসাধক হয়।
জীবনের সম্মান দৃঢ়তাতেই নিহিত
দুর্বলতাই তো অপরিপক্কতা।

০ ০ ০

বারবার নিজেকে শানের পাথরে আঘাত করো,
তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের চেয়ে তীক্ষ্ণতম পাথর হও;
দুঃখ-শোকেই মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের পরীক্ষা হয়।
শরীর প্রাণের শক্তি-সম্ভাবনা পরখ করার তো পরশপাথর।

জীবন শুধু মনস্থ ও ধ্যানস্থ হওয়ার জন্যে নয়, জীবন ভোগও করতে হবে বীর্যবানের মতো প্রগাঢ় উত্তেজনায় ঃ

জীবনের মজ্জা থাকে উদ্যমশীলতায়,
সৃষ্টিসুখের উল্লাসেই জীবনের মূলসূত্র।
উঠো! জাগো! নতুন জগত সৃষ্টি করো,
অগ্নিশিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ো– ইব্রাহিম হও।
যে জীবন তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে না, তার বশীভূত হওয়া
মানেই হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের ঢাল ফেলে দেওয়া।
দৃঢ় চরিত্র যে ব্যক্তির আত্মপ্রত্যয় আছে,
তার নিকট অদৃষ্টও নতিস্বীকার করে।
যদি এ দুনিয়াও তার ইচ্ছার প্রতিকূল হয়,
তাহলে সে পরজগতের সংগেও যুদ্ধ করতে ভয় করে না।
সে দুনিয়ার ভিত্তিমূলকে তচনচ করে ফেলে,
তার অণুকণাগুলোকে সে নতুন ছাঁচে ঢালে।
নিজেরই শক্তিমত্তায় সে গড়বে এক
নতুন জগত যা তার পক্ষে আনন্দদায়ক হবে।

'তাস্‌কির-ই-ফিত্‌রাত' বা 'প্রকৃতির বশবর্তিতা' কবিতায় ইকবাল স্বর্গ হতে মানুষের বিদায়কে পতন না বলে প্রকৃতপক্ষে 'মানুষের গৌরব আরোহণের প্রথম ধাপ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ বিকাশ লাভের জন্যে আদমের এই পতনের প্রয়োজন ছিল। সে প্রকৃতিকে আয়ত্ত করবার আকুল উন্মাদনায় পাপকে ভয় করে না; কারণ, দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাহায্যে বহু বন্ধুর পন্থা অতিক্রম করে, বহু পতন বা অভ্যুদয়ের ভিতর দিয়ে তার জীবনের পূর্ণ পরিণতি সম্ভব। কোরআনের মহৎ শিক্ষা মানুষ খলীফাতুল্লাহ, সৃষ্টিলোকে আল্লাহ্‌র

নৈকট্য লাভের দ্বারা, তাঁর মধ্যে বিলীন হওয়ায় নয়। আত্মবিনাশ না করে আত্মবিকাশের দ্বারাই 'খুদী'র বিকাশ সম্ভব এবং 'ইন্‌সানুল কামিল' তিনি, যিনি আল্লাহ্‌র নিকটতম সান্নিধ্য লাভ করেছেন। ইকবালের *'আসরার-ই-খুদী' 'রমুয-ই-বেখুদী'* জীবনদর্শনের অতি আধুনিক ভাষ্য। *'আসরার-ই-খুদী'*-তে তিনি 'প্লেটোনিক দর্শনকে অস্বীকার করেছেন, কারণ 'প্লেটো পুরাতন মেষ' দলের নেতা'–যার শিক্ষা উদ্যমশীল জীবনকে গতিশীল দর্শন থেকে শুধু চিন্তাশ্রয়ী নিষ্ক্রিয়তা ও দুঃখবাদী নির্বোধ অদৃষ্টবাদের পথে ঠেলে দেয়। ইকবালের চিন্তা-ভাবনায় নীটশে ও বার্গসঁ'র চাপ অবশ্যম্ভাবী ও অনস্বীকার্য কিন্তু সে সবে তিনি কবলিত না হয়ে বরং সে সবকে ইসলামী জারকরসে সিঞ্চিত করে সর্বমানবিকতার ব্যঞ্জনায় মন্ডিত করেছেন দু'দিকে মানুষের প্রতিশ্রুতির বাস্তব জ্ঞানে এবং মানবের চিরন্তন মঙ্গল্যবাদে।

ইসলামের যে অনুসারীর তিনি ছবি দেখেছিলেন, তার চিত্ত ভয়শূন্য, উচ্চ তার শির। কারণ ইকবালের শিক্ষায় ইসলাম আফিমখোরের ধর্ম নয়, 'জানটা বাঁচানো সার'ই পরমার্থ নয়। তিনি বলেন ঃ

ওহি নান্‌ হ্যায় উস্‌কে লিয়ে আরযমন্দ
রহে জিস্‌সে দুনিয়ামে গর্দন বুলন্দ।
–'সেই রুটিই তার নিকট কাম্য,
যার দ্বারা তার শির রয় সমুন্নত।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন ঃ

মুল্লা কো জো হ্যায় হিন্দ মেঁ সিজদে কি এজাযত
নাদান্‌ ইয়েহ্‌ সমঝতি হ্যায় কে ইসলাম হ্যায় আযাদ।
– 'যেহেতু হিন্দুস্তানে মুল্লার নামায পড়ার অনুমতি আছে,
মূর্খ ভেবে বসে আছে, ইসলামও আযাদী পেয়েছে।'

আবার যারা শোষণ করে, সর্বস্ব হরণ করে মানুষকে তার হক থেকে বঞ্চিত করছে দিনকে দিন অথচ গজদন্ত মিনারে বাস করে আল্লাহ্‌র ঘরও নির্দেশ করেছেন মর্মরশুভ্র গগনচুম্বী সৌধমালায়, তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর ফেরেশতাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আল্লামার বাণীকণ্ঠে ঃ

যাও দুনিয়ায় আমার গরীবদের জাগিয়ে দাও,
আর ধনীর বালাখানার ভিত্তি ধরে নাড়া দাও।
গোলামদের লহুতে আত্মচেতনার উত্তেজনা তোলো,
দুর্বল চড়ুইকে ঈগলের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলো।
জনগণের শাসনভার হাতে লওয়ার দিন দ্রুত এগিয়ে আসছে,
পুরাতন ইমারত যেখানে দেখবে চুরমার করে দাও।
যে ক্ষেত থেকে চাষীর রুটির সংস্থান হয় না,
তার গমের প্রত্যেকটি দানা পুড়িয়ে দাও।

একটি সিজদায়, একটি প্রদক্ষিণে আল্লাহ্ বিকিকিনি হচ্ছে।
মসজিদের ও মন্দিরের সব আলো ভালো করে নিভিয়ে দাও।
মর্মরে ভজনালয়ের উপর আমি আজ নাখোশ ও বেজার,
যাও, আমার জন্যে আরেকটি মাটির কাবা বানিয়ে দাও।

আমি এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইকবালের জীবনবাদ বনাম সর্বমানবিকতা শিক্ষা লক্ষ্য করেছি এবং আমার অক্ষম ভাষায় ও সীমিত জ্ঞানে একটা আবছায়া আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। জাতি, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এই ছিল তাঁর 'আদমিয়াৎ' অর্থাৎ মানবিকতার প্রকৃত ভাষ্য। এ মানবিকতার অমৃতলোকে ধর্ম, জাতি, বর্ণ, গোত্র; গোষ্ঠি নির্বিশেষে 'মানুষ' প্রাণী মাত্রেরই সমানাধিকার, এখানে কোনো ভেদাভেদের প্রাচীর নেই।

ইকবাল উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করেন ঃ

আদমিয়াৎ কি– মানুষেরে সম্মান করা।
মানুষের মর্যাদা সম্যক শিক্ষা করো–
একটিও কঠোর কথা বলা পাপ,
কারণ, কাফের ও মোমেন সবাই খুদার সন্তান।
০ ০ ০
হৃদয় পানি -মাটির জিন্দানে বন্দী থাকলেও
এই বিশাল বিশ্ব বিরাট হৃদয়ের সাম্রাজ্য।

এই হৃদয়বৃত্তির বিশালতায় ও উদারতায় ছিল ইকবালের অগাধ বিশ্বাস এবং এই হৃদয়কন্দরেই তিনি মানবীয় মহিমার চরম বিকাশের ক্ষেত্র খুঁজেছেন ঃ

আমার নয়ন কুফার ও বাগদাদের দিকেই নয়।
আমি দার্শনিক ও ধর্মবেত্তাকেও গণনায় আনিনে;
একজন হৃদয়কে অন্ধ করে, অন্যে দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত ও আচ্ছন্ন করে।
আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি আমি বিশাল হৃদয় চাই।

ইকবাল আশাবাদী– অতীতের সোনালী ভবিষ্যৎকে উদ্ভাসিত করাই তাঁর স্বপ্ন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য এবং মুসলিমদের তথা বিশ্বমানবের মহিমোজ্জ্বল ভবিষ্যতে তাঁর অটুট বিশ্বাস ঃ

অতীতের ইতিহাস আমার মৃত্তিকার জীবনী শক্তি;
আমার অতীতই আমার আগামীকালের ব্যাখ্যা।
অক্ষম পিপিলিকা ফুলের পাপড়ীকে করবে নৌকা,
সহস্র তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও এই কিশতী তীরে ভিড়বে।
সূর্যের দীপ্তিতে রাতের গাঢ় আঁধার কেটে যাবে,
তওহিদের গুঞ্জরণে এই বাগিচা আবার মুখরিত হবে।
প্রেম ও কর্মনিষ্ঠায় নিবেদিতপ্রাণ মুসলিমরা আবার একত্রিত হবে,
বাগিচার প্রত্যেক প্রাণী আবার ফুলগন্ধে মাতোয়ারা হবে।

ঢাকায় ইকবাল দিবস উৎসবে পাকিস্তান ট্যারিফ কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব মীযানুর রহমান এম এ বলেন -

অনেক অবাঙ্গালীর ধারণা বাংলা সাহিত্যে ইকবালের তেমন আলোচনা হয়নি। ধারণাটি নিছক অজ্ঞতা। ইকবালের প্রায় সকল পুস্তকই একাধিক লেখক কর্তৃক বাংলাতে অনুবাদিত হয়েছে। *'শিকোয়া'* ও *'জওয়াবে শিকোয়া'*র অর্ধ ডজন অনুবাদের সন্ধান আমি জানি। ১৯৫২/৫৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক পুরস্কারের জন্য একটি কমিটি হয়। আমি ছিলাম সে কিমিটির অন্যতম সভ্য। কবি আশরাফ আলী খাঁর অনুবাদ 'শিকোয়া' বাদেই পাঁচটি ছাপান অনুবাদ কমিটির সম্মুখে পেশ করা হয়। তার পরেও *'শিকোয়া'* এবং *'জওয়াবে শিকোয়া'*র আরো বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

আশরাফ (মৃত্যু ১৯৩৯) *'শিকোয়া'র* অনুবাদ করেছিলেন কবি নজরুল ইসলামের উৎসাহে। আশরাফের *'শিকোয়া'* এবং ফিটজেরাল্ডের *রুবাইয়াতে ওমর খাইয়াম* আমার মতে সমগোত্রীয় সুন্দর ভাবানুবাদ। পুনঃ প্রকাশের মুসতাহিক।

পহেলা সন্ধান

আমি নিজে ইকবাল সাহিত্যের পহেলা সন্ধান পাই ১৯১৫/১৬ সালে মাসিক *'আল-ইসলামে'* প্রকাশিত ইকবালের সুবিখ্যাত কবিতা *'তারানায়ে মিল্লী'র* বাংলা অনুবাদ পড়ে। অনুবাদকের নাম মনে পড়ছে না। *তারানায়ে মিল্লী*'র বঙ্গানুবাদ আরো অনেক করেছেন। আমিও করেছি। আমার প্রথম অনুবাদ *মাসিক মোহাম্মীতে* প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ত্রিশ বছর আগে। আমার সংশোধিত অনুবাদ পরে প্রকাশিত হয় মাহে নও এর ১ম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যায়, ১৯৫৬ সালে।

তারানায়ে মিল্লী

চীন আমাদের, আরব মোদের, মোদের হিন্দুস্তান
ওতান মোদের বিশ্ব জাহান, আমরা মুসলমান।
বক্ষে মোদের গচ্ছিত যে তওহীদি ফরমান,
নাম নিশানা মোদের বিনাশ নয় কভু আসান।

বিশ্ব বুকে সবার সেরা মোদের কাবার শান,
আমরা তাহার পাছবাঁ, সে যে মোদেরও পাছবান।
অসির ছায়ে লালন পেয়ে আমরা তরুণ প্রাণ,
হেলাল তারা অসির শানে মোদেরই নিশান।
আযান দিনু, উঠল দুলি মাগ্‌রিব ময়দানে।
রোধতে কভু পারতো না কেউ মোদের অভিযান।
বাতিল ভয়ে নইকো ভীত, জান তা আসমান।
করলে তুমি হাযার দফে মোদের ইম্‌তেহান।
স্মরণ তোমার আছে সেদিন, স্পেনের গুলিস্তান।
কাজতো যবে তোমার শাখে মোদের আশিয়ান।
চিনতে তুমি পারবে মোরে ফোরাত নদীর বান।
গাইছে আজো তোমার ধারা মোদেরই আফসান।
তোমার তরে পাক দুনিয়া। নিসার মোদের জান,
চলছে আজো মোদের শিরায় তোমার খুনের বান।
নায়ক মোদের আরব নবী, খোদার হাবীব শান,
তাঁরই নামের পাক পরশে জুড়ায় মোদের প্রাণ।
বিষাণ সম বাজছে বীণায় ইকবালের এই গান-
রণছে নতুন পয়াম পুন চলবে অভিযান।

তারানায়ে পাকিস্তান (সাবেক তারানায়ে হিন্দি)

সকল দেশের সেরা সে যে মোদের পাকিস্তান,
আমরা তাহার বুলবুলি সে মোদের গুলিস্তান।
দূর দারাজে যেথায় থাকি দিল্‌ থাকে যে পাক মাকান,
ভাবতে হবে আমরা সেথা, বিরাজ যেথা মোদের প্রাণ।
পাহাড় তাহার এমনি উঁচা স্পর্শে যে আসমান
পাছবাঁ মোদের অই যে পাহাড়, আমরাও পাছবান।
বক্ষে তাহার খেলছে সদা হাজার নদীর বান,
যার পরশে বাগান মোদের বনছে গুলিস্তান।

স্মরণ তোমার আছে সে দিন, গঙ্গা নদীর বান।
থামলো যবে তোমার তীরে মোদের অভিযান।
শিখায়নাকো ধর্ম কভু দুশমনী আরমান,
আমরা সবাই পাকিস্তানী, ওতান পাকিস্তান।
নাইকো সাবেক য়ুনান মিসর, নাইকো সে রোমান,
কিন্তু বাকী আজ অবধি মোদের নাম নিশান।
রইছে মোদের এমন কিছু মিটবে না যার শান,
চলবে যদি হাজার বছর শত্রুর অভিযান।
নাইকো ইকবাল! বিশ্ব মাঝে এমন উদার প্রাণ,
বুঝবে যেজন আমার বুকের ব্যথার করুণ গান।

বান্ছনীয়

মরহুম এস. ওয়াজেদ আলী বার এট ল কলিকাতা হতে *গুলিস্তাঁ* নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের করেছিলেন ২০/২৫ বছর আগে। ইকবালের বাণী ও চিন্তাধারার ধারাবাহিক আলোচনা ছিল গুলিস্তাঁর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বনামধন্য সাহিত্যিক ডাঃ অমিয় কুমার চক্রবর্তী সম্ভবত সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে ইকবালের দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে সুচিন্তিত কয়েকটি বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন কলিকাতার কয়েকটি কাগজে। সেও প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। বাংলা সাহিত্যিকদের আরো অনেকে ইকবাল সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ, কবিতা ও পুস্তক লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন। পূর্ব পাকিস্তান টেক্সটবুক কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত বহু পাঠ্য পুস্তকেও ইকবাল সম্পর্কিত প্রবন্ধ রয়েছে স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণের উপকারার্থে। বাংলা সহিত্যে প্রকাশিত ইকবাল সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও কবিতাসমূহ সংগ্রহ করে প্রকাশিত করলে বিরাট বপু আমীর হামযার পুথির চেয়েও বড় পুস্তক হয়ে যাবে। ইকবাল একাডেমী কর্তৃক এই গুলো সংকলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অজানা মুসাফির

ইকবাল ছিলেন দার্শনিক ও কবি। নিজেকে কবি বলে পরিচিত করতে তিনি ছিলেন নারাজ। জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে উর্দু ও ফার্সী কবিতার মাধ্যমে নিজের খিয়ালাত প্রকাশ করে গেছেন জাতির কল্যাণে। তিনি ছিলেন জীবনবাদী কবি ও দার্শনিক, চিন্তানায়ক। কাব্যিকতার খাতিরে কাব্যিকতার পায়বন্দ তিনি ছিলেন না। তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন ঃ আমার বাড়ীর আশেপাশে অনেক ঘুঘুরাই ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু তারা কি বুঝে আমি কি কহি?

মরণের আগে শেষ কবিতায়ও তিনি আফসোস করে বলেছিলেন-

চু রুখতে খাবেশ বড় বস্তম আজি খাক
হামেহ গোফতান্ বা মা আশনা বুদ
ও লেকিন কিছ্ নাদানিস্ত ইয়ে মুসাফির
চেহ্ গোফত ও মা কিহ্ গোফত ও আজ কুজা বুদ।
-ধুলার ধরণী ছেড়ে চলিনু যখন,
বললে সবাই ছিলেন তিনি মোদের আপনজন।
কিন্তু কেহ চিনেনিক এই মুসাফিরে
বললে, কি বা, কাহার কাছে,
কোথা নির্গমন।
[পথের পয়গাম, পৃঃ ১৬]

শিক্ষা ও শিক্ষক

জীবনবাদের ব্যাখ্যাই ইকবালের কাব্যিকতার আসল উদ্দেশ্য। জীবনবাদের বুনিয়াদ শিক্ষা। তাই প্রকারান্তরে শিক্ষা সম্বন্ধেও আল্লামার বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর একটি চুটকি কবিতা তুলে দিচ্ছি আধুনিক অধ্যাপক ও অধ্যয়নকারীদের উপকারার্থে ঃ

তাহ্যীব কে মরীয কু গুলি ছে ফায়দা?
দাফ্য়ে মরজ কে ওয়াস্তে পিল পেশ কিজিয়ে।
থে ওহ্ ভী দিন কে খেদমতে ওস্তাদকে এওজ
দিল্ চাহতা থা হাদীয়ায়ে দিল পেশ কিজিয়ে!
বদলা জমানা এয়সা কে লাড়কা পাছ আজ সবক
কাহতা হায় মাস্টারসে কেহ্ 'বিল' পেশ কিযিয়ে।

অনুবাদ

আধুনিক সভ্যতায় বীমরীতে গুলি খেয়ে কি লাভ? রোগের প্রতিকারের জন্য পেশ করুন পিল। এমন দিন ছিল যখন উস্তাদের খেদমতের বদলে দিল চাইত দিলের হাদিয়া পেশ করতে। আজ দিনকাল এমনি বদলে গেছে যে, পড়ার শেষে পড়ুয়া বলে - !মাস্টার সাহেব! বিল পাঠিয়ে দেবেন তনখার জন্য।"

বেদনাদায়ক

আল্লামার অভিযোগ হয়ত সত্য; অহেতুকও নয়। দিলের বদলে বিল না হোক মাঝে মাঝে কিল এবং কলরবের খবরও পাওয়া যায়। বেদনাদায়ক, সন্দেহ নেই। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলা দরকার যে, পড়ুয়াদের চেয়ে শিক্ষকগণের অবনতিও কম হয়নি।

বলতে গেলে বেশীর ভাগের পড়াশোনা নাদারাদ। সকাল বিকালে প্রাইভেট টিউশনী বা কর্তাদের দরবারে ঘুরাফিরা, বেতন বৃদ্ধি বা প্রমোশনের জন্য এবং বিকেলে ক্লাবে বসে তাস খেলা বা আড্ডা। যে শিক্ষকগণ দিল দিয়ে মেহনৎ করে পড়ান তাঁরা বোধ হয় আজও বিল, কিল বা কোলাহলের বদলে দিলই হাদিয়া পেয়ে থাকেন। কেবল তরুণ-তরুণীদিগকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ হয়ত তাদেরও রয়েছে, তবে ময় মুরব্বী এবং শিক্ষকের দোষ এবং দায়িত্বও কম নয়। অভিভাবকগণের ঔদাসীন্যও বেদনাদায়ক এবং সমালোচনার মুস্তাহিক।

যুগপরিবর্তন

যুগের পরিবর্তন স্বাভাবিক-প্রকৃতির নিয়ম-জীবনের নিমক। গতকাল, আজ বা আগামীকাল, অন্য কথায়, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ একই রকম নয়, হবে না, হতে পারে না- হওয়া উচিত নয়। বৈচিত্র্য বিকার বা বেকার নহে। প্রগতি জীবন্ত জীবনের পরিচায়ক। লর্ড টেনিসনের বাণী স্মরণীয় ও শাশ্বত সত্য।

Old order changeth, yielding place to new : Lest one good custom should corrupt the world.

পুরাতন যায় চলে, নতুনেরে ছেড়ে দিয়ে পথ,
পাছে না পচিয়ে ফেলে পৃথিবীরে পুরাতনী মত!

পুরাতনপন্থীগণকে প্রণাম বা তসলীম। যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে না চলে চারা নেই। চলাই জীবন। এ কথা আল্লামা ইকবাল বারবার বলে গেছেন জোরালো যবানে ও নিজস্ব ভঙ্গিমায়।

মূল কথা

আল্লামার জীবনবাদী শিক্ষার আলোচনা অনেকেই করেছেন এই পুস্তকে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আত্মার রহস্য বিকাশের ব্যাখ্যা ইকবালের দার্শনিক চিন্তাধারার মূল কথা। বালে জিবরীল হতে তাঁহার দু'লাইন তুলে দিচ্ছি ঃ

খুদী কো কর বুলন্দ ইত্‌না কে হর্‌ তক্‌দীর সে পহলে,
খুদা বন্দে সে খোদ পুছে বাতা তেরী রিয়া হ্যায়।

অনুবাদ

আপনার খুদী বা ব্যক্তিত্বকে এমনভাবে বিকাশ কর যেন বিধানের পূর্বে স্বয়ং বিধাতা সুধান বল কী বা পাইবার খাহেশ তোমার?

মুদ্দা কথা, নিজের তক্‌দীর-নিজের তদবীর বা প্রচেষ্টারই পরিণাম। আকাশবাহী মান্না সালওয়ারূপী কাল্পনিক পুরস্কার নহে।

জীবনবাদ সম্বন্ধে আল্লামার আরেকটি বাণী তুলে দিয়েই হোক এই আলোচনার সমাপ্তি ঃ

মাওয়ে যাখোদ রাফতা খারা মদ ও গোফত ঃ
হাসতম আগার মীরওয়াম্ গরনিরওয়াম নিসতম।
–সবল সতেজে চলি সায়রের তরঙ্গ দামাল
কহিল– চলিলে আছি, না চলিলে মরণ কামাল।

ইংরেজীতে কথাটা এই ভাবে বলা যায়- A wild wave rolled fast and said- "I am if I move; if not moving, I am dead" সচল সলিলই তরঙ্গ। তরঙ্গায়িত প্রবাহ ও প্রগতিই সত্যিকার জীবন। বসে থাকা সত্যিকার জীবন নয়, জীবনের অভিশাপ, অবিচার ও অবসাদ। এই কথাটাই আল্লামা বলেছেন উপরের উদ্ধৃত কবিতায়, আরো অনেক কবিতায়ও তিনি এ কথা বোঝাবার কোশেশ করে গেছেন জোরালো ভাষায় উর্দু, ফার্সী এবং ইংরেজীতে। মূল্যবান ও কাবেলে কদর কথা।

পাকিস্তানের পটভূমিকায়

ইকবাল ছিলেন সত্যদ্রষ্টা দার্শনিক। সত্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁকে সমাদর করা আবশ্যক। সত্যভিত্তিক বহু মাল-মসলা মওজুদ আল্লামার সমাদরের জন্য। খাঁটি মালের সহিত মেকী মাল মিশানো আমার মতে শুধু অশোভন নয়, খাঁটি মালের অমর্যাদা।

পাকিস্তান কথাটার জন্ম বিলাত প্রবাসী চৌধুরী রহমত আলীর মনে ও মস্তিষ্কে ১৯৩৩ সালে। বিলাত ফেরৎ জিন্নাহ সাহেব মুসলিম লীগের সংগঠন শুরু করেন ১৯৩৪ সালে। মুসলমানদের জন্য আজাদ রাষ্ট্রের প্রস্তাব পাস হয় লীগের লাহোর অধিবেশনে ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ। লীগ প্রস্তাবে পাকিস্তান কথাটা ব্যবহৃত হয়নি। অমুসলমান সাংবাদিকগণের বিরুদ্ধভাবাপন্ন প্রচারণার অংকুশ তাড়নাতেই পাকিস্তান কথাটা বিজড়িত হয়ে পড়ে লাহোর প্রস্তাবের সহিত।

১৯৩০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনের সভাপতিরূপেই ডক্টর ইকবাল ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আবেদন পেশ করেন। আজাদ রাষ্ট্র বা বৃটিশ শাসনাধীন। উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় রাষ্ট্রের কথা তিনি বলেননি। ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল আল্লামা চলে যান জীবনের পরপারে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট। পাকিস্তানের দুই হিস্যা পূর্ব ও পশ্চিম। পাকিস্তান আজাদ রাষ্ট্র, বৃটিশ শাসনাধীনে নয়। পূর্ব পাকিস্তানকে (সাবেক) বলা হয় ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সংকুচিত বা কীটদষ্ট সংস্করণ। পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও গৌরব ভারতের তদানীন্তন রাজ প্রতিনিধি লর্ড কার্জন সাহেব এবং তাঁর প্রধান সমর্থক নওয়াব সলীমুল্লাহ বাঁহাদুরের। ১৯০৬ সালে ঢাকাতে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠারও প্রধান উদ্যোক্তা সলীমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫)।

প্রথম পাকিস্তান

পূর্ব পাকিস্তান বলতে গেলে আসামবিহীন পূর্ব বঙ্গ আসাম প্রদেশেরই প্রতিরূপ। সমগ্র আযাদ পাকিস্তানের পূর্বাংশ আকারে ক্ষুদ্রাংশ, কিন্তু লোক সংখ্যায় বৃহদাংশ। লোকই রাষ্ট্রের প্রাণশক্তি। আযাদ ও পরাধীন রাষ্ট্রের পার্থক্য বাদ দিলে, ১৯০৫ সালের পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে মুসলিম ভারতের প্রথম পাকিস্তান বলা অসংগত বা অযৌক্তিক নয়।

লালাজীর সুপারিশ

১৯২৮ সালে পানজাবের অন্যতম নামজাদা নেতা লালা লজপৎ রায় ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্পর্কে *ট্রিবিউন পত্রিকায়* ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। শেষ প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, ভারতের মুসলমানগণ যেহেতু সম্মিলিত ভারতীয় রাষ্ট্রের পক্ষপাতী নন, সেহেতু সিন্ধু, পানজাব, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় চারটি এবং অন্যান্য মুসলিম গরিষ্ঠ অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করেও সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান করা হোক। লালাজীর দূরদৃষ্টি ও বাস্তববাদিতা কদরদানীর মুসতাহিক নিশ্চয়ই।

আযাদীর সংগ্রাম

স্বাধীন ভারতের স্বাধীন ইসলামের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তথাকথিত ওহাবী আন্দোলনের জরীয়াতে। সে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাইল দেহলভী প্রমুখ ধর্মীয় এবং ধর্মানুরাগী নেতৃবৃন্দ ও মুজাহিদগণ। ১৮৩২ সালে বালাকোটে শিখদের হাতে সে আন্দোলন বিপর্যস্ত হয়, তবে শেষ হয়নি। পরবর্তী তিরিশ বছর তা চলছিল। বাংলাদেশের হাজার হাজার মুসলমান সে আন্দোলনে শরীক ও শহীদ হয়েছিলেন এবং শরীক হতে প্রস্তুত ছিলেন আরো বহু-লোক জিলায় জিলায় ধর্ম ও আযাদীর অনুপ্রেরণায়।

১৮৫৮ সালে ভারতব্যাপী সিপাহী বিদ্রোহের কথাও স্মরণীয়। সফল হয়নি সে বিদ্রোহ, তবে ফলে শেষ হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব। ভারতের সম্রাজ্ঞী হন রাণী ভিক্টোরিয়া। ভারতবর্ষ পরিণত হয় পাকাপোখত বৃটিশ উপনিবেশ বিধাতার আশীর্বাদ বা অভিশাপে না হোক, ভারতবাসী হিন্দু মুসলিম ও অন্যান্য জাতির বোকামীতে ধর্মীয় কোন্দল-কলহের কচকচিতে।

স্বরাজ

৪/৫ হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়া হতে আর্য্য হিন্দুগণ উড়ে না হোক পায়ে হেঁটে জুড়ে বসলেন ভারতবর্ষে। কায়েম করলেন আধিপত্য বা রাজত্ব নানা অঞ্চলে, তবে ফিরে যাননি পরিহার করা সাবেক দেশে। তারপর এলেন মুসলমানগণ মধ্য এশীয় অঞ্চল হতেই। রাজত্ব করলেন প্রায় হাজার বছর। তাঁরাও ফিরে যাননি পরিহার করা সাবেক দেশে।

ভারতের আর্য রাজত্ব ও মুসলিম সুলতানী একই স্তরের স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন, ঔপনিবেশিক ঈশ্বর দত্ত আশীর্বাদ অভিশাপ কিম্বা খোদা দাদ নিয়ামৎ গজব নয়।

বাঁচা ও বিসর্জন

বর্তমান পাকিস্তান ও ভারত বলতে গেলে সাবেক স্বরাজেরই বিংশ শতাব্দীর রূপ। আর্য্য হিন্দু ও আর্য্য মুসলমানগণ ভারতের সম-অধিকারসম্পন্ন স্থায়ী বাসিন্দা। এই বাস্তব সত্যটুকু কোন্দল-কলহ কন্টকিত সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি কলুষিত পান্ডা বা পন্ডিতগণের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করুক, কামনা করি। নিজ বাসভূমে পরবাসী মনে করা মনোবৃত্তি বিশিষ্টদিগকেও বলি ঃ য পলায়তি স জীবিত নহে। ইকবালের বাণী মনে পড়ছে ঃ

বরতর আজ আন্দেশায়ে সুদ ও জিয়াঁহে জিন্দেগী
হে কভী জাঁ আওর কভী তসলীমে জাঁ হে জিন্দেগী!
– লাভ ক্ষতি হিসাবের বহু উর্ধ্বে মানব জীবন,
জীবন কখনো বাঁচা, কখনো বা আত্মবিসর্জন।

১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ যারা রদ করেছিলেন জননী-জন্মভূমিশ্চ-স্বর্গাদপী গরীয়সী ভিত্তিক বা বিলাসিতা ভাবালুতা বন্যার আবর্তনে যাতে ছ'বছর বাদ মুসলিম ভারতের প্রথম পাকিস্তান রদ হয়ে গেলো ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর তাঁদেরই আবদারে বা আবেদনে বাঙলা আবার বিভক্ত হলো (পানজাবসহ) ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে। এই সকল ভাববাদী বা ভাব-বিলাসীদের এবং মাটিবাদী হুজুগীদের উপকারার্থে আল্লামা ইকবালের *ওতানিয়াৎ* বা *স্বাদেশিকতা* শীর্ষক কবিতাটি তুলে দিচ্ছি ঃ

স্বাদেশিকতা

হাল জমানায় হরেক রকম শরাব, পাত্র, নীতি,
বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সাকীর বিভিন্ন রেওয়াজ রীতি।
আমরা মুসলিম করনু কায়েম আপন হেরেম ঘর,
গড়লে নতুন সভ্যতা যে দেউল আজীবতর।
নতুন এসব দেওতা মাঝে স্বদেশ সবার সেরা,
পোশাক তাহার ধরম তরে কাফন মরণ ঘেরা।
স্বদেশ দেওয়ের তৈরী এসব নতুন পুতুল ঘর,
বনতে পারে বিনাশ ভীতি নবীর দীনের পর।
তোর যে বাহু শক্ত ওরে তওহীদী শক্‌তিতে,
তোর যে স্বদেশ ইসলামে, তুই মোস্‌তাফী উক্‌তিতে।
দেখিয়ে দে না সাবেক দিনের দৃশ্য কালের বুকে,

যাক্ না মিটে মাটির সনে মাটির দেওতা ধুঁকে।
বনবে যদি বন্দী মাটির বিনাশ দুর্নিবার,
সাগর বুকে মৎস্য বেড়ায় আযাদ সত্যিকার।
স্বদেশ ছেড়ে বিদেশ বসত আরব নবীর শান,
দাও না সাক্ষ্য সভায় মিলে রাখতে নবীর মান।
রাজনীতির ঐ বোল চালাতে স্বদেশ যারে কহে,
শেষ নবীজির ইরশাদেতে স্বদেশ তাহা নহে।
বিশ্ব বুকে সকল জাতি লড়ছে স্বদেশ তরে,
বণিকপনায় বাদ্‌শাহীয়াৎ স্বদেশ স্বদেশ করে।
স্বদেশ তরে রাজনীতিতে নাই সততার চিন্
স্বদেশ দেওয়ের দাজ্জালীতে দুর্বল গৃহহীন।
স্বদেশ তরে সৃষ্টি খোদার বনছে বিরান হায়।
স্বদেশ দায়ের নিঠুর ঘায়ে ইসলামিয়াত যায়।

হযরতের বাণী

'হুব্বুল ওতানে মিনাল্ ঈমান'- *স্বদেশের ভালবাসা ঈমানের অংশ* বলে হযরত মুহাম্মদ মুস্তফার (সাঃ) নামে প্রচলিত বা প্রচারিত একটি পয়গাম রয়েছে। সত্যা-সত্যের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সে গহীন গাঙে বা গহ্বরে প্রবেশ করে অনেক কথা বলতে হয়। আলোচ্য বাণীটি অর্থপূর্ণ। কথাটি বাজে বা খাঁটি মাল, এহেন বিচারবিতর্ক বেকার। "খুয মা ছাফা; দা' মা কাদা"–যা সুষ্ঠু, সুন্দর বা পরিষ্কার তা গ্রহণ কর; যা অসুন্দর বা অপরিষ্কার তা পরিহার কর– এটা আঁ-হযরতের সহীহ্ হাদীস। কথাটি খুবই মূল্যবান।

মাটি মায়া অন্যায় বা অস্বাভাবিক নয়। তবে ইকবালের মতে, 'হো কায়দে মাকামী তু নতীজা হে তাবাহী ঃ রাহ বাহার মেঁ হে আযাদূ ছুরাতে মাহী'–

বনবে যদি বন্দী মাটির বিনাশ দুর্নিবার ঃ সাগর বুকে মৎস্য বেড়ায় আযাদ সত্যিকার। আদর্শ হিসাবে কথাটি চমৎকার। গ্রহণীয় ও পালনীয়। তাই ১৯৪২ সালে প্রকাশিত 'পথের পয়গামে' বলেছিলেন–

মানবতা

অতুগ্র স্বদেশ প্রেম স্বজাতির মায়া,
ভৌগোলিক জাতীয়তা-দামব দয়ায়,
দুনিয়ার রাজনীতি প্রাণহীন কায়া,
অশান্তির কালানল জ্বলিছে ধরায়।

অহিংসার অবতার যীশু ভক্তগণ
শোণিত উৎসবে মত্ত, কানানের মেষ
কবলিত যুপকাষ্ঠে নাৎসীবাদীগণ
শাণিত কৃপাণে তারে করিতেছে শেষ।
জনম ভূমির প্রীতি ভাল সে নিশ্চয়;
কিন্তু সে প্রেমের বানে করিবে হনন
নর-নারায়ণে? তবে কে দেখিবে হায়!
বিধাতা বা প্রকৃতির সৃষ্টি সনাতন?
জাতীয়তাবাদী যত মহারথীগণ!
ভুলনাকো মানবতা নর-নারায়ণ।

ইসলামের আদর্শ

সত্যিকার ইসলামের আদর্শও মানবতাবাদ-মোল্লাবাদ নয়। ইকবাল সে কথা বারবার বলেছেন। হযরত মুহম্মদ মুস্তফার (সাঃ) অন্যতম জোরালো বাণী ঃ 'খায়রুন নাছে মায়্যানফায়ূন-নাছ'-পরোপকারী মানুষই মানুষের সেরা বা শ্রেষ্ঠতম। হাজার কথার এক কথা। 'নাছ' মানে মানুষ বা মানবতা। কোরান শরীফেও রয়েছে-'ইন্না আক্‌রামাকুম ইনদাল্লাহে আতকাকুম'-আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশী সম্মানী তিনি যিনি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী, আল্লাহ ভীতু, সদাচারী বা সৎকর্মশীল।

মানুষের কল্যাণই ইসলামের শাশ্বত আদর্শ। বেহেশত-দোযখ হাশর-নশরের আশাভীতি সৎকর্মানুরাগ ও ঈমানদারীর অনুপ্রেরণা।

উপসংহার

তথাকথিত মুল্লাবাদী ইসলামের আল্লামা ইকবালের আকীদা ছিল না; তাই তিনি মুল্লাদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন 'কুফরীর' খেতাব। এহেন ফতোয়ার ফাৎরামী আফসোসের বিষয়। পীরবাদ বা পুরোহিতবাদেও আল্লামার আকীদা ছিল না, কেননা আঁ-হযরত নিজে বলেছিলেন-'লা রুহবানিয়াতা ফিল ইসলাম'-পীরালী, পৌরহিত্য বা পাদ্রীগিরীর প্রথা ইসলামে নাই। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথও বলেছেন-'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।' আল্লামার 'বাগী মুরীদ' কবিতার প্রথম স্তবকেই হোক তাম্মাৎ বিল খায়ের ঃ

'জ্বলেনা মাটির দীপ আবাসে মোদের,
পীরের প্রাসাদে জ্বলে বাতি বিদ্যুতের!
শহরী-দেহাতী যত বেকুফ সদন
প্রতিমার প্রায় পূজ্য পীর ও ব্রাহ্মণ!'
-বালে জিবরীল

ঢাকায় ইকবাল দিবসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব, এম.এ.পি-এইচডি, বলেন ঃ

ইকবালের কাব্য ও দর্শনের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত। যে রসালো ফার্সী ভাষায় ইকবালের বেশীর ভাগ লেখা, তা আমার অজানা। উৎসব বাড়ীর নানা রকমের ভাল খানায় যারা ভাগ্যদোষে শরীক হতে পারে না, তারা যে-সব ভাগ্যবান চর্ব্য-চোষ্য ও লেহ্যের সদ্ব্যবহার করেন, বড়জোর দূর থেকে তার আওয়াজই শুনতে পায়। যদিও পারস্য সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি আমার অনুরাগ প্রচুর, নানা চেষ্টায় আমি দূর থেকে তার আওয়াজই শুনতে পেয়েছি, ভাবের গভীরে প্রবেশ করতে পারিনি। তথাপি ইকবালের চিন্তাধারাকে বুঝবার জন্য যে চেষ্টা করেছি, তার মূল কারণ দর্শনের ছাত্র হিসাবে ইকবালের সঙ্গে আমার নাড়ীর যোগ। ইকবালের প্রতি গভীর আকর্ষণের আর এক প্রধান কারণ, মানুষের কর্মজীবনের সঙ্গে দর্শনের যোগসাধনই তাঁর লেখার পাতায় পাতায় ধ্বনিত ও বিঘোষিত।

আধুনিক যুগে ইকবাল যে ইসলামের সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বে সবচেয়ে বড় ব্যাখ্যাত, তা অনস্বীকার্য ও সর্বজনবিদিত। সত্যিকার ইসলাম যে-কোন মানবগোষ্ঠির বা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়, ইসলাম যে এক সুষ্ঠু জীবন দর্শনেরই নামান্তর, ইকবাল তা খুব ভাল করেই দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দু'টি জনপ্রিয় কবিতা '*শিকওয়া*' ও 'জওয়াবে শিকওয়া'র তুলনামূলক আলোচনা থেকে এ সত্য আমরা খুব ভালভাবেই বুঝতে পারি। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বলা চলে যে, নানা বিরোধী ভাবের সমন্বয়ের মাধ্যমে মানুষকে সর্বাধিক কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়াই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য।

কোরআন শরীফে আদি মানব আদমের সৃষ্টির যে অনুপ্রেরণাদায়ক কাহিনী রয়েছে ইকবালের ব্যক্তিত্ববাদের মূল তার প্রচুর প্রেরণা। মানবসৃষ্টির উদ্দেশ্যে যখন মানুষকে আল্লাহ্ তা'য়ালার গুণের প্রতিফল খেলাফত দেওয়া হয়, তখন আল্লাহর অনন্ত সত্তায় মানুষের ক্ষুদ্র সত্তা হারিয়ে ফেলা তার লক্ষ্য হতে পারে না। তাঁর দার্শনিক চিন্তার শেষ পর্বে ইকবাল ব্যক্তির সত্তাহানির বিরুদ্ধে তাই এক বড় জিহাদ ঘোষণা করেছেন। ব্যক্তির সত্তা স্ফূরণের প্রতি তাঁর এই অত্যধিক আকর্ষণ দেখে কেউ কেউ তাঁকে আজকের দিনের Existentialists বা অস্তিত্ববাদীদের দলে ফেলতেও সঙ্কোচবোধ করেন নি।

রুমীর *মসনবীর* ছন্দে লেখা ইকবালের দার্শনিক কাব্য *'আস্‌রারে খুদী'* বা আত্মরহস্যে ইকবাল নানাভাবে ব্যক্তিত্বের জয় ঘোষণা করেছেন ও মানুষ তার ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ করে সত্যি আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রতিনিধিত্ব কিভাবে করতে পারে, তারো প্রচুর নির্দেশ দিয়েছেন। সুফী দার্শনিকদের আল্লাহর সত্ত্বায় ব্যক্তির সত্ত্বা হারিয়ে ফেলা ফানা ফিল্লাহ্ ও বৌদ্ধ নির্বাণ এই উভয় জীবন-আদর্শকেই ইকবাল তাঁর আত্মরহস্যে ভ্রান্ত বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। ব্যক্তিত্ব বিনাশের ধারণাকে সেখানে তিনি আত্মবিকাশের পথে অনেকটা নেশাগ্রস্তের মত খুইয়ে যাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন।

খুব মজার কথা, ইকবাল তাঁর আত্মরহস্যে ব্যক্তিত্বহানির দর্শনকে এই উপমহাদেশের তৎকালীন পরাধীনতার একটা সাফাই গাওয়া বলতেও দ্বিধাবোধ করেন নি। যে প্লেটোকে

সাধারণত পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার উৎস ও আকর বলে বিবেচিত করা হয়, তাঁর দর্শনের নিষ্ক্রিয় প্রেমতত্ত্বকে ইকবাল ভেড়ার দর্শন আখ্যা দিয়ে তার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

অনেকে তাই মনে করেন, ইকবাল দর্শনের আদিপর্বে সুফী প্রেমতত্বের যে আকৃতি, তাঁর দর্শনের শেষপর্বে ইকবাল তার বিরোধিতাই করেছেন। ইকবাল দর্শনের এই আদিরূপের বর্ণনা তাঁর তত্ত্ববহুল ও প্রেরণাদায়ক Metaphysics of Persia-তে পাওয়া যায়। এর এক সুন্দর বাংলা তর্জমা করেছেন বন্ধুবর কামাল উদ্দীন সাহেব যা প্রকাশিত হয়েছে ঢাকাস্থ ইকবাল একাডেমীর তত্ত্বাবধানে।

ইকবালের দার্শনিক চিন্তার এই দুই পর্বের ভিতর একটা বিরাট ফাটল আছে মনে করা আমার বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত নয়। ইকবালের দার্শনিক চিন্তার সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর Reconstruction of Religious Thought in Islam নামক ইংরেজী বক্তৃতামালা। এ বক্তৃতাগুলোর মাধ্যমে ইকবাল আধুনিক যুগের মনোবৃত্তি ও চাহিদার আলোকে ইসলামের মূল নীতির ব্যাখ্যা করেছেন। এ বক্তৃতাগুলোর প্রধান আলোচ্য বিষয় Religious experience বা ধর্মীয় অনুভূতি। ধর্মীয় অনুভূতি যে এক সামগ্রিক অনুভূতি, এক অখন্ড সত্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ, ইকবাল খুব জোরের সঙ্গে এ কথা তাঁর এই বক্তৃতাগুলোতে বলেছেন। আঠার শতকের শেষ পাদের প্রসিদ্ধ দার্শনিক Emanuel Cant ঈশ্বরের প্রচলিত প্রমাণগুলোর যে কঠোর সমালোচনা করেছেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইকবাল শুধু তার মূল্যায়নই করেননি, তার সদুত্তরেরও সাক্ষাৎকার হয়, তবে উগ্র ব্যক্তিত্ববাদকে তাঁর দর্শনের শেষ কথা বলা চলে না। ইকবালের প্লেটো-বিরোধিতাও আপেক্ষিক, নিরপেক্ষ নয়। উগ্র ব্যক্তিত্ববাদের প্রেরণা যুগিয়েও ইকবাল বলেছেন 'মানুষের ব্যক্তিত্বের স্ফূরণের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ইশ্‌ক বা প্রেম।' তবে এ প্রেম নিষ্ক্রিয় নয়, সক্রিয় এবং প্রেম মানুষকে নিম্ন করে না, নানা দ্বন্দ্বের সমাধানের মাধ্যমে তাকে তার ব্যক্তিত্বের স্ফূরণের পথে এগিয়ে দেয়। আগেই বলেছি, এ সামঞ্জস্য ও সমন্বয়ই ইসলামের গোড়ার কথা-তাঁর জীবন দর্শনের মধ্যমণি।

সুফীবাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও সুফীবাদের এক অগ্রণী মৌলানা রুমীর এক বড় শিষ্য বলে ইকবাল দাবী করেছেন। রুমীর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ববাদী দার্শনিক কাব্য আত্মরহস্য রচনা করেছেন। সুতরাং রুমীর দর্শনের যা মূল কথা অর্থাৎ প্রেম, তাকে বাদ দিয়ে ইকবাল শুধু কর্মমুখর জয়গান করেছেন-এ কথা বলা খুব ভুল হবে।

আর ইকবাল নিজেও একজন সুফী। বুদ্ধিকে তত্ত্ব নির্ণয়ের শেষ হাতিয়ার বলে তিনি কখনও স্বীকার করেননি। বুদ্ধি ও বুদ্ধির অতীত তত্ত্ব অনুভূতির ভেতর এক যোগসূত্র বের করাই ইকবালের লক্ষ্য। এখানেই ইকবালের গাযযালী থেকে পার্থক্য। গাযযালী হচ্ছেন শরীয়ত ও মারেফাতের যোগসূত্রের আবিষ্কর্তা, আর আজকের দিনের বুদ্ধিবাদের সমর্থক হয়েও ইকবাল বুদ্ধি ও বুদ্ধি অতীত প্রজ্ঞার মিলনমন্ত্রের এক বড় প্রচারক। যা-ই হোক, সর্বব্যাপী বিশ্বসত্ত্বার প্রতিতি যদি ধর্মীয় অনুভূতির শেষ লক্ষ্য হয়, তা হলে উগ্র ব্যক্তিত্ববাদ ইকবাল দর্শনের শেষ কথা হতে পারে না।

প্রত্যেক প্রতিভাবান মানুষের উপরই তার পরিবেশের প্রভাব স্বীকার্য। পাশ্চাত্য কর্মবাদের সংস্পর্শে এসে এই উপমহাদেশের অগণিত নির্যাতিত মানুষের, বিশেষতঃ মুসলিম সমাজের, মুক্তির সন্ধান ইকবাল পেয়েছিলেন কর্মমুখর ব্যক্তিত্ববাদে। এই ব্যক্তিবাদের জয়গানে মুখর হলেও তাঁর শেষ লক্ষ্য যে প্রেম ও অখন্ড সত্তার অনুভূতি, ইকবাল তা কখনও ভুলেননি। আগামী দিনে যাঁরা ইকবালের চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করতে চান, তাঁদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ইকবালের চিন্তাধারার আদি ও শেষ পাঠের মধ্যে যে যোগসূত্র লুক্কায়িত, তা আবিষ্কার করা। এভাবেই আমরা সত্যিকার ইকবালের, তাঁর নিরঙ্কুশ মানবতার সন্ধান পেতে পারি। ইকবাল দর্শনের মূল কথা মানবতা, এর জন্যই নিৎসের অত্যাচারী অতিমানবের বিরুদ্ধে তাঁর বড় অভিযান।

বলা বাহুল্য, প্রেম ও কর্মের সঞ্চয় ও সামঞ্জস্যে ইকবাল যে মানবতার মন্ত্র ঘোষণা করেছেন যা আমার মতে ইসলামের অবিকৃত রূপ তার বাস্তব রূপায়ণের ভেতরই এই সঙ্কটময় মুহূর্তে মানুষের ভবিষ্যত নিহিত।

স্মরণে

সুফিয়া কামাল

চাঁদ সিতারার গতিপথে আছে
সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণ
কিন্তু মানব মন!
চপলার চেয়ে সচকিত গতি তার
সাহারার চেয়ে তৃষিত, এবং প্রজ্ঞার পিপাসার
শেষ কভু নাহি হয়,
যে বেসেছে ভালো এ মাটিরে তার জীবন জিগিসাময়।

সন্ধানী আলো জ্বালা দুই চোখে বেদনা মধুর মন
মানব জীবন স্রষ্টারে করে নিতি সে অন্বেষণ।
সৃজিয়া মানুষ মাটির ধুলায়, ধরণীতে মনোরম
ফুটায়েছ ফুল, ফলায়েছ ফল, বায়ু, বারি প্রাণ সম,
মিলনের সুখ বিরহের ব্যথা, বুকে প্রেম চোখে জল
আবেশ আনন্দ; দুঃখ সুখ কত বিস্ময় বিহ্বল।
সে সৃজেছে সেই শক্তিমানের লীলাখেলা, কৌতুক
মহাবিশ্বের গাঢ় রহস্য ভেদিবারে উৎসুক,
জাগে এক মহাপ্রাণ,
কি যে বিচিত্র সৃষ্টির লীলা! করে চলে সন্ধান।
সে কবি! সে শিল্পী! সে হয় মানব দরদী প্রাণ
'সবার ঊর্ধ্বে মানবতা' এই কবিকণ্ঠের গান।
দুর্ভাগা দেশ জাতির জীবনে একদা পরম ক্ষণে
আসে সৌভাগ্য মজলুম জনগণে
হেরিয়ে ব্যথায় ভরে,
বিশ্ব ব্যাপিয়া এত বৈভব তবু কেন ঘরে ঘরে
ওঠে এত হাহাকার–
শুধাই তোমারে! করি ফরিয়াদ উত্তর দাও তার।
বিশ্বাসী মন, সবল দৃঢ়! প্রত্যয় ভরা হিয়া
স্রষ্টার কাছে ফরিয়াদ করে সবার অভাব নিয়া।

শেকোয়ার কবি! অমর সে মহাপ্রাণ,
ভালোবেসে এই মর্ত মানবে, হয়েছে যে মহিয়ান।

কঠোর কুঠার কাস্তে, হাতুড়ী, লাঙ্গল বওয়া চাষী
সকলের তরে এই মাটি আর জলবায়ু, আলোরাশি।
স্রষ্টার ফরমান!
নতুন করিয়া এনে দিলে তুমি নব জীবনের গান ঃ
'যে ফসলে নাই গরীবের অধিকার
অগ্নি দহনে ধ্বংস করিয়া তার
চিহ্ন করে দাও দূর'
গেয়ে ওঠে কবি মানুষের তরে তীব্র কণ্ঠসুর।
মানুষের তরে এই কথা ওঠে কয়ে,
বড় ক্লান্তির পরে যেন আসে বয়ে
মরুতে বাদল বায়ু;
মরিতে মরিতে ফিরে লভে যেন আয়ু,
বক্ষে লভিয়া বল
নতুন করিয়া জাগে মজলুম দল।

নিশীথ আকাশে তারকার কানাকানি,
চকিতে সে লেখে স্রষ্টার কোন বাণী,
শব্দ বিহনি ঈষৎ সে ইশারা
বুঝিতে পারে না হেথা যারা
তাহাদের তরে
বক্ষের পঞ্জর হতে উৎসারিত করে
দিলে তুমি পর্বতে, অরণ্য সেই কথা,
জাগো হে মানুষ! জাগো! জাগ্রত হউক মানবতা!

বিথারি আলোক রশ্মি অজ্ঞানের অন্ধকার ভেদি
মহান স্রষ্টার দান লভি নিরবধি
মৃত্যুহীন হইয়াছে যে মহান প্রাণ
তাঁহারি স্মরণে আজ কণ্ঠে কণ্ঠে বেজে ওঠে গান।
[করাচী, হোটেল মেট্রোপোল-এ ইকবাল স্মৃতিবার্ষিকীতে পঠিত, ২৬-৪-৬৭]

সোভিয়েত রাশিয়ায় ইকবাল

এল. মিরনভ

মহাকবি ইকবাল আজ আর কেবল পাকিস্তানের কবি নন। সীমার গতি ছাড়িয়ে গেছে তাঁর কাব্য; বিশ্ব জুড়ে তাঁর খ্যাতি। বিদেশী ভাষায় তাঁর রচনাবলীর তরজমার কলেবর দিন দিন হচ্ছে পরিবর্ধিত। দেশ-বিদেশের সাহিত্যিক, পন্ডিত, ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের সমাজে তাঁর সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে সৃষ্টি হয়েছে প্রবল আগ্রহ। সত্য বলতে কি, ইকবালের সাহিত্য-সাধনার সুচারু পরিক্রমণ ব্যতিরেকে পাক-ভারতের আধুনিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে কোনো প্রকার ঐকান্তিক গবেষণা মোটেই সম্ভব নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নেও মহাকবি সুপরিচিত। রুশ ভাষায় বেশ ক'বারই তাঁর কাব্য সংকলন অনূদিত হয়েছে। তাজিকিস্তানে তিনবার তাঁর কাব্যের তর্জমা প্রকাশিত হয়। মশহুর তাজিক কবি মীর সাঈদ মীর সাকেব রচনা করেছেন তরজমাগুলোর মুখবন্ধ। তাজিকরা এখন ফারসী ও মাতৃভাষায় ইকবালের কাব্যসুধা পান করতে পারে!

সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রাচ্য ভাষাবিদদের ইকবালের সাহিত্য চর্চা প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। ইকবাল এই সেদিনও তাঁদের কাছে ছিলেন রাজনীতিক ও দার্শনিক, তাঁর রচনাবলী ছিল প্রধানত ইতিহাসবেত্তা ও দর্শনশাস্ত্রীয় গবেষণার বিষয়বস্তু। এ ধরনের গবেষকদের মধ্যে ঐতিহাসিক লিউডমিলা গর্ডন পনস্কয়া ও দার্শনিক নিকোলাই অনিকেভের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দর্শন ও রাজনীতির বেদীতে বসিয়েই তাঁরা ইকবালকে বিচার করেছেন, করেছেন তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল্যায়ন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, রাশিয়ায় ইকবাল চর্চার ক্ষেত্রে এঁরা দু'জন হলেন পথিকৃৎ।

নাতালিয়া প্রিগারিনার গবেষণামূলক প্রবন্ধটি সোভিয়েত ইউনিয়নে কবির বহুমুখী প্রতিভার সাথে পরিচিত হওয়ার নবতর প্রচেষ্টা হিসেবে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমীর এশীয় ইনস্টিটিউটের এই সুধী মহিলা তাঁর থিসিসে কবি ইকবালের দর্শন সম্পৃক্ত গীতি-কবিতাগুলোর বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্যের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। ইকবাল সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নে এটিই প্রথম বড় রকমের গবেষণা।

নাতালিয়া প্রিগারিনা সুদীর্ঘ দশটি বছর ধরে ইকবালের রচনাসমুদ্রে নিমগ্ন ছিলেন। তিনি কবির সাধনাকে করেছেন মন্থন। কবি সম্পর্কে তিনি অনেকগুলো প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলো প্রকাশিতও হয়েছে বিভিন্ন রুশ পত্র-পত্রিকায়। ঐ আলোচ্য থিসিসটিতে তিনি কবির অগাধ পান্ডিত্যের গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করতে চেয়েছেন কবির অননুকরণীয় সৃজনশীল ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন।

মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধে দার্শনিক কবি ইকবালের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য । তাঁর সাহিত্য সাধনার সাথে পরিচিত সকল সুধী ব্যক্তিই একবাক্যে এ কথা স্বীকার করেছেন। ধর্ম ও দর্শনের অবয়বে যে মানবত্ববোধ কবির রচনায় বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, নাতালিয়া তার স্বরূপ আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত কবির গীতিকাব্য বিচার করতে গিয়ে মানুষ সম্পর্কে কবির ধারণা থেকেই তিনি বিশ্লেষণ শুরু করেছেন। *'আসরারে খুদী'* ও *'রুমূযে বেখুদী'*- এই দুই কবিতায় তিনি কবির মর্দে মুমিনের দর্শন বিশ্লেষণ করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন। কবি প্রথমটিতে মানবের সীমাহীন সম্ভাবনার জয়গান এবং দ্বিতীয়টিতে মানুষের সমাজ সেবার পবিত্র দায়িত্বের বাণী প্রচার করে গেছেন । নাতালিয়া ইকবালের শ্রেষ্ঠতম রচনা 'পয়াম-ই-মাশরিক' (প্রাচ্যের বাণী)-এ কাব্যের ভাবাদর্শ, শব্দ চয়ন ও স্টাইলের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন যে, কাব্যটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। কারণ এটি একটি অত্যুৎকৃষ্ট ও অনন্য কাব্য ; দর্শন ও কাব্য-সৌন্দর্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটছে এই কাব্যে। নাতালিয়ার মতে, কাব্যটিতে কবি ইকবাল দার্শনিক ও রাজনীতিক ইকবাল থেকে অনেক অগ্রগামী ।

নাতালিয়ার ভাষায়, ইকবাল রোমান্টিক কবি। তবে কবির রোমন্টিসিজম ও তাঁর মনে ক্রিয়াশীল পাশ্চাত্য ভাবধারায় আগুনের মাঝে তিনি টেনে দিয়েছেন সীমারেখা । ইকবালের কাব্যের ইমেজ নতুন, নতুন এর বিষয়বস্তু, বিশ শতকের প্রথম পাদের বৈপ্লবিক ভাব-তরঙ্গে আবেগচঞ্চল ।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ও রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে ১৯১৩-২৩ সালে ভারতের বৈপ্লবিক জাগৃতির ক্ষণে রচিত কবিতাগুলো ইকবালের দেশাত্মবোধ ও নাগরিকবোধে ভাস্বর। এ প্রসঙ্গে কবির সামাজিক ও নৈতিক ধ্যান-ধারণার রূপায়ণে রুশ বিপ্লব যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, নাতালিয়া প্রিগারিনা তা ব্যাখ্যা করেছেন। স্মরণযোগ্য যে, ইকবাল রুশ বিপ্লবের বন্দনা গেয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, অক্টোবর বিপ্লব এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই যুগ মেহনতী মানুষের যুগ। রাশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ এবং জীর্ণ পুরাতনকে ভেঙ্গে-চুরে তার কবরের উপরে নতুন যুগের বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্যে তিনি দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । যে রুশ বিপ্লব মানুষের দ্বারা শোষণের ইতিহাসের যবনিকাপাত ঘটিয়েছে তার স্তুতিতে কবি হয়েছেন মুখর। লেনিন সম্পর্কিত রচনাগুলোতে তাঁর উৎসাহ-উচ্ছ্বাস প্রতিটি ছত্রেছত্রে উপচে পড়েছে।

উপসংহারে নাতালিয়া বলেন যে, কবির কাব্যের সুর লহরী ও মোহিনী শক্তিতে পাঠক মায়ামুগ্ধ ও বিমোহিত না হয়ে পারে না । কবিতার প্রতিটি কথা, প্রতি চরণের সাথে ইকবালের সত্তা নিবিড়ভাবে মিশে আছে । তাঁর কবিতা পড়লেই মনে হয়, এগুলো যেনো শুকনো খড় । সেই খড়ে লেগেছে আগুন। মৃদুমন্দ হাওয়ার পরশে সেই আগুন গনগনিয়ে উঠেছে বারুদের মতো, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে খড়-কুটোকে এবং সবশেষে তা অপরের হৃদয়ে জ্বেলে দিচ্ছে অনির্বাণ অগ্নিশিখা । [অনুবাদ ঃ সৈয়দ আবদুল কাহ্হার]

পাঞ্জাব ভার্সিটিতে তিন দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল ইকবাল কংগ্রেস

আবদুল ওয়াহিদ

ইন্টারন্যাশনাল ইকবাল কংগ্রেসে যোগদান করে আল্লামা ইকবাল সংসদ বিরল দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে। লাহোরস্থ পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগ এবং ইকবাল একাডেমী লাহোরের যৌথ উদ্যোগে ৯ থেকে ১১ নভেম্বর ১৯৯৮ এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের ১০টি দেশের ডেলিগেটসহ পাকিস্তানের প্রায় ১০০ ইকবাল স্কলার কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন। পাক প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ রফিক তারার কংগ্রেসের উদ্বোধন করেন। দেশ-বিদেশের অভ্যাগত ডেলিগেটদের স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ভার্সিটির ভাইস চান্সেলর এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডঃ খালেদ হামীদ শেখ। কংগ্রেসের প্রতিটি সেশন উপস্থাপন করেন দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সেক্রেটারী ডঃ আবসার আহমদ। পাকিস্তান ছাড়াও বাংলাদেশ, ইরান, তুরস্ক, ভারত, তাজিকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের ইকবাল স্কলার কংগ্রেসে যোগদান করেন।

৯ থেকে ১১ নভেম্বর'৯৮ গোটা পাকিস্তানে মনে হচ্ছিল ঈদের খুশী বয়ে যাচ্ছে। পিটিভি, রেডিও পাকিস্তান অন করলেই ইকবাল দিবসের প্রোগ্রাম ভেসে আসত। জাতীয় দৈনিকগুলো বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এ ছাড়াও প্রতিদিনের খবর অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করে। ইকবাল জাতীয় কবিই বটে। জাতীয় কবির সম্মান এবং মর্যাদা কিভাবে দিতে হয়– তা পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথেই দিয়েছে। তাদের জাতীয় কবিকে তাঁর জীবদ্দশায় যেভাবে মাথারমণি করে রেখেছিলেন, মৃত্যুর পরও তারা সেভাবেই মাথায় তুলেই রাখছেন।

৯ নভেম্বর ইকবালের ১২১তম জন্ম দিবসে শুরু হয় তৃতীয় কংগ্রেস। ইতোপূর্বে ১৯৭৭ সালে এবং ১৯৮৩ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ইকবাল কংগ্রেস। এই কংগ্রেসগুলোর বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, বিদেশের পাশাপাশি পাকিস্তানের বরণীয় ইকবাল স্কলারবৃন্দের অংশগ্রহণ, পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ইকবাল স্কলারবৃন্দ ছুটে আসেন সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার অদম্য স্পৃহা নিয়ে। পাকিস্তানের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসকে সফল করার লক্ষ্যে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। কে কি খিদমত আনজাম দিতে পারবেন– এটা প্রতিযোগিতার বিষয়ে পরিণত হয় বলেই মনে হল। শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ছাড়াও আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা ছুটে আসেন কংগ্রেস উপভোগ করার জন্য। সবার জন্য অবারিত অডিটোরিয়াম। তাদের জাতীয় কবির বরেণ্য জীবন ও কর্মের ওপর বিশ্ব নেতৃবৃন্দের মুখে দু'টো কথা শোনার জন্য সবাই উন্মুখ। আন্তর্জাতিক ইকবাল স্কলারবৃন্দও তাঁদের হৃদয় কন্দরে গুমরে ফেরা কথামালা উপহার দেন উপস্থিত ইকবাল প্রেমিকদের।

৯ নভেম্বর'৯৮ ডেলিগেটবৃন্দ স্ব-স্ব নাম রেজিস্ট্রি করেন ফয়সল অডিটোরিয়াম। যেখানে ডেলিগেটদের উপহার দেয়া হয় মনোরম ব্যাগ এবং পূর্ববর্তী কংগ্রেসগুলোর ইংরেজী ও উর্দু প্রকাশনা। এ বছরও ইংরেজী এবং উর্দু স্মারকে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলো স্থান পেয়েছে। এছাড়ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ছোট, মধ্যম এবং বৃহৎ স্মারক, হ্যান্ডবিল, ফ্লিফোল্ডার প্রকাশ করে বিতরণ করেছে। আল্লাম ইকবাল সংসদ উপহার দিয়েছে সংসদ পত্রিকা 'ইকবাল স্ট্রাডিজ' সম্পূর্ণ ইংরেজীতে।

বেলা ১০টায় ডেলিগেটদের নিয়ে যাওয়া হয় শাহী মসজিদে ইকবালের মাজারে ফাতিহা পাঠ করার জন্য। সেখানে ছিল মহাসমাবেশ। জনসমুদ্রের মধ্য দিয়ে ডেলিগেটদের সামনের দিকে নিয়ে যায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। পাঞ্জাবের গভর্নর, চীফ মিনির্স্টার, ভার্সিটির ভাইস চান্সেলর ফুলের ডালি নিয়ে ফাতিহা পাঠ করেন। ডেলিগেটবৃন্দ পৃথকভাবে পুষ্প অর্পণ করেন। বেলা ১১টায় নিয়ে যাওয়া হয় ইকবাল মিউজিয়ামে। ইকবালের জীবন এবং কর্মের সাক্ষ্য বহন করছে জাভিদ মনজিলে। ইকবাল একাডেমীর সৌজন্যে ছিল চা-

চক্র। ১২টা ৪৫ মিনিটে আবার ভার্সিটির কায়েদে আজম ক্যাম্পাসে নিয়ে আসা হয়। ২টা ৫০মিনিটে আরম্ভ হয় উদ্বোধনী অধিবেশন। বিশাল হল জনরবে মুখরিত ছিল। মেহমানদের আগমনে 'নারায়ে তাকবীর' ধ্বনি উঠছিল। হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে পাক প্রেসিডেন্ট মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। সুললিত কণ্ঠে কুরআন তিলাওয়াতের পরপরই কালামে ইকবাল ধ্বনিত হয়। ভাইস চান্সেলর স্বাগত ভাষণে ইকবালের সাথে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটির নাড়ীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, ভার্সিটি ইকবালের জীবন ও কর্মের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষও প্রকাশ করার কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। উদ্বোধনী ভাষণে পাক প্রেসিডেন্ট ইকবালকে মুসলিম মিল্লাহর অন্যতম প্রধান কবি-দার্শনিক হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন, ইকবালের চিন্তার ফসল আজকের পাকিস্তান। তিনি তদানীন্তন প্রেক্ষাপটে শক্ত হাতে কলম ধারণ করেছিলেন। হতাশাদীর্ণ জাতিকে তিনি কাব্যের অমোঘ চাবুক মেরে দিকনির্দেশ দিয়েছেন পথ চলার। তাঁর গদ্য ও পদ্য অনাগতকালের মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার।

১০ নভেম্বর '৯৮ সকাল ৯টায় দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হয়। বাংলাদেশের প্রতিনিধি আল্লামা ইকবাল সংসদের উপদেষ্টা ও সম্পাদনা কমিটির চেয়ারম্যান এডভোকেট মুজিবুর রহমান এক অধিবেশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন এবং সংসদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মীর কাসেম আলী একটি সেশনে কোন চেয়ারম্যানের দাযিত্ব পালন করে দেশের জন্য দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছেন। এদিন সংসদের সেক্রেটারী জেনারেল আবদুল ওয়াহিদ 'মুসলিম বিশ্বের ঐক্যে'র ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ইকবাল স্কলারবৃন্দ পৃথক পৃথক প্রবন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন যে, ইকবালের ন্যায় কবি প্রতিভা পৃথিবীতে অতীতে দেখা যায়নি, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে না; ভবিষ্যতে দেখা যাবে বলে মনে হয় না। ইকবালের প্রায় ২৫ হাজার পংক্তিতে পিছিয়ে পড়া মুসলিম মিল্লাহর আত্মজাগৃতির আহবান রয়েছে। তিনি নিদ্রা-বিভোর মুসলিম জাতিকে কাব্যের চাবুক মেরে সজাগ করার জন্য আমৃত্যু মসি পরিচালনা করেছেন। ইকবাল মুসলিম মিল্লাহকে পাশ্চাত্যের পচা-গন্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার আহবান জানিয়েছিলেন। ইকবালের স্বপ্নের পাকিস্তান আজ আণবিক বোমা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এশিয়ার মুসলমানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে।

বিকেলে ডেলিগেটদের সাথে পাঞ্জাবের গভর্নর সাহেদ আহমদ টি পার্টিতে গভর্নর ভবনে মিলিত হন। মাগরিব নামাজের পর পাঞ্জাব আর্ট কাউন্সিল আল- হামরা হলে ইকবাল সন্ধ্যার আয়োজন করে। ইকবালের 'শিকোয়া' ইবলীসের মজলিসে শূরা এবং আকর্ষণীয় গজল উপস্থাপন ছিল এ সেশনের প্রধান আকর্ষণ। উপস্থিত সুধীবৃন্দ তন্ময় হয়ে ইকবাল সন্ধ্যা উপভোগ করেন। ৫টি গজল এবং দু'টি দীর্ঘ-কবিতা আবৃত্তি করেন পাকিস্তানের বরণীয় গায়ক ও আবৃত্তিকারবৃন্দ।

পাঞ্জাবের মেয়রের পক্ষ থেকে সান্ধ্য ভোজের আয়োজন করা হয়। লাহোর শহরে একটি খুশির লহরী বয়ে যায়।

সর্বশেষ (৭ম) অধিবেশনে ফরেন ডেলিগেটগণ স্ব স্ব অনুভূতি বর্ণনা করেন। বাংলাদেশের এডভোকেট মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইকবাল সমগ্র মুসলিম মিল্লাহর জন্য গর্বের ধন। তিনি পরবর্তী ৪র্থ ইকবাল কংগ্রেস ঢাকায় অনুষ্ঠানের আহবান জানান।

প্রধান অতিথির ভাষণে পাঞ্জাবের গভর্নর ২০০১ সালে ৪র্থ ইন্টারন্যাশনাল ইকবাল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবার আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁর ভাষণে তিনি ইকবালের কর্মময় বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করে বলেন, ইকবাল আমাদের গর্বের ধন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইকবালের কাব্য, কবিতা ও গদ্য আরও বেশী সিলেবাসভূক্ত করে ইকবালের উপর গবেষণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের তিনি ইকবালের কবিতা আত্মস্থ করার আহবান জানান।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইকবাল স্কলারবৃন্দ মতামত ব্যক্ত করে বলেন, বিশ্বের ইতিহাসে ইকবালের ন্যায় কবি-দার্শনিক প্রতিভা অতীতে জন্ম নেয়নি, বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতেও জন্ম নেবে বলে মনে হয় না। ইকবাল হতাশাদীর্ণ মুসলিম জাতিকে গাইড লাইন দিয়ে দু'হাতে লিখেছেন গদ্য ও পদ্য। করেছেন বক্তৃতা, দিয়েছেন বিবৃতি। তাঁর সময় এমন কোন উদ্ভূত বিষয় ছিল না, যে ব্যাপারে তিনি কলম ধারণ করেন নি।

আজ সমগ্র বিশ্বে ইকবাল চর্চা হচ্ছে। ইকবাল অনূদিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায়। বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকবালের জীবন ও কর্মের ওপর গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। অসংখ্য পিএইচডি এ পর্যন্ত হয়ে গেছে।

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী ইকবালকে আরও বেশী বুঝতে সক্ষম হবে। ইকবাল বরিত হয়েছেন, হচ্ছে এবং হবেন– এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা বলেন, ইকবালের কবিতা হচ্ছে কুরআন, হাদীস, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সার নির্যাস।

ইকবাল দিবস এবং কংগ্রেস উপলক্ষে প্রচার মাধ্যম পিটিভি ও রেডিও পাকিস্তান ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে এবং ফলাও করে খবর প্রকাশ করে। লাহোরে ভিআইপি সড়কগুলো আলোকসজ্জিত করা হয়। পত্রিকার সাহিত্য পাতাগুলোতে কংগ্রেসের খবর এবং রঙিন ছবি ছিল প্রধান আকর্ষণ। সত্যিই জাতীয় কবির প্রতি শ্রদ্ধার অকৃত্রিমতা দেখে মাথা নুয়ে আসে।

প্রবন্ধের শিরোনাম এবং প্রবন্ধকারদের পরিচয়

ইকবাল তনয় ও সিনেটর জাস্টিস জাভিদ ইকবাল; ইকবাল এন্ড ডায়লগ অব সিভিলাইজেশন; ভারতের বিহারস্থ মিথিলা ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এ এম এস আবদুল মুগনী ঃ ইকবালস এন্বিশন্ড নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার; আল্লামা ইকবাল সংসদের উপদেষ্টা, সংসদ পত্রিকা সম্পাদনা কমিটির চেয়ারম্যান সাবেক তথ্যমন্ত্রী এডভোকেট মুজিবুর রহমান ঃ ইকবালস ক্রিটিক অব ডেমোক্রেসী; আল্লামা ইকবাল সংসদের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, রাবেতা আলমে ইসলামী বাংলাদেশের পরিচালক মীর কাসেম আলী ঃ ইকবালস কনসেফট অব দ্য প্রবলেম অব ন্যাশনালিজম; তুরস্কস্থ ইস্তাম্বুল ভার্সিটির সাহিত্য অনুষদের ডঃ হালিল টোকার ঃ ইকবাল এন্ড তার্কিশ ইয়ুথ; তাজিকিস্তানের ডোশাম্বস্থ একাডেমী অব সাইন্সের প্রফেসর আলী খান আফসাজাড ঃ ইকবাল এন্ড দ্য এওয়াকেনিং অব দ্য তাজিক ইয়ুথ; তাশখন্দের (উজবেকিস্তান) প্রফেসর সাদুল্লাহ এ ইয়ালডাশেভ ঃ 'সেন্ট্রাল এশিয়া ইন দ্য হেরিটেজ অব পাকিস্তানী স্কলার (এম ইকবাল); আল্লামা ইকবাল সংসদ-এর সেক্রেটারী জেনারেল, সংসদ পত্রিকার সম্পাদক আবদুল ওয়াহিদ ঃ দি ইউনিটি অব দ্যা ইসলামিক ওয়ার্ল্ড; পাঞ্জাব ভার্সিটির ফিলোসফির প্রফেসর ডঃ আবদুল খালিক ঃ ইকবালস কনসেফট অব ডিভাইন ইউনিটি; ফিলোসফির চেয়ারম্যান ডঃ আবসার আহমদ এনকোয়ান্টার উইথ ওয়ানস টু সেলফ; 'রিমেন্ট রিফারমেশনস অব ইকবাল ফিলোসফি, ফিলোসফির এসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ নাঈম আহমদ ঃ ইকবালস ক্রিটিক অব নিউপ্লেটোনিজম; ওরিয়েন্টাল কলেজের উর্দু বিভাগের এসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ রফীউদ্দীন হাশিমী ঃ ইকবাল কে তাসাওউরি জিহাদ কি মানুবিয়্যাত; করাচী ভার্সিটির ফিলোসফির সাবেক প্রফেসর ডঃ কাজী এ কাদের ঃ দ্য ডাইনামিক অব রেঞ্জ ইন মুসলিম সোসাইটি; ওরিয়েন্টাল কলেজের এসোসিয়েট প্রফেসর ডঃ তাহসীন ফিরাকী ঃ নয়া নিজামি আলম আওর ফিকরি ইকবাল; ইসলামাবাদস্থ হামদর্দ ভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব এডুকেশন এন্ড সোশাল সাইয়েন্সের প্রফেসর ডঃ এস এম এ সাঈদ ঃ ইকবালস ভিউ অব ইসলামিক রেনেসাঁস, ইসলামাবাদস্থ কায়েদে আজম ভার্সিটির সাবেক ইকবাল প্রফেসার ডঃ ফাতিহ মুহাম্মদ মালিক ঃ ইকবালস কনসেপ্ট অব মুসলিম ন্যাশনালিজম; লাহোরস্থ পাকিস্তান এডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজের সাবেক পরিচালক প্রফেসর ভিকার আহমদ ঃ ইলমুল ইকতিসাদ ঃ এফ জায়িযাহ; ইসলামাবাদের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডঃ সবুর গাওয়ার ঃ ইকবাল এমপ্লয়মেন্ট, ইনকাম এন্ড গ্রোথ'; মুলতানস্থ এরিয়েন্টাল ল্যাংগুইজেজের প্রফেসর ডঃ এম আসলাম আনসারী ঃ 'ইসলামিক ফিলোসাফি অব সেলফ এন্ড ইটস ইমপোর্ট ইন এডুকেশন অব মডার্ন মুসলিম ইয়ুথ এন্ড ইনটেগ্রেশন অব পার্সোনালিটি'; লাহোরস্থ কলেজ অব এডুকেশনের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর বি এইচ সিদ্দিকী ঃ 'কনজারভেশন অব ন্যাশনাল আইডেনটিটি'; এ ক্রাইং নীড ফর দ্য এডুকেশন অব মডার্ন ইয়ুথ'; লাহোরস্থ বযমে ইকবালের পরিচালক উর্দুর সাবেক প্রফেসর ডঃ গোলাম হোসাইন জুলফিকার ঃ 'ইকবাল কা পয়গাম নওজোয়ানে মিল্লাত কে নাম'; পেশোয়ার ভার্সিটির উর্দু বিভাগের প্রধান প্রফেসর সাবির কালুরাবি ঃ 'ইকবাল আওর ওয়াসাতি এশিয়া'; ওরিয়েন্টাল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ডঃ ওহীদ কোরাইশী ঃ ইকবালস কালচারাল এপ্রোচ টু নিউ ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ডার'; বেলুচিস্তান টেক্সট বুক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ ইনামুল

হক কাউসার ঃ 'আলমে ইসলাম মেঁ ইত্তিহাদ'; ইসলামাবাদস্থ আল্লামা ইকবাল ওপেন ভার্সিটির ইকবালিয়াত বিভাগের প্রফেসর ডঃ এম সিদ্দিক খান শিবলী ঃ 'ইকবাল এন্ড দ্য প্রবলেম অব ন্যাশনালিজম'; এবটাবাডের উর্দুর প্রফেসর আইউব সাবির ; 'আল্লামা ইকবাল আওর মাসআলাই কাওমিয়্যাত'; ইকবাল একাডেমী লাহোরের ডেপুটি ডাইরেক্টর ডঃ ওহীদ ইশরাত ঃ 'ইকবাল আওর জমহুরী খিলাফত কা তাসাওউর'; পাঞ্জাব ভার্সিটির আরবী বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ সৈয়দ এম আকরাম শাহ ' 'খুদী আওর খোদ ইনহিসারী'; ইকবাল একাডেমী লাহোরের পরিচালক এম সোহাইল ওমর ঃ 'ইকবালস কনসেপ্ট অব লাভ ঃ প্রিলিমিনারী অবজারভেশন্স'; ইকবাল একাডেমীর রিসার্চ স্কলার আহমদ জাভিদ ঃ 'রুমী এজ দ্য স্প্রিচুয়াল গাইড অব ইকবাল'; করাচীস্থ সাহিত্য সমালোচক ডঃ ফরমান ফতেহপুরী ঃ 'ইকবাল কে ফিকর ওয়া যান কে মাশরেকী মাখাজ'; লাহোরস্থ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ নাজীর কায়সার ঃ 'রুমী এজ দ্য স্প্রিচুয়াল গাইড অব ইকবাল'; বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর এম আনোয়ার সাদিক ঃ 'শউরি নবুওয়াত আওর শউরি বিলায়াত ইকবাল কি নজর মে'; লাহোরস্থ সিভিল সার্ভিসেস একাডেমীর সাবেক পরিচালক মিঃ এনায়েতুল্লাহ ঃ 'ইকবালস ফোর কনসেনট্রিক সার্কেলস'; ইসলামিয়া কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ডঃ এম মারুফ ঃ 'ইকবাল এন্ড দ্য ইউনিটি অব মুসলিম ওয়ার্ল্ড'; পাঞ্জাব সরকারের এডুকেশন সেক্রেটারী ডঃ শাহজাদ কায়সার ঃ 'সিগনিফিকেন্স অব দ্য ফাইনালিটি অব প্রফেটহুট'; লাহোর কলেজ ফর ওমেনের দর্শনের প্রফেসর আতিয়া সৈয়দ ঃ 'ইকবাল এন্ড সডরা'; লাহোরস্থ গভর্নমেন্ট কলেজের উর্দুর প্রফেসর ডঃ সেলিম আকতার ঃ 'ইলহামী আওর মুতাসাওউফনাহ ওয়ারিদাত ফিকরি ইকবাল কে তানাজুর মে'; লাহোরস্থ ইনস্টিটিউ অব ইসলামিক কালচারের সাবেক পরিচালক প্রফেসর এম সাঈদ শেখ ছাড়াও কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন লাহোরস্থ দৈনিক নাওয়াই ওয়াক্ত ও ডেইলী নেশন পত্রিকার এডিটর ইন-চীফ মিঃ মজিদ নিজামী, ডঃ আগাইয়ামীন, ডঃ তোফায়েল সালিক, পাঞ্জাব ভার্সিটির সাবেক ভিসি প্রফেসর ডঃ খাইরাত এম ইবন রাসা ও প্রফেসর ডঃ রফিক আহমদ প্রমুখ।

বিভিন্ন সেশনে উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলোর ওপর উপস্থিত সুধীবৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ চুলচেরা বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। প্রবন্ধকারগণ উত্তর দেন।

এমনিভাবে তিনদিনের আন্তর্জাতিক কংগ্রেস শেষ হলেও মনে হয়েছিল সুরের লহরী যেন থামেনি– বেজেই চলেছে কোন সাধকের স্বরে। ধীরে ধীরে বিদেশের ডেলিগেটবৃন্দ পাকিস্তান ত্যাগ করেন। ইকবাল কাব্যের অমিয় সুধা স্ব-স্ব দেশে ভাবান্তর করার দৃঢ়তা নিয়ে তারা চলে যান। আমরাও চলে আসি বাংলাদেশে। বাংলার মাটিতে সেই ১৯২৮ সালের ইকবালের শেকোয়ার অনুবাদ হয়। পরবর্তীতে হাজার হাজার পৃষ্ঠা ইকবাল সংক্রান্ত লেখা বই এবং অনুবাদ ছাপা হয়। এ যাত্রা থামবার নয়।

IQBAL ACADEMY PAKISTAN LIBRARY. Acc. No. 23000 LAHORE.

১৯৯৮ সনে লাহোরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক ইকবাল কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী ইকবাল স্কলারদের ছবি

00023000